সমাজবিদ্যা পরিচয়

মহাজাতি প্রকাশক

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত উচ্চতর-মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয় সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর অবশ্য পাঠ্য বিষয়।

সমাজবিদ্যা পরিচয়

(নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, এম, এ
অধ্যক্ষ, গার্লস কলেজ, হাওড়া।

ভূমিকা

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে যুগান্তরকারী পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যুগোপযোগী নূতন নূতন শিক্ষণীয় বিষয় এখন স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে স্থান পাইয়াছে। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষার মানকে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য সরকার বিশেষভাবে প্রয়াস পাইতেছেন। এই পরিবর্তনের মুখে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সমাজবিদ্যাকে (Social Studies) উচ্চতর-মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর অবশ্য-পাঠ্য তালিকায় স্থান দিয়াছেন। এই বিষয়টি সম্বন্ধে পঠন-পাঠন এই প্রথম প্রবর্তিত হইল। পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠসূচী অনুসারেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং বিষয়টিকে যথাসম্ভব বিশদ ও সরলভাবে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পর্ষৎ-এর নির্দেশ এই যে সমাজবিদ্যার প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয়খণ্ডের প্রথমাংশ নবম শ্রেণীতে পড়াইতে হইবে। এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রধানত পর্ষৎ-নির্দিষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থাদির উপরই নির্ভর করা হইয়াছে। আশা করি 'সমাজবিদ্যা পরিচয়' পাঠ করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

দোলপূর্ণিমা—১৩৬৬
৮১, শিবপুর রোড, হাওড়া

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

"সমাজবিদ্যা পরিচয়"-এর প্রথম সংস্করণ অল্পদিনেই নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ যথাসম্ভব পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করিয়া বাহির হইল। ছাত্রছাত্রীরা ইহার সম্যক উপকারিতা উপলব্ধি করিলে শ্রম সার্থক হইবে।

দোলপূর্ণিমা—১৩৬৭ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য
৮১, শিবপুর রোড, হাওড়া

সূচীপত্র

॥ প্রথম খণ্ড ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

আদিম মানব

সমাজবিদ্যা-পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

সমাজ-জীবন

বিষয়-প্রসঙ্গ ঃ

সমাজ ঃ ব্যক্তি লইয়া পরিবার। পরিবার লইয়া মানবগোষ্ঠী। মানবগোষ্ঠী লইয়া মানুষের সমাজ। সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনের পথে মানুষের প্রয়োজনে সমাজের সৃষ্টি এবং সমাজবোধের উন্মেষ। প্রসিদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞানী র‍্যালফ লিণ্টন সমাজবিদ্যার সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "যে বিদ্যা অধিগত করিয়া মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রে তাহার কি দায়িত্ব তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়, তাহারই নাম সমাজবিদ্যা।" এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এবং তাহার অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি—এইগুলিই প্রত্যক্ষভাবে তাহার সমাজ-জীবনের কাঠামোটিকে ধরিয়া আছে এবং মানুষের সমাজ বলিতে প্রধানতঃ একদিকে তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং অন্যদিকে তাহার অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিকে বুঝিতে হইবে।

সমাজ ও ব্যক্তি ঃ সমাজবিজ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, সমাজ ও ব্যক্তি অভিন্ন। ব্যক্তির জন্য সমাজ এই মত যেমন সত্য, আবার তেমনি সমাজের জন্যই ব্যক্তি এই মতও সত্য। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটি সম্পূর্ণ পারস্পরিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই একে অন্যের পরিপূরক। আমাদের চারিদিকের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, ব্যক্তির উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না এবং সমাজের উন্নতি না হইলে ব্যক্তিরও উন্নতি হয় না। সুতরাং একের স্বার্থে অন্যের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত। সুবিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন, সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির উন্নতি নাই; সমাজের কল্যাণের উপরই ব্যক্তি-মানুষের কল্যাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব সমাজের মঙ্গলার্থে ব্যক্তিকে (individual man) আপনার

মানুষ ও তাহার সমাজ
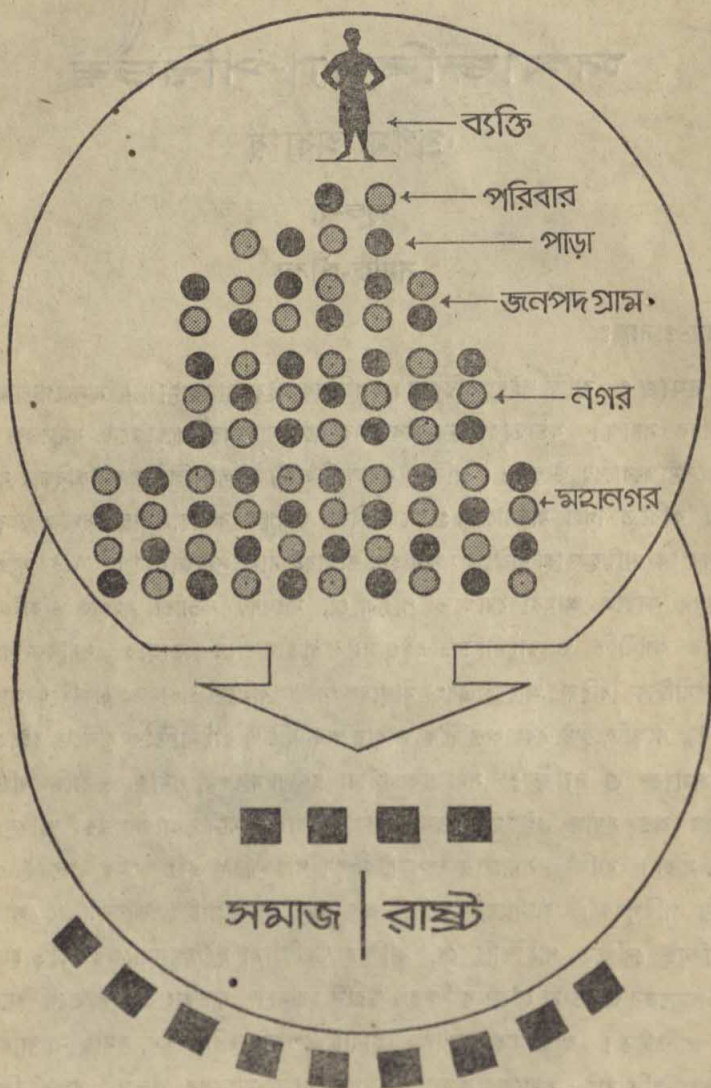
ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সমাজের আনুগত্য ভিন্ন ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ নাই। ব্যক্তির বিকাশে সমাজের বিকাশ যেমন সত্য, তেমনি উন্নত সমাজের মধ্যে বাস করিতে না পারিলে ব্যক্তিজীবনের স্ফূর্তিলাভ, তাহার মনের সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশলাভ, কিছুই সম্ভব নহে। ইহাই সমাজবিদ্যার মূল কথা।

সমাজদেহের সজীবতা : মানবসভ্যতার মূলে রহিয়াছে মানুষ ও তাহার তৈরি সমাজ। প্রসিদ্ধ ইতিহাস-বিজ্ঞানী অধ্যাপক আর্ণল্ড টয়েনবি তাঁহার **A Study of History** গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন : "The individual is a reality which is capable of existing and of being apprehended by itself and that a society is nothing but an aggregate of atomic individuals"—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি-মানুষের সমষ্টিগত রূপ লইয়াই তাহার সমাজদেহের সৃষ্টি। সুতরাং সমাজ একটি সজীব সত্তা। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি আছে ; উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি আছে। ব্যক্তি-মানুষের যেমন বোধশক্তি আছে, চেতনা আছে, নানা বিষয় উপলব্ধি করিবার অনুভূতি ও আগ্রহ আছে, তেমনি তাহার সমাজদেহেরও বোধশক্তি আছে, চেতনা আছে, এমন কি কর্ম্মশক্তিও আছে। এ সবেরই উৎস কিন্তু মানুষ। দার্শনিক বার্গসঁ তাই বলিয়াছেন, মানুষের অসংখ্য ভগ্নাংশ লইয়াই সমাজদেহের সৃষ্টি। মানুষের চিন্তাশক্তি হ্রাস পাইলে বা তাহার কর্ম্মশক্তি ক্ষীণ হইলে তাহার সমাজদেহের অবনতি সুনিশ্চিত। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

ক্রম-বিবর্তন : মানুষ একদিনে তাহার সামাজিক সত্তা লাভ করে নাই। এই স্তরে পৌঁছিতে তাহার বহু লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। ডারুইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের মতে লক্ষ বৎসর পূর্বে, প্রকৃতির নির্বাচনে এবং ক্রম-বিবর্তনের ধারায় এই পৃথিবীতে একদিন মানুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তারপর পুরাতন প্রস্তরযুগ, নূতন প্রস্তরযুগ প্রভৃতি একে একে বহু ধাপ অতিক্রম করিয়া সে সভ্য হইয়াছে এবং গোষ্ঠীজীবনের (collective life) চেতনা লাভ করিয়াছে। এই গোষ্ঠীজীবনের পরবর্তী পর্যায়ই হইল মানুষের সমাজজীবন (social life) এবং এই স্তরে উন্নীত হইবার পর হইতেই সভ্যতার পথে আরম্ভ হইয়াছে মানুষের জয়যাত্রা। আত্মরক্ষা ও উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমাজবদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি এবং পরিবেশের সহায়তায়ই মানুষের

সমাজজীবন ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে। যাহারা দল বাঁধিতে পারে নাই, সমাজ গড়িতে পারে নাই, সভ্যতার মিছিলে তাহারা পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। এখনো পৃথিবীর বহু অঞ্চলে আমরা সভ্যতার পূর্ব যুগের আদিম মানুষের সাক্ষাৎ পাই।

পরিবেশের প্রভাব ঃ আবির্ভাবের প্রথম দিন হইতেই মানুষের সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহার জীবনধারণের জন্য যাবতীয় উপকরণই সে প্রকৃতি হইতে আহরণ করিয়াছে। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশেই মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে এবং এই প্রাকৃতিক পরিবেশই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনধারায় পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীতে জনসমষ্টির জীবনধারায় বৈচিত্র্য বড় কম নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সন্নিবেশ ও জলবায়ু দ্বারা গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার ফলেই এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীবনসংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষকে সভ্যতার নানা পর্বে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইতে হইয়াছে।

বিভিন্ন জীবনধারা ঃ এই বৈচিত্র্যের ফলে মানুষ কোথাও অরণ্যচারী হইয়া শিকার দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে, কোথাও বা পশুচারণ দ্বারা সে বাঁচিয়া আছে, আবার কোথাও সে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন জনসমষ্টির বিভিন্ন প্রকারের জীবনধারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জনসমাজ সৃষ্টি করিয়াছে। এইসব জনসমাজ যে সর্বত্র সমানভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। জন-সমাজের এই বিভিন্ন প্রকারের বিকাশধারার মূলে কিন্তু রহিয়াছে প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ ভূগোল। যেহেতু প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্পর্ক নিবিড় এবং প্রত্যক্ষ, সেইজন্য তাহার সমাজ-জীবন এত বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঃ কিন্তু কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারাই মানুষের বা তাহার সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব নহে। পারিপার্শ্বিকের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে প্রয়োজন হয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের। এইখানেই সংস্কৃতির প্রশ্ন আসে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন, তেমনি সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারাও মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন উভয়ই বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। এইখানে রহিয়াছে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

অর্থনীতি ঃ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মৌল প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়।

তাহার সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে এই খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সমস্যা সমাধান করিবার জন্য তাহাকে অর্থনীতির সাহায্য লইতে হইয়াছে। যেদিন হইতে ব্যক্তি-মানুষ পরিবারের সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গোষ্ঠীজীবন ও সমাজজীবন গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে সেইদিন হইতে পারস্পরিক লেন-দেনের ভিতর দিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। শ্রমের বিনিময়ে সে পণ্য উৎপাদন করিয়াছে, আবার সেই পণ্যের বিনিময়ে সে তাহার জীবিকার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছে। ইহাই অর্থনীতি এবং মানুষের সমাজজীবনের একটি প্রধান বনিয়াদ।

রাষ্ট্র ঃ ইহার পরের স্তর সমাজবিন্যাসের ভিত্তিভূমি। মানুষ যেমন গৃহে বাস করে, তাহার মাথার উপরে একটি আচ্ছাদন আছে, তেমনি সে যে সমাজের মধ্যে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেই সমাজের নিশ্চয়ই একটা ভিত্তিভূমি থাকিবে। সেই ভিত্তিভূমি হইল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়াই মানুষের সমাজ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের জীবনের বিকাশধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানও রহিয়াছে।

মূলতত্ত্ব ঃ অতএব সমাজবিদ্যার মূল তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এইগুলি পড়িতে হয়। পরিবার মানুষের প্রথম সামাজিক পরিবেশ, তাহার দ্বিতীয় পরিবেশ গোষ্ঠীজীবন বা সমাজ, এবং তৃতীয় পরিবেশ রাষ্ট্র। মানবসভ্যতার সামগ্রিক বিকাশ এই তিনটি ধারায় চলিয়া আসিতেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনযাত্রাও ইহাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—এই তিনটির ভিতর দিয়া সভ্যতার পথে মানুষ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সমাজবিদ্যায় আমরা মানুষের এই ত্রিমুখী অগ্রচারিতার কাহিনীই পাঠ করিয়া থাকি।

প্রাকৃতিক অঞ্চল ঃ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমরা ভূগোল পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মানুষের বাসস্থান এই পৃথিবীর প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ তিন প্রকারের—শীতমণ্ডল, উষ্ণমণ্ডল এবং নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল। এই তিন অঞ্চলের আবহাওয়াও (climate) বিভিন্ন প্রকারের। পৃথিবীর এই তিনটি অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা প্রধানতঃ তিনভাগে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং আঞ্চলিক আবহাওয়ার পার্থক্য এই তিন অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনে তাহাদের জীবনযাত্রায় প্রকৃত পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের আলোচনার মধ্যে আমরা পৃথিবীর এই তিন অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনের কথা, তাহাদের সমাজের কথা বলিব।

আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতিই সমাজ-জীবন গঠনের মূল প্রেরণা। সমাজবিদ্যার ব্যাপক অনুশীলনের ফলেই মানুষের সমাজবোধ জাগ্রত হইয়া তাহাকে তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন করিয়া তোলে এবং তাহার ভিতর স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি এবং বিশ্বমানবপ্রীতি জাগিয়া উঠে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের জনসমষ্টির জীবনধারা

তিন শ্রেণীর জনসমষ্টি ঃ আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসী। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ফলে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের জনসমষ্টি বাস করিতেছে। ভারতের অধিবাসী বা জনসমষ্টি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা—(১) শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ; (২) উষ্ণ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ; এবং (৩) সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসী। এই তিন অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনযাত্রা-প্রণালী বা উপজীবিকা এক প্রকারের নহে। প্রথম শ্রেণীর জনসমষ্টি কৃষিকার্য, পশুচারণ ও সামান্য কুটিরশিল্পদ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। প্রধানতঃ হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে অবস্থিত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে ইহাদের বসবাস। দ্বিতীয় শ্রেণীর জনসমষ্টির জীবিকা শিকার, পশুচারণ, ফলমূল-আহরণ ও কৃষিকার্য। ছোটনাগপুর অঞ্চল, নীলগিরি পাহাড়ের উপত্যকা, উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যভারতের কোন কোন অঞ্চল, আসামের পার্বত্য অঞ্চল এবং আন্দামান দ্বীপে ইহাদের বসবাস। আর তৃতীয় শ্রেণীর জনসমষ্টি কৃষিকার্য, শিল্প এবং বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। ভারতের বিশাল জনসমষ্টির বেশির ভাগই সমতল-ক্ষেত্রের অধিবাসী। সমতলক্ষেত্রের জনসমষ্টির শতকরা চল্লিশজন কৃষিকার্য করিয়া থাকে ; বাকী শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং ভারতের

সমতল অঞ্চলের জনসমষ্টির উপজীবিকা কৃষি। সেইজন্য ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হইয়া থাকে।

সমতলের বিভিন্ন ফসল ঃ সমতল ক্ষেত্রগুলি নদীবহুল অঞ্চলে অবস্থিত এবং সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই রাজ্যের সমুদ্র-উপকূল এবং মাদ্রাজ অঞ্চলই ভারতবর্ষের মধ্যে কৃষিপ্রধান সমতলক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। এইসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী, এইখানে ধানের চাষ বেশী ও সামান্য গমের চাষ হইয়া থাকে। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং মধ্যভারতের অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই অল্প বলিয়া এইসব অঞ্চলে গমের চাষই হইয়া থাকে। যে সব সমতলক্ষেত্র কিছু উচ্চে অবস্থিত, সেই সব স্থানে তরি-তরকারী ও ফলমূলের চাষ হইয়া থাকে। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কৃষিকার্যের ফলে এই দেশের জনসমষ্টির জীবনধারায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

শিল্পাঞ্চল ঃ কিন্তু কৃষিকার্যই ভারতের সমাজজীবনের একমাত্র উপজীবিকা নহে। ভারতবর্ষ খনিজপ্রধান দেশ। ভারতের খনি-অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই দেশের জনসমষ্টির মধ্যে যেমন শিল্প ও বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চলে প্রচুর জনসমাবেশ বা জনবসতি, সে-সব স্থানেও কোন না কোন শিল্পের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। এইসব শিল্পাঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনধারা অন্যান্য অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সমাজে ইহাদিগকে industrial class বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

বিনিময়-বাণিজ্য ঃ সভ্য মানুষের সমাজের উন্নতি বা অবনতি বর্তমানে কৃষি ও শিল্পের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর জনসমষ্টির মধ্যে যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাই তাহাদের সমাজজীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। কৃষি-অঞ্চলের জনসমষ্টির পক্ষে কেবলমাত্র কৃষিজাত দ্রব্যদ্বারা যেমন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভবপর নহে, তেমনি শিল্প-অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে কেবলমাত্র শিল্পজাত দ্রব্য তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এক দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের বিনিময় তাই অপরিহার্য। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ, সবই এই পারস্পরিক বিনিময়ের ভিতর দিয়া আপন আপন প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। এইখানেই সমাজ-দেহের বিকাশে জনসমষ্টির দানের কথা আসে।

খাদ্যসরবরাহে কৃষির গুরুত্ব: সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান, সমাজবদ্ধ মানুষের এই তিনটিই হইল মৌলিক বা প্রাথমিক প্রয়োজন্। এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জনসমষ্টির ভূমিকাটি কি, এইবার আমরা,তাহা দেখিব। যদিও ভারতবর্ষ বর্তমানে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে চলিতেছে, তথাপি ইহা সর্বতোভাবে কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষের সমগ্র জনসমষ্টির ৭৫ ভাগ গ্রামে বাস করে; এই বৃহৎ জনসমষ্টির প্রায় অধিকাংশই কৃষিকার্য করিয়া থাকে। শহরের অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ২৫। সুতরাং ভারতের জনসমষ্টির জীবনধারা মূলতঃ কৃষিপ্রধান। শহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে শিল্প ও বাণিজ্য এবং আফিস-আদালত। শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য যেমন গ্রামের জনসমষ্টিকে নির্ভর করিতে হয় শহরের অধিবাসীদের উপর, তেমনি শহরের লোককে কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য নির্ভর করিতে হয় পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের উপর। এই গেল শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার কথা। আবার পার্বত্য অঞ্চলের জনসমষ্টি যাহা উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাও ভারতের শহর ও পল্লীর জনসমষ্টির প্রাথমিক প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে। মানুষ প্রকৃতি হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। পূর্বে সমাজজীবনে জটিলতা যখন কম ছিল, তখন জনসমষ্টি স্থানীয় অঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু বর্তমানে সমাজজীবনের প্রসারতার সহিত জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার ফলে দূর-দূরান্ত অঞ্চলের সহিত জনসমষ্টিকে সম্বন্ধ রাখিতে হয়। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে গ্রামের অধিবাসীরাই এখানকার জনসমষ্টির খাদ্য যোগাইয়া থাকে। চাল, ডাল, তরি-তরকারী ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্য সবই গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরাই যোগাইয়া থাকে। ভারতের জনসমষ্টির যাহা প্রধান খাদ্য—ধান, গম, যব—চাষীদের নিকট হইতেই তাহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দেশে শিল্পের প্রসার সত্ত্বেও আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য আমরা কৃষিকার্যে নিযুক্ত গ্রামাঞ্চলের জনসমষ্টির উপরই বেশি নির্ভর করিয়া থাকি।

বস্ত্রসরবরাহে শিল্পের গুরুত্ব: খাদ্যের জন্য যেমন, আমাদের প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যও আমাদিগকে তেমনি জনসমষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান যুগ অবশ্য শিল্পপ্রধান যুগ এবং এখনকার সমাজব্যবস্থায় শিল্পের ভূমিকা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। এই যন্ত্রযুগে শিল্পের প্রসার যেমন বিস্ময়কর তেমন শিল্পজাত দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটাইতেছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই দেশের প্রায় প্রতি গৃহে তাঁতের প্রচলন ছিল। তখন বাংলা দেশে এমন একটি গ্রামও ছিল না যেখানে তাঁতশিল্প ছিল না এবং এখনও কোন কোন গ্রামে ইহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশে ইংরেজরা আসিবার বহুপূর্ব হইতে সমাজ-ব্যবস্থা এমন ছিল যে, বিভিন্ন কার্যের দায়িত্ব বিভিন্ন জনসমষ্টির উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁতীরা যোগাইত বস্ত্র, কৃষকেরা খাদ্য। তারপর সমাজজীবনের জটিলতা যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। এইভাবেই সমাজে কুমোর, কামার, ছুতারমিস্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পারস্পরিক আদান-প্রদান দ্বারা স্ব স্ব জীবিকা নির্বাহ করিত। এই শিল্প-প্রাধান্যের যুগেও এই সব জনসমষ্টির নিকট হইতে আমরা এখনো অনেক পরিমাণে বস্ত্রদ্রব্য পাইয়া থাকি। উত্তর-ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট হইতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় গরম পোশাক-পরিচ্ছদ আজও পাইয়া থাকি; এমন কি শিল্পের জন্য কাঁচা পশম পর্যন্ত ইহারাই সরবরাহ করিয়া থাকে।

গৃহনির্মাণে মিস্ত্রীর গুরুত্ব : সমাজবদ্ধ মানুষ বাসস্থান ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। এই বাসস্থানও নির্মিত হয় বিভিন্ন জনসমষ্টির পরিশ্রমের ফলে। ইট হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহনির্মাণের যাবতীয় কাজ ইহারাই সম্পন্ন করিয়া দেয়। সমাজে যদি রাজমিস্ত্রী বা ছুতোরমিস্ত্রী না থাকিত, তাহা হইলে কে আমাদের থাকিবার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দিত?

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের সমাজ-জীবনের যে তিনটি প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়—বস্ত্র, খাদ্য ও গৃহ—উহা আমরা জনসমষ্টির কল্যাণেই পাইয়া থাকি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খাদ্য-সংগ্রহের অর্থনীতি

প্রকৃতির দান ঃ সমাজে সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্যের প্রয়োজন। সভ্যতার প্রথম দিন হইতেই তাই মানুষকে জীবনধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং আজও ইহা তাহার প্রাত্যহিক জীবনের অবশ্য করণীয় কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম এবং প্রধানতম। এই যে কোটি কোটি মানুষের অধ্যুষিত বিরাট বিপুল মানব-সমাজ পৃথিবীর বুকে রহিয়াছে, ইহাদের খাদ্য কোথা হইতে আসে? কোথা হইতে মানুষ প্রতিদিন তাহার প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে? সেই যে প্রাক্-সভ্যতার যুগে প্রকৃতির সহিত মানুষের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, সেইদিন হইতে এই প্রকৃতিই তাহার খাদ্য যোগাইয়া আসিতেছে। এ খাদ্যের জন্য মানুষকে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে। ফল-মূল, শাক-সবজী, মৎস্য ইত্যাদি যাহা প্রাক্-সভ্যতা জীবনে মানুষের খাদ্যের উপকরণ ছিল, বর্তমানেও তাহার কোনো পরিবর্তন হয় নাই। এমন কি এই যুগে বিজ্ঞানকে স্বীয় আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াও মানুষ প্রকৃতির অনুগ্রহেই বাঁচিয়া আছে। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত যাহা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা হইল মানুষের খাদ্য-উৎপাদন ও খাদ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি। খাদ্য-উৎপাদনে বিজ্ঞান অবশ্য তাহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

সংঘবদ্ধ জীবন ঃ নৃতত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে, আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই আদিম মানুষ জীবজন্তু-শিকার ও খাদ্যসংগ্রহের জন্য দল বাঁধিয়াছিল। দলবদ্ধ হওয়া মানেই সংঘবদ্ধ হওয়া এবং প্রাক্-সভ্যতার যুগেই বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে মানুষ উপলব্ধি করিয়াছিল যে সংঘবদ্ধ না হইতে পারিলে আত্মরক্ষা কিংবা খাদ্য-সংগ্রহ কোনটাই সম্ভবপর নহে। এই সংঘবদ্ধ জীবনধারা হইতেই মানুষের মধ্যে জাগিল সহযোগিতার প্রবৃত্তি। একজন যদি একটি বন্যজন্তু শিকার করিল, উহা পাঁচজনে ভাগ করিয়া খাইল। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনেরও মূল ভিত্তি হইল এই পারস্পরিক সহযোগিতা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য মানুষের জীবনযাত্রায়ও বৈচিত্র্য

দেখা দিয়া থাকে। সুতরাং অরণ্যচারী জনসমষ্টির খাদ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি সর্বত্র একপ্রকার ছিল না। তাহারা যেমন সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি তাহারা এক অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে চলিয়া যায় এবং সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ফলে তাহাদের খাদ্যসংগ্রহ-পদ্ধতিও পরিবর্তিত হইয়া যায়। আরণ্য জীবনে দীর্ঘকাল প্রকৃতি ও জীবজন্তুর সহিত বসবাস করিতে করিতে আদিম মানুষ ক্রমে কতকগুলি জীবজন্তুকে পোষ মানাইয়া লয়। এইভাবে গৃহপালিত পশুর সাহায্যে তাহাদের খাদ্য-সংগ্রহের কার্য অনেকটা সহজ হইয়া যায়।

পরিবারজীবন: খাদ্যসংগ্রহ করিতে হইলে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন। আদিম মানুষ তাহাদের বুদ্ধির প্রভাবে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিল। প্রয়োজনের তাড়নাতেই মানুষের মধ্যে এই উদ্ভাবনী শক্তি দেখা দিয়াছিল। ফলমূল-আহরণ ও পশুপক্ষী-শিকার—ইহাই ছিল আদিম মানুষের খাদ্যসংগ্রহের রূপ। অরণ্যচারী মানুষের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। গাছের ডালপালা দিয়া অস্থায়ী আবাস তৈয়ারী করিয়া ইহারা বাস করিত এবং যখন সেই স্থানে খাদ্য ও শিকার বিরল হইয়া আসিত, তখন তাহারা আবার অরণ্যের অন্য একটি অঞ্চলে ঘর বাঁধিত। এক-একটি দলে এক-একটি পরিবার থাকিত। এই পরিবারের পুরুষেরা ফলমূল আহরণ করিত, শিকার করিত, আর মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ করিত, আহরিত উপকরণ দ্বারা তাহারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিত। এইভাবে অরণ্যচারী মানুষের মধ্যে যৌথ-পরিবারজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। সারা দিন ধরিয়া তাহারা খাদ্য সংগ্রহ করিত, সন্ধ্যায় তাহারা তাহাদের আবাসে ফিরিয়া আসিত।

খাদ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি: আদিম মানুষ খাদ্য উৎপাদন করিত না, প্রকৃতি আপনা হইতে যাহা উৎপাদন করিত তাহাই সে আহরণ করিত। তাহারা খাদ্য-আহরণ-পদ্ধতি ছিল প্রধানতঃ দুই প্রকার। আবাসস্থলের কাছাকাছি অরণ্যে তাহার খাদ্য আহরণ ও জীবজন্তু শিকার করিত, আবার কখনও কখনও তাহারা দূর দুর্গম অরণ্য প্রদেশেও অভিযান করিত। দূরদূরান্ত অরণ্য প্রদেশে খাদ্যসংগ্রহ করিতে যাইবার সময়ে অরণ্যচারী একাধিক জনসমষ্টি দলবদ্ধ হইয়া ও বহু প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাইত। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে নানারকম উৎসবাদিও হইত এবং খাদ্য-অভিযানে তাহাদের কিছুদিন কাটিয়া যাইত। এইভাবে যখন তাহারা পর্যাপ্ত খাদ্যসংগ্রহ

ও জীবজন্তু শিকার করিত তখন উহা লইয়া তাহারা নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসিত। আদিম যুগের অরণ্যচারী মানুষ প্রধানতঃ পাথরের তৈয়ারী অস্ত্রদ্বারাই শিকার করিত; এবং দূরবর্তী অরণ্যপ্রদেশে খাদ্য-অভিযানে যাইবার সময়ে তাহারা গৃহপালিত শিকারী কুকুর সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত।

খাদ্যসংগ্রহের কার্যে আদিম মানুষ ক্রমে ক্রমে বহু রকমের কল-কৌশলও উদ্ভাবন করিতে শিখিয়াছিল। অরণ্যচারী খাদ্য-অন্বেষণকারী জনসমষ্টির প্রধান সহায় ছিল কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র। তারপর আদিম মানুষ যখন বুঝিতে শিখিল যে কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্রই খাদ্যসংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট নহে, তখন তাহারা নানা প্রকার জাল ও ফাঁদ নির্মাণ করিয়া শিকার ও খাদ্যসংগ্রহের কার্যে ব্যবহার করিতে শিখিল। আদিম মানুষের নিদর্শন পৃথিবী হইতে আজও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই এবং পৃথিবীর বহু অঞ্চলে এই জাতীয় জনসমষ্টি দ্বীপে, অরণ্যে ও পর্বতে সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের নিজস্ব জীবনধারা লইয়া এখনো বাঁচিয়া রহিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলেই আদিম মানুষের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এইরকম কয়েকটি আদিম জনসমষ্টির জীবনধারা সম্পর্কে আমরা এইবার আলোচনা করিব।

আন্দামানীদের জীবনধারা ঃ

দেশ ও জলবায়ু ঃ ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ভারত মহাসাগরের নিমজ্জিত একটি পর্বতের শিখরদেশ। দুইটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ লইয়া ইহা গঠিত, যথা—গ্রেট আন্দামান ও লিট্‌ল আন্দামান। এই দুইটি দ্বীপের চারিদিকে ছোটবড় প্রায় দুই শত দ্বীপ আছে। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮৬ মাইল এবং প্রস্থে ৩৬ মাইল; ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। আন্দামানের পর্বতশ্রেণী দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব উপকূল স্পর্শ করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত। সর্বোচ্চ পর্বতশিখরের উচ্চতা আড়াই হাজার ফুটের অধিক নহে। এই দ্বীপপুঞ্জ বর্তমানে ভারত ইউনিয়নের শাসনাধীন। পূর্বে ভারতের উৎকট অপরাধীদের আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হইত। দণ্ডকাল শেষ হইলেও অনেকে আর স্বদেশে না ফিরিয়া এইখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিত। এইভাবেই আন্দামানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া একটি স্বতন্ত্র ভারতীয়

আন্দামান ও আন্দামানের অধিবাসী

উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আন্দামানীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। অপরাধীদের উপনিবেশ ব্যতীত আন্দামানের অবশিষ্ট ভূ-ভাগের সর্বত্রই গভীর অরণ্য।

আন্দামানে কোনো নদ-নদী নাই। পর্বতগাত্র বহিয়া যে-সব জলধারা নামিয়া আসিয়াছে তাহাই ছোট ছোট খালের মত ইহার বিভিন্ন স্থান দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সমুদ্রতট বহুস্থলেই প্রবাল-প্রাচীরে ঘেরা। 'পোর্ট ব্লেয়ার' এখানকার প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানকার জলবায়ু উষ্ণ এবং বৎসরের প্রায় সব সময়ই সমভাবাপন্ন। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবই এইখানে বেশী এবং দ্বীপপুঞ্জের বেশির ভাগে ইহার ফলেই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে চারমাস (মে ও জুন এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর) এইখানে প্রবল বারিপাত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যাও এই দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে।

উপজাতি, গোষ্ঠী, দল : নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে পৃথিবীর প্রাচীনতম মানবজাতির একটি শাখা হইল আন্দামানের ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণদেহ মানুষ। ইহাদের দেখিতে অনেকটা নিগ্রোদের মত। কোন্ সময় হইতে যে ইহারা এই অঞ্চলে বাস করিতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। স্থানটি সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়া বাহিরের মানবসমাজের সহিত তাহাদের কোন সংযোগই ছিল না। আন্দামানীরা মূলতঃ এক জাতি হইলেও তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু উপজাতিতে বিভক্ত; ভাষা ও কৃষ্টিগত পার্থক্যও তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান। তবে ইহাদিগকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে ;যথা—বড় আন্দামানের অধিবাসী এবং ছোট আন্দামানের অধিবাসী। ইহাদের সমাজ-বিন্যাস এই রকম : অন্যান্য আদিবাসীরা যেমন বিভিন্ন কুলে (clan) বিভক্ত, আন্দামানীরা সেরকম নহে; এখানকার সমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এইরকম কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া ইহাদের মধ্যে এক একটি উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব উপজাতিরাই আবার কয়েকটি দলে পর্যবসিত হইয়াছে। গোষ্ঠীগুলি কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত। আন্দামানের সমস্ত উপজাতি দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত; যথা—বড় আন্দামান দল এবং ছোট আন্দামান দল।

আকৃতি, ভাষা, বসতি, জীবিকা : আন্দামানীদের দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্ষুদ্রকায়। ইহাদের শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট। চাপা নাক, পুরু ঠোঁট এবং

কোঁকড়ানো চুল ইহাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত হওয়ার দরুণ আন্দামানের জনসমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ দশটি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। তবে ভাষাগুলির মধ্যে যথেষ্ট মিল ও নৈকট্য আছে। ইহাদের বসতি দুই রকমের—স্থায়ী এবং অস্থায়ী। সমুদ্রতীরবাসীদের বাসস্থান সাধারণতঃ অস্থায়ী, আর যে জনসমষ্টি নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বাস করে তাহাদের বাসস্থান স্থায়ী। এক-একটি দল এক-একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে। তাহারই মধ্যে তাহারা ফলমূল সংগ্রহ ও জীবজন্তু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। যাহারা সমুদ্র উপকূলে বসবাস করে তাহারা সব সময়ই সমুদ্র-উপকূলে তাহাদের বসতি স্থাপন করে। যে দল যে ভূখণ্ডে বাস করে, সেইখানে সেই দলের যে কোন লোক উক্ত স্থানে ইচ্ছামত খাদ্য সংগ্রহ ও জীবজন্তু শিকার করিতে পারে। কিন্তু এক ভূখণ্ডের দল অন্য ভূখণ্ডে গিয়া সেইরূপ করিতে পারে না। তবে আন্দামানীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে কোন বিরোধ নাই; এক দলের লোক অপর দলে সব সময়েই যোগদান করিতে পারে। আন্দামানীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিংস্রপ্রকৃতির যাহারা তাহাদিগকে 'কারাওয়া' বলা হইয়া থাকে। ইহাদের বসতি দক্ষিণ আন্দামানে। ইহারা বিষাক্ত তীরের দ্বারা বহু লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। মোটকথা, আন্দামানের জনসমষ্টির বসতি ও গৃহবিন্যাস হইতে আমরা ইহাদের যৌথ জীবনযাত্রার অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধতার পরিচয় পাইয়া থাকি।

আহরণ ও শিকার ঃ আন্দামানের জনসমষ্টি বনের ফলমূল-আহরণ এবং জীবজন্তু-শিকার দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। সমুদ্রের মৎস্য শিকার হইতেই তাহাদের বেশির ভাগ খাদ্যের যোগান হইয়া থাকে। আন্দামানের সমুদ্র-উপকূলে নানা প্রকার মাছ, শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ী ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, আর অরণ্যে পাওয়া যায় বন্য শূকর, পাখী, মধু, শাক-সব্‌জী ও ফলমূল। আন্দামানীরা দলবদ্ধ-ভাবে বন্যজন্তু শিকার করিয়া থাকে। এক-একটি শিকারী-দলে পাঁচ হইতে দশজন করিয়া লোক থাকে। তীর-ধনুকই ইহাদের শিকারের প্রধান অস্ত্র। আজকাল ইহারা শিকারের সময় পোষা কুকুর সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। পাখী এবং বন্য শূকরই ইহাদের প্রধান শিকার। তবে গভীর জঙ্গল ও উঁচু গাছের জন্য পাখী শিকার করা এখন অপেক্ষাকৃত কঠিন। বনে বনে শিকার করিবার সময় কোথাও ফলমূল

বা বীজ পাইলে ইহারা তাহাও সংগ্রহ করিয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে ইহারা পাঁচ মাস শিকার করিয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রতীরে যে সব আন্দামানী বাস করিয়া থাকে তাহারা প্রায় সারা বছরই সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া থাকে। ছোট ছোট নৌকা অথবা ডোঙ্গায় চড়িয়া ইহারা মৎস্য শিকার করে। সাধারণতঃ ইহারা তীর অথবা বর্শার সাহায্যে মৎস্য শিকার করে। কখনো ইহারা খাঁড়িগুলির মধ্যে বাঁধ দিয়াও মাছ ধরিয়া থাকে।

ফলমূল ও শাক-সব্‌জী আহরণ সাধারণতঃ মেয়েরাই করিয়া থাকে। পুরুষেরা যখন জঙ্গলে শিকার করিতে যায়, তখন মেয়েরা ঘর-সংসারের কাজকর্ম সম্পন্ন করিয়া নিকটস্থ জঙ্গলে ফলমূল ও খাদ্য-সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, জ্বালানী কাঠও তাহারা সংগ্রহ করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিবার ফাঁকে ফাঁকে তাহারা বেতের ঝুড়ি ইত্যাদিও বুনিয়া থাকে।

বনের মধু, গাছের ফল, সমুদ্রের মাছ বা অরণ্যের শিকারলব্ধ জন্তু—যাহা কিছু পাওয়া যায় আন্দামানীরা তাহা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া লয়। আন্দামানের জনসমষ্টি নিজেরা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না। জীবিকার জন্য তাহাদিগকে তাই প্রকৃতির দানের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য ঃ আন্দামানের জনসমষ্টির জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্যও আছে। প্রতিদিন রাত্রে বাসগৃহের সন্নিহিত উন্মুক্ত স্থানে ইহারা মেয়ে-পুরুষে মিলিয়া নাচ-গান করিয়া থাকে। সভ্যতার আলোক ইহাদের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করে নাই, তাই ইহাদের চালচলনে আদিম মানুষের জীবনধারাই বিদ্যমান। ইহাদের ধর্মবিশ্বাসে নানাবিধ দেবতার কল্পনা আছে এবং ইহারা বৃষ্টির দেবতা ও ঝড়ের দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জাঁকজমক নাই। পূর্বে ইহারা গাছের পাতা দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিত, বর্তমানে ইহাদের সমাজে কিছু কিছু কাপড়-জামার প্রচলন হইয়াছে। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই গলায় ও কোমরে লতা ও কাঠির মালা ধারণ করিয়া থাকে। মেয়েদের মধ্যে ঝিনুকের গহনাও প্রচলিত আছে; এই গহনা নিজেরাই তৈরী করিয়া থাকে। মেয়েরা গায়ে ও বুকে উল্কিও পরিয়া থাকে। শরীরের উপর এই উল্কিচিহ্ন-ধারণ, আদিম মানুষের একটি বিশেষ প্রথা।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পশুপালনের অর্থনীতি

পশুপালনঃ মানুষ যখন ধাপে ধাপে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়া সমাজবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইল তখন জীবিকা অর্জনের জন্য সে নিত্য নূতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিতে লাগিল। একদিন মানুষ বনে জঙ্গলে বাস করিত। তখন তাহার চারিপাশে ছিল নানা বন্যজন্তু। সে সেই সব বন্যজন্তুর সহিত সংগ্রাম করিয়া শুধু আত্মরক্ষাই করে নাই, ধীরে ধীরে সে অনেক জন্তুকে তাহার বশে আনিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছে। এইভাবে বনের জীবজন্তুকে পোষ মানাইবার ফলে মানুষের জীবন-যাত্রায় এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পোষা জীবজন্তুর দ্বারা শুধু যে মানুষের শিকারে সহায়তা হইল তাহা নহে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জন্তু তাহার খাদ্যহিসাবেও ব্যবহৃত হইল। অরণ্যচারী পশুকে মানুষ যেদিন হইতে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করিয়াছে, সেইদিন হইতে জনসমষ্টির জীবনধারায় নানা পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা, পরিধেয় যোগান, শ্রমের লাঘব করা, প্রহরীর কাজ করা ইত্যাদি বহু প্রকার উপকার মানুষ এইসব গৃহপালিত পশুদের নিকট হইতে পাইতে লাগিল। এইভাবে পশুপালনে অভ্যস্ত হইবার ফলে জনসমষ্টির অর্থ নৈতিক জীবনেও নানাপ্রকার সুবিধা দেখা দিল।

খাদ্য-সংগ্রাহক ও খাদ্য-উৎপাদকঃ বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের মতে কুকুরই মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু। বর্তমানে পৃথিবীতে যতপ্রকার আদিম মানুষ আছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই কুকুর ব্যবহার করিয়া থাকে। তুষারদেশের অধিবাসী এস্কিমোদের পক্ষে কুকুর অপরিহার্য। কোথাও কোথাও, যথা—আসাম ও পেরু অঞ্চলে—আদিবাসীরা কুকুরের মাংস খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। কুকুর সাধারণতঃ মানুষের দুই প্রকার কাজে লাগিয়া থাকে ; প্রথম—শিকারে সহায়তা করা ; দ্বিতীয়—প্রহরীর কাজ করা। কালক্রমে যখন বহুরকম ও প্রচুর সংখ্যক জীবজন্তুকে মানুষ স্ববশে আনিল, তখন এইসব গৃহপালিত পশুদের রক্ষণাবেক্ষণ একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। মানুষের ন্যায় ইহাদেরও খাদ্যের প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান করিতে

গিয়া মানুষ পশুপালন করিতে শিখিল। গরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল, হরিণ, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুগুলি যখন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাহাদের চরিয়া বেড়াইবার জন্য মাঠ এবং খাইবার জন্য ঘাস পাতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইল। সেই সঙ্গে ইহাদিগকে যত্নের সহিত পালন করিবার কথাও মানুষকে চিন্তা করিতে হইল। এইভাবে মানুষের সমাজে পশুপালক জনসমষ্টির উদ্ভব হইল। খাদ্যসংগ্রাহক জনসমষ্টির জীবনধারা হইতে এই পশুপালক জনসমষ্টির জীবনধারায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পশুপালক জনসমষ্টি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক,—যাহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, আর দ্বিতীয়,—যাহারা এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া থাকে। শেষোক্ত জনসমষ্টি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পশুচারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যও করিয়া থাকে। জীবিকার জন্য ইহারা কেবলমাত্র পশুচারণ কার্যের উপর নির্ভরশীল নহে। অর্থাৎ ইহাদের অর্থনীতিক জীবনে পশুচারণ ও কৃষিকার্য উভয়েরই সমাবেশ দেখা যায়। সুতরাং এই জনসমষ্টিকে আমরা খাদ্য-উৎপাদক জনসমষ্টি বলিতে পারি।

আমরা দেখিয়াছি যে খাদ্যসংগ্রাহক জনসমষ্টি (যেমন আন্দামানীরা) কোন খাদ্য বা পণ্য উৎপাদন করে না। ইহারা প্রধানতঃ জলে স্থলে প্রকৃতির দেওয়া ফল-মূল, জীবজন্তু শিকার ও সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের জীবন প্রকৃতি-নির্ভর। কিন্তু যাহারা খাদ্য-উৎপাদক (যেমন পার্বত্য অঞ্চলের জনসমষ্টি) তাহারা প্রকৃতির উপর কিছু পরিমাণে নির্ভরশীল হইলেও, চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালন দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। এইরকম খাদ্য-উৎপাদক একটি জনসমষ্টির জীবনযাত্রার কথা এইবার আমরা আলোচনা করিব। মনে রাখিতে হইবে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রার পদ্ধতির বৈষম্যের জন্য এই দুই শ্রেণীর জনসমষ্টির সমাজ ও সংস্কৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে।

আলমোড়াবাসীদের জীবনধারা ঃ

আবহাওয়া ঃ হিমালয় পর্বতমালার নিম্নাঞ্চলের দক্ষিণভাগে আলমোড়া জেলা অবস্থিত। সমুদ্রের সহিত এইস্থানের কোন সম্পর্ক নাই। তাই এখানকার আবহাওয়া পর্বতশ্রেণীর উচ্চতার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। আলমোড়া জেলা অত্যন্ত শীতপ্রধান, ইহার উত্তর অঞ্চলের শৈত্যই সর্বাধিক। সেই কারণে এইখানে কোন

গাছপালা জন্মিতে পারে না। আলমোড়ার মধ্যভাগেও শীতের প্রকোপ যথেষ্ট এবং বৎসরের মধ্যে সাতমাসকাল এই অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। সেই সময়ে এইখানকার জনসমষ্টি ও পশুসকল আরও দক্ষিণভাগে নীচের দিকে নামিয়া যায়। সমগ্র জেলার মধ্যে এই নিম্নাঞ্চলের আবহাওয়া সমতল ভূমির আবহাওয়ার ন্যায়।

শ্রমসাধ্য কৃষিকার্যঃ আলমোড়ার জনসমষ্টির জীবিকা হইল কৃষিকার্য। কিন্তু এই অঞ্চলে কৃষিকার্য অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। কারণ কৃষিক্ষেত্রগুলি ভূপৃষ্ঠ হইতে তিন হাজার ফুট হইতে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। সমগ্র আলমোড়া অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতশিখর এবং উপত্যকায় পরিপূর্ণ। প্রত্যেক উপত্যকার উপর দিয়া এক-একটি নদী প্রবাহিত। নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা এবং ইহারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। আলমোড়ার গভীর অরণ্যে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর বৃক্ষ পাওয়া যায়; যথা,—ওক, রডোডেণ্ড্রন ও পাইন। সমতলভূমির ন্যায় একটানা চাষের জমি আলমোড়ায় বিরল, তাই এই স্থানের কৃষিক্ষেত্র খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত। নদীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া পর্বতের নিম্নভাগ পর্যন্ত কৃষিকার্য হইয়া থাকে। উপত্যকা অঞ্চল অপেক্ষা নদীতীরে অবস্থিত কৃষিক্ষেত্রে ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আলমোড়া অঞ্চলে কৃষিকার্যের নানা অসুবিধা। কৃষিপ্রথাও সর্বত্র একপ্রকার নহে।

কৃষি ও পশুপালনঃ আলমোড়ার অধিবাসীরা অর্ধ-যাযাবর জীবন যাপন করে। পৃথিবীতে পার্বত্য অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনধারা প্রায় একই ছাঁচের। বলকান, পিরানিজ ও আল্পস্ অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনধারার সহিত তাই ভারতবর্ষে হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারার অনেক সাদৃশ্য আছে। আলমোড়ার অধিবাসীরা একস্থানে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারে না। কারণ পাহাড়ের মাটিতে কঠিন পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়াও তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; গৃহপালিত পশুগুলির চারণভূমি দুর্লভ বলিয়া, ঘাস-পাতার সন্ধানে তাহাদিগকে তাই স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। আলমোড়ার যে সব অধিবাসী এইভাবে অর্ধ-যাযাবর জীবনযাপন করিয়া থাকে, তাহারা 'ভোট' নামে পরিচিত এবং যে অঞ্চলে ইহারা বাস করে সেই অঞ্চলের নাম 'ভোট অঞ্চল'। আলমোড়ার উত্তর-পূর্ব অংশ ভোট অঞ্চল এবং বাকী অর্ধেক অংশ আলমোড়া অঞ্চল নামে পরিচিত। ভোটেরা সাধারণতঃ দুই প্রকার কার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে; যথা—কৃষিকার্য ও

পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বাসস্থান

পার্বত্য অঞ্চলে চাষ-বাস

পশুচারণ। পার্বত্য নদীর ধারে ধারে ইহাদের বসতি। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মত থাক কাটিয়া ইহাদিগকে চাষ-আবাদ করিতে হয়। অনেক সময়ে ইহারা গরুর বদলে নিজেরাই লাঙল টানিয়া থাকে।

ফসল ঃ ফসলের মধ্যে গমই প্রধান। বর্তমানে গম ভিন্ন আরো অনেকপ্রকার ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইগুলি প্রধানতঃ বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় ফসলের মধ্যে আলু প্রধান। একশত বৎসরের কিছু বেশি হইল আলমোড়া অঞ্চলে আলুর চাষ আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্তমানে ইহার চাষ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ফসল বাহিরে চালান যায় এবং আলু বেচিয়া লোকে প্রচুর পয়সা পায়। স্থতরাং আলমোড়ার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনে আলুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ওক গাছের বনের ঢালু জমিতেই আলুর চাষ হইয়া থাকে।

আলমোড়া অঞ্চলে দুইবার ফসল উৎপন্ন হয়। একটি বর্ষাকালীন ফসল (ইহাকে খারিফ ফসল বলে), অপরটি শীতকালীন ফসল (ইহাকে রবিশস্য বলে)। প্রথমটিতে জলসেচের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়টিতে প্রচুর জলসেচ দরকার হয়। গম ও আলু ভিন্ন অন্যান্য যে সব ফসল এখানকার জনসমষ্টি উৎপন্ন করিয়া থাকে সেগুলির মধ্যে, আখ, গাঁজা, তৈলবীজ ও নানাপ্রকার ফল উল্লেখযোগ্য। এখানকার কৃষিকার্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া থাকে। ফসল কাটার কাজটি মেয়েরাই করিয়া থাকে।

পোষাক ঃ আলমোড়া অঞ্চলে শীতের প্রকোপ খুব বেশি ; সেইজন্য স্থানীয় জনসমষ্টির পোশাক-পরিচ্ছদের পরিমাণ বেশি। পশুর লোম হইতে পশমের সূতা প্রস্তুত হয় এবং অধিবাসীরা ঐ সূতার দ্বারা জামা-কাপড় তৈরী করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

ঘোষযাত্রা ঃ আলমোড়ার জনসমষ্টির পশুচারকদল বৎসরের বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তরে—পর্বতের উচ্চ দিকে যাইয়া থাকে। পশুচারণ এই অঞ্চলে একটি বিশেষ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হয়, না গিয়া উপায় নাই। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দল বাঁধিয়া এই যাত্রা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন ঋতুতে পশুচারণ-ক্ষেত্রে যাওয়া এইস্থানের জনসমষ্টির জীবনযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যই এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে
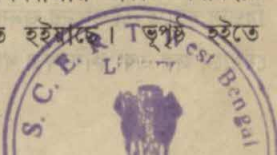
আট-দশ-হাজার ফুট উর্ধ্বে হিমালয়ের পশুচারণ-ক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। গ্রীষ্মকালেই সাধারণতঃ এই অঞ্চলগুলি পশুচারণের পক্ষে উপযোগী। সুতরাং চৈত্রমাসের মাঝামাঝি পশুচারকদল ঐসব পশুচারণক্ষেত্রে রওনা হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ চারবার—চৈত্র, আষাঢ়, ভাদ্র এবং আশ্বিন—ইহারা উপরের দিকে পশুচারণক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া থাকে। গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি লইয়া ইহারা দুর্গম পার্বত্য পথে বহির্গত হয়। সমগ্র পরিবারই এই সময় সঙ্গে চলিয়া থাকে।

চারণক্ষেত্রে জীবনযাত্রাঃ পশুচারণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পর পশুপালকদলের প্রথম কাজ হইল আবাস নির্মাণ। বিভিন্ন গ্রামবাসী এবং বিভিন্ন পরিবার এই সময়ে একটি যৌথ পরিবারের মত একত্রে বাস করে। সকলে মিলিয়া একটি পশুচারণক্ষেত্র বাছিয়া লয় এবং উহার ঠিক মধ্যস্থলে একটি সমতল স্থানে থাকে পশুচারণের বিবিধ সরঞ্জাম। গাছের ডাল, খড় অথবা কাঠ দিয়া এইসব সাময়িক আবাস তৈরি হয়। বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী করিয়া প্রধানতঃ চারি প্রকার গৃহ নির্মিত হইয়া থাকে। আলমোড়ার উপরের অঞ্চলে যাহারা বাস করে তাহাদিগকেও নিম্নের অঞ্চলে এইভাবে পশুচারণার জন্য যাইতে হয়। পশুচারণ-ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় বাস করিবার পর আবার ইহারা তাহাদের পূর্ব বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। এই পশুচারণ এইখানকার জনসমষ্টির জীবনে শুধু বৈচিত্র্য আনিয়া দেয় না, ইহা দ্বারা তাহাদের অর্থনৈতিক সুবিধাও কিছু হইয়া থাকে। পশুচারণের ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অন্যান্য কাজকর্ম করিয়া থাকে। বিভিন্ন গ্রামের গরু-মহিষের সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার আদান-প্রদান ও বেচাকেনাও চলিয়া থাকে। ইহার ফলে ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি পায়।

বসতি-বিন্যাসঃ আলমোড়া অঞ্চলের যে জনসমষ্টির কথা আমরা বলিতেছি তাহাদের প্রত্যেক পরিবারেরই স্থায়ী বাসস্থান আছে। ইহাদের বসতিবিন্যাস সাধারণতঃ এইরকম: কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গ্রাম; এইরূপ কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি গ্রামসমষ্টি। গ্রামগুলি নদীতীর হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত উপত্যকায় পর পর অবস্থিত। এই অঞ্চলে অসংলগ্ন বা বিক্ষিপ্ত গ্রাম কোথাও নাই। এই বসতি-বিন্যাস হইতে এইস্থানের জনসমষ্টির যৌথজীবনের প্রতি অনুরক্তি বুঝিতে পারা যায়। যেখানে জল এবং কৃষিক্ষেত্র থাকে, গ্রামগুলি সেইখানেই অবস্থিত। সাধারণতঃ পাথরের

দেওয়ালের উপর কাঠ ও খড়ের চালা দিয়া ইহাদের বাসস্থান তৈরি হইয়া থাকে। দেওয়ালগুলি গোবর দিয়া লেপিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এক-একটি পরিবারের জন্য একখানি বা দুইখানি করিয়া কুটির নির্মিত হয়।

হাট ও মেলা ঃ এই অঞ্চলের জনসমষ্টির প্রধান সমস্যা হইল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা। ইহাদের আবাসস্থলের সন্নিকটে বিশেষ কোনো হাট-বাজার থাকে না। সুতরাং এখানে দৈনিক বাজারের কোনো প্রশ্ন নাই। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে তাই এখানে হাট ও মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা হইতে তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়া থাকে। বর্তমানে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া এই অঞ্চলের পথঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মেলাগুলিও বেশ বড় হইতেছে। এই অঞ্চলে সাধারণতঃ দুই প্রকার হাট বসিয়া থাকে। একটি সাপ্তাহিক, অপরটি দ্বি-সাপ্তাহিক। শীতকালে সাধারণতঃ বড় বড় মেলা বসিয়া থাকে। এই সব মেলায় প্রচুর পণ্যদ্রব্য আসিয়া জড় হয় এবং বিক্রেতারা অস্থায়ী দোকানঘর নির্মাণ করিয়া তাহাদের পণ্যসম্ভারগুলি বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সব মেলায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর বিক্রেতারা আসিয়া থাকে। মেলায় খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে গৃহপালিত পশুও বিক্রয় হইয়া থাকে। সাধারণতঃ টাকার বদলে জিনিষ বিনিময় দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় চলে।

মেলার গুরুত্ব ঃ আলমোড়ার জনসমষ্টির জীবনে এই মেলার গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ ইহারই মাধ্যমে তাহারা যেমন কেনা-বেচা করিয়া থাকে, তেমনি পরস্পরের সহিত মেলামেশার সুযোগও পায়। ইহাই তাহাদের জীবনে ঐক্যবোধের কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। সমগ্র জেলায় বৎসরে প্রায় একশত মেলা হয় এবং প্রত্যেক মেলায় গড়ে এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হয়। মেলায় কেনাবেচা ভিন্ন উৎসবের আয়োজনও থাকে। পর্বতবাসী এই জনসমষ্টির সমাজ ও জীবনযাত্রায় আমরা দেখিলাম যে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের প্রভাব বিশেষ প্রবল এবং ইহারই ভিতর দিয়া ইহাদের যৌথ জীবনের ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান দ্বারা ইহাদের সমাজজীবনে একটি সুদৃঢ় ঐক্যভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজজীবনে কৃষি

কৃষি ও জলসেচঃ আমরা শিকারজীবী আন্দামানী ও পশুপালক আলমোড়াবাসীদের সমাজের কথা আলোচনা করিলাম। এইবার আমরা কৃষিপ্রধান গ্রাম্য সমাজের কথা বলিব। সভ্যতার অগ্রগতির পথে মানুষ যেদিন কৃষিকার্য করিতে শিখিল সেইদিন হইতে তাহার জীবনযাত্রায় এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিল। জমির সহিত মানুষের সম্পর্ক যেদিন হইতে নিবিড় হইয়া উঠিল, সেইদিন হইতে মানুষের জীবনধারা এক সম্পূর্ণ নূতন খাদে বহিতে শুরু করিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের যে চারিটি মৌল প্রয়োজন তাহার মধ্যে খাদ্য একটি। এই খাদ্যের জন্য প্রথমে তাহাকে আরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করিতে হইত। এইজন্য খাদ্যের ব্যাপারে সে তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। কৃষিকার্যে লিপ্ত হইবার পর হইতে খাদ্যসংগ্রহ বিষয়ে তাহার দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমিয়া গেল। কৃষিকার্য-উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জলসেচের ব্যবস্থারও উদ্ভাবন করিল। কৃষিকার্য প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে; কিন্তু যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপ্রচুর, সেখানে জলসেচের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মিশর ও চীন দেশে কৃষিকার্য খুব উন্নত স্তরে উঠিয়াছিল এবং এই দেশে জলসেচের ব্যবস্থাও খুব প্রাচীন।

উর্বরতাঃ কিন্তু জলসেচই কৃষিকার্যে সফলতার একমাত্র উপকরণ নহে। কৃষিকার্য একান্তভাবেই নির্ভর করে ভূমির উর্বরতার উপর। সভ্য মানুষ দিন দিন কৃষিকার্যে যতই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল ততই সে বুঝিতে পারিল যে, একই স্থানে কয়েক বৎসর ফসল উৎপন্ন হইবার পরে জমির উর্বরতা কমিয়া যায়। অনুর্বর জমিতে কৃষিকার্য চলে না। অতএব জমির উর্বরতা বজায় রাখিবার জন্য মানুষকে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। মানুষ জমিতে সার দিতে শিখিল। আধুনিক কালে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কৃষিকার্যে সর্বত্র সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সার প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা—ধাতব সার এবং জৈবসার। বর্তমানে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বাহির হইবার ফলেও কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার

ফলে এই যুগে কৃষিকার্য প্রায় বাণিজ্যের স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উৎপন্ন শস্যের আমদানী-রপ্তানী দ্বারা চাষীদের অর্থনৈতিক জীবনে পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে। প্রাচীন কালের তুলনায় এখনকার কৃষি অনেক উন্নত।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ ঃ ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলিয়া বিখ্যাত। বাংলা দেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদ দুইটি—ধান ও পাট। এই দেশে দুইবার শস্য হয়—প্রথম ফসল হয় বর্ষাকালে, ইহার নাম খারিফ শস্য এবং শীতকালের ফসলের নাম রবিশস্য। খারিফ শস্যের মধ্যে ধান, পাট ও আখ প্রধান এবং রবিশস্যের মধ্যে প্রধান গম, ডাল, চা, তৈলবীজ, আলু ও শাকসব্জী। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাস খারিফ শস্যের বীজ বপনের সময়। এই সময়কার ফসল একান্তভাবেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। এই ফসল শীতের পূর্বেই আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে কাটিয়া শেষ করিতে হয়। চাষীরা খারিফ ফসল ঘরে তুলিয়া রবিশস্যের রোপন আরম্ভ করে। বৎসরের শেষ দুইমাস ফাল্গুন ও চৈত্রে শস্য পাকে এবং তখনই উহা কাটিবার সময়।

ধান ঃ ধান প্রধানতঃ তিন রকম; যথা—বোরো ধান, আউস ধান ও আমন ধান। আমন ধানই পশ্চিম বাংলার প্রধান শস্য। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে রোপন করা হয়। এই ফসল শীতকালে কাটা হয়। ধানের মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট। প্রথমে একটি ক্ষেতে আমনের বীজ বপন করা হয়; তারপর ছোট ছোট ধানের চারাগুলি তুলিয়া চাষ-করা অন্য ক্ষেতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। বর্ষার পরে শীতের সময়ে জলাভূমি যখন শুকাইয়া যায় তখন বোরো ধান বপন করা হয়। এই ধানের চাল সুখাদ্য নয়। আউস ধানের চালও আমন ধানের তুলনায় মোটা ও নিকৃষ্ট। তবে আউস ধান তাড়াতাড়ি পাকে ও খুব শীঘ্র ফসল দিয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে অধিক পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ-পরগণা ও মুর্শিদাবাদে আমন ধানের চাষ বেশী। নদীয়া জেলা আউস ধানের চাষের জন্য বিখ্যাত। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে আমিন, আউস ও বোরো তিন রকমের ধান হয়। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় কিছু পরিমাণ বোরো ও আউস ধান হয়। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙেও আমন ধান হইয়া থাকে।
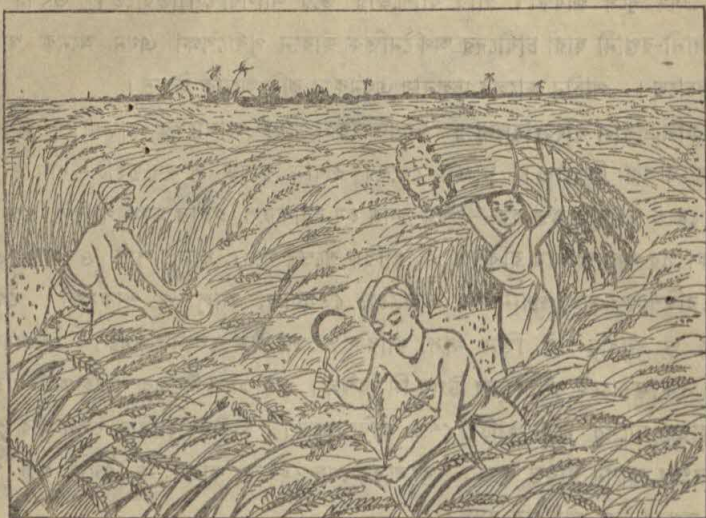
ধানক্ষেত

পাটক্ষেত

পাট : ধানের পরই বাংলাদেশের প্রধান শস্য পাট। শুধু প্রধান শস্য নয়, এই পাট হইল অর্থকরী শস্য, অর্থাৎ বাংলার পাট ও পাটজাত দ্রব্য সমগ্র পৃথিবীতে বিক্রয় হয় এবং ইহার ফলে প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে। অবিভক্ত বাংলায় পাট উৎপাদনে আমাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এইজন্য পাটকে বলা হইত Golden Fibre of Bengal এবং এই কথার মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গই পাটচাষের জন্য প্রসিদ্ধ। সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রচুর পরিমাণ পাট এই অঞ্চলেই হইয়া থাকে। কিন্তু বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য এই পাট পশ্চিমবঙ্গে আসিত, কারণ কলিকাতা বন্দর হইতেই উহা বিদেশে রপ্তানী হইত। ইহা ভিন্ন, সমস্ত চটকল পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বলিয়া পূর্ববঙ্গের উৎপন্ন পাটের চাহিদা এই অঞ্চলেই বেশী ছিল। বর্তমানে কিন্তু ভারত-বিভাগের পর এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান মোট উৎপন্নের প্রায় ৭০ ভাগ পাট উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পে সঙ্কট দেখা দেয়। এই অবস্থার সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই এখন অধিক পাট উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে এবং ইহার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় পাট-উৎপাদন সমিতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গে এখন পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ও উন্নত ধরণের পাটও জন্মিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মোট পাটের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপন্ন হয় মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, মালদহ, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও হুগলী জেলায়। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে পাটের উৎপাদন বেশি। গ্রীষ্মকালীন প্রবল বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে নদীবাহিত পলিমাটির জমিতে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাট রোপন করা হয় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে উহা তোলা হয়। ধানগাছের তুলনায় পাটের গাছ উচু—ইহা দশ-বারো ফুট উচু হয়। পাটের বীজ ছড়াইয়া বুনিতে হয় এবং পাটগাছ বড় হইলে উহা কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। ভিজিয়া নরম হইলে উহার ভিতর হইতে আঁশ ছাড়াইয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। সেই শুকনা পাটই গাঁট বাঁধিয়া সর্বত্র চালান যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট চাষের জমির দশভাগ অংশে পাটের চাষ হইয়া থাকে।

পাটশিল্প : এই পাট একটি বৃহৎ শিল্পের জন্ম দিয়াছে। পাট হইতে নানাপ্রকার সরু ও মোটা দড়ি ও চট তৈরী হয়। পাট হইতে কার্পেট, সতরঞ্চ ইত্যাদিও প্রস্তুত

হইয়া থাকে। নানাবিধ মাল বহনের জন্য চটের থলি প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর বাণিজ্যে ভারতের পাটের থলির একাধিকার সকলেই স্বীকার করে। পাট হইতে কাগজও তৈরী হয়। পাট হইতে বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরী হয় বলিয়া পাটশিল্প পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের একটি প্রধান শিল্প বলিয়া পরিগণিত। ভারতে যতগুলি চটকল আছে তাহার প্রায় সব কয়টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এইসব চটকলগুলি হুগলী নদীর তীরে এবং এই চটকলগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া হুগলী নদীর উভয় তীরে অনেকগুলি শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব শিল্পনগরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রকার জনসমষ্টির সমাবেশ দেখা যায়।

চা ঃ ধান ও পাটের পরই উল্লেখযোগ্য শস্য চা। ভারতবর্ষেই প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর মধ্যে চা-উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়, কিন্তু রপ্তানীতে প্রথম। বিদেশে ভারতবর্ষই এখন সবচেয়ে বেশী পরিমাণ চা রপ্তানী করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল চায়ের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চল ও দার্জিলিঙ—এই দুইটিই পশ্চিমবঙ্গের চা-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। চা-গাছও বীজ হইতে জন্মায়, কিন্তু ইহার চাষ ধান বা পাটের মত নহে। পাহাড়ের ঢালু জমিই ইহার চাষের উপযোগী। চায়ের চাষে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন হয়। বহুদূর বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর প্রথমে চায়ের গাছ লাগান হয়। তারপর চায়ের চারাগাছ ছয়মাস হইতে তিন বছর পর্যন্ত চারাঘরে (nursery) সযত্নে পালন করা হয়। বেশী রোদ লাগিলে চারাগাছ নষ্ট হইয়া যায়। তারপর সেই চারাগাছ তুলিয়া একটি একটি করিয়া ক্ষেতে অন্ততঃ চার ফুট অন্তর রোপন করিতে হয়। চা-গাছগুলি ঝোপের মত বাড়িয়া উঠে বলিয়া মধ্যে মধ্যে ছাঁটাই করিতে হয়।

চা তৈরীর জন্য চা-গাছের শীর্ষদেশের দুইটি পাতা ও একটি কুঁড়ি তোলা হয়। কিন্তু তখনই উহা খাইবার উপযুক্ত হয় না। পাতাগুলি প্রথমে একটি বিশেষ ভাবে উত্তপ্ত ঘরের মেঝের উপর বিছাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। পাতা যখন ঈষৎ চুপসাইয়া যায়, তখন ঐ চুপসান পাতা এক-একটি রোলারের মধ্যে দেওয়া হয়। যে পরিমাণ পাতা দেওয়া হয়, ঠিক সেই পরিমাণ চা কিন্তু পাওয়া যায় না। ৩০০ পাউণ্ড পাতায় সাধারণতঃ ১০০ পাউণ্ড মত চা পাওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে খাইবার চা তৈরী হইয়া থাকে। শেষ প্রক্রিয়ায়

চা-বাগান
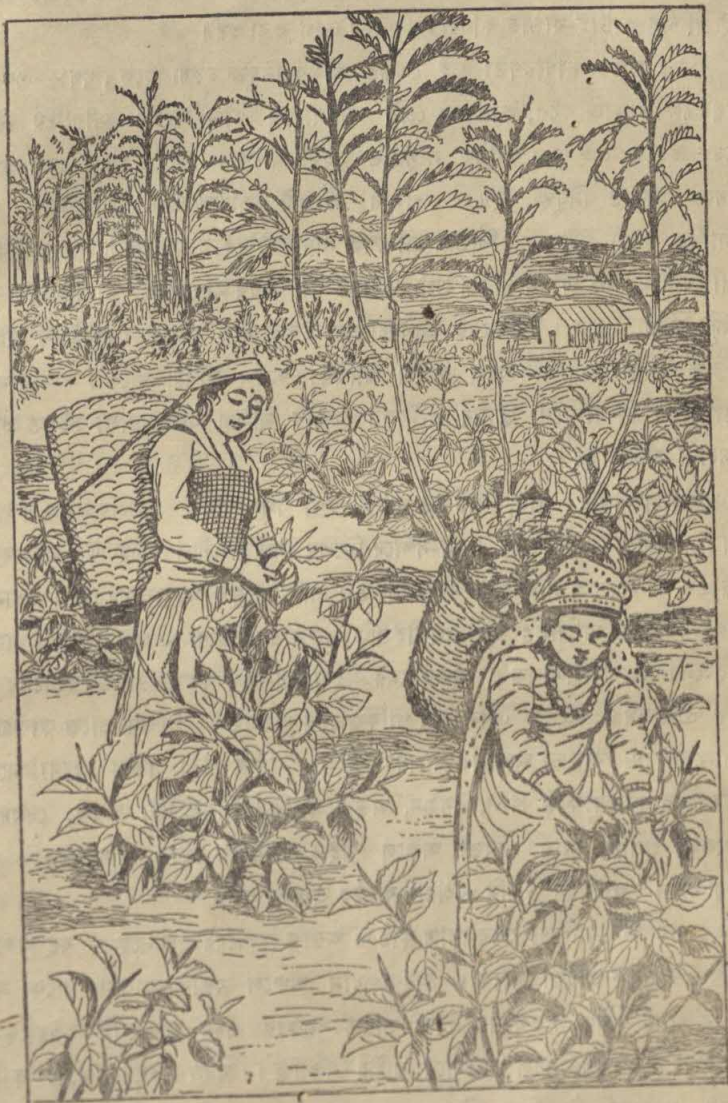
গরম বাতাস দিয়া পাতাগুলি শুকাইতে হয়। শুকনা পাতা প্রথমে বেশ বড় থাকে। এই পাতাই কাটাই-বাছাই করিয়া নয় রকমে ভাগ করা হয়।

চায়ের চাষে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর শ্রমিক নিযুক্ত হইয়া থাকে ; যথা—একশ্রেণী চায়ের ক্ষেতে কাজ করে, আর এক শ্রেণী কারখানায় কাজ করে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এই সব শ্রমিক সংগৃহীত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার শ্রমিকই ইহাতে নিযুক্ত হয়। তোলার কাজটি সাধারণতঃ মেয়ে-শ্রমিক দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী হইলেও, চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে যে সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে, উহাতে পরস্পরের মধ্যে বেশ আত্মীয়তার ভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্যের মধ্যেও বেশ ঐক্য আছে। বহু লক্ষ শ্রমিক চা-বাগানে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। আসাম ও উত্তর-বঙ্গের চা-বাগানে স্থানীয় শ্রমিকের অভাব বলিয়া অন্যান্য রাজ্য হইতে শ্রমিক আমদানী করিতে হয়।

বনজ-সম্পদ ঃ ধান, পাট ও চা-র কথা বলা হইল। এইবার বনজ সম্পদের কথা। আমাদের ভারতবর্ষ বনজ-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। এই উপ-মহাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া অরণ্য বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যসম্পদ এখন প্রধানতঃ উত্তর সীমান্তের দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলার অরণ্যে এবং দক্ষিণ সীমান্তের সুন্দরবনের অরণ্যে সীমাবদ্ধ। সুন্দরবনের অরণ্য প্রসিদ্ধ ; কিন্তু ভারত-বিভাগের পর ইহার প্রায় সমগ্র অংশই এখন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত। পশ্চিম প্রান্তে ঝাড়গ্রাম, আসানসোল ও বাঁকুড়া অঞ্চলেও শালবন আছে। কিন্তু উহা গভীর অরণ্য নহে। পশ্চিমবঙ্গের সমতলক্ষেত্রে শাল, সেগুন, অর্জুন, শিরিস, শিমুল, বট, অশ্বথ, দেবদারু, নারিকেল, সুপারি আর পার্বত্য অঞ্চলে পাইন, দেবদারু, ফার, স্প্রুস প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয়া যায়। সুন্দরবন সুঁদরি ও গরাণ কাঠের জন্য প্রসিদ্ধ।

অরণ্যের উপযোগিতা কেবলমাত্র কাঠ ও অন্যান্য সম্পদের জন্য নহে। বহু অরণ্যে নানাবিধ ওষধিবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। অরণ্যপ্রধান অঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা থাকে না। এই কারণেই অরণ্য-সংরক্ষণের প্রতি ভারত সরকার এখন মনোযোগী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের বৃহৎ অরণ্যগুলি বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। বনজ-সম্পদের মধ্যে কাঠই প্রধান। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এবং মানুষের সামাজিক জীবনে এই কাঠের

ব্যবহার ও উপযোগিতা যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রথমতঃ ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য শাল, সেগুন, বাবলা, ওক, সুঁদরি প্রভৃতি বহু বৃক্ষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলে কাঠের ঘরই বেশি এবং এই ঘর তৈরি করিতে সাধারণতঃ শাল ও অর্জুন বৃক্ষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ ছাড়া কৃষিকার্যের লাঙল, গৃহের আসবাবপত্র রন্ধনের জ্বালানি ও কাগজ তৈরি, প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপারে কাঠের প্রয়োজন।

এই কাঠ আমরা কিভাবে সংগ্রহ করি? ভারতের অধিকাংশ অরণ্যই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। এমন অনেক স্থলে অরণ্য রহিয়াছে যেখানে আজও যান-বাহনের কোন ব্যবস্থা নাই। এই কারণে অনেক অরণ্যের সম্পদ আহরণ করা যায় না। অরণ্যের কাঠ সাধারণতঃ আমরা নদীপথেই পাইয়া থাকি। কোন কোন অঞ্চলে কাঠ কাটিয়া খরস্রোতা পার্বত্য নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, উহাই নদীস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পৌছায়। তারপর সেখানে ঐ কাঠ সংগ্রহ করা হয়। আসাম ও উত্তরবঙ্গে এইভাবে নদীপথে কাঠ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

যানবাহন : আমরা এতক্ষণ ধান, পাট প্রভৃতির উৎপাদনের কথা বলিলাম। এখন এইসব দ্রব্য আমাদের নিকট কিভাবে আসিয়া পৌছায় সেই কথা আলোচনা করিব। কেননা খাদ্যদ্রব্যের বা ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদনই যথেষ্ট নহে—ঐ উৎপন্ন দ্রব্য চাষীর ক্ষেত হইতে, চা-বাগান হইতে বা বন হইতে কিভাবে নানা জায়গায়, হাট-বাজারে, বন্দরে ও কলকারখানায় পৌছায় তাহাই হইল আসল কথা। ইহারই জন্য প্রয়োজন যানবাহনের। সভ্যতার প্রায় প্রথম হইতেই মানুষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। আদিম যুগের মানুষ পায়ে হাঁটিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইত। তারপর সে বনের পশুকে মালবহনের কার্যে নিযুক্ত করিল এবং অবশেষে নানাবিধ যানবাহন উদ্ভাবন করিতে শিখিল। এইভাবেই মানুষ গরু-ঘোড়ার গাড়িতে চড়া ও বোঝা বহন করা, বাষ্পীয় যানে চলা ও মাল বহন করা, জলপথে নৌকায় চলা ও মালবহন করা এবং বর্তমানে মানুষ বিমানে চড়িয়া আকাশে চলিতে ও মালবহন করিতে শিখিয়াছে। সভ্যতার পথে মানুষের ইতিহাস তাই অগ্রগতির ইতিহাস। মানুষ যদি না চলিতে শিখিত বা একস্থান হইতে অন্যস্থানে সে যদি জিনিসপত্র বহন করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিতে না পারিত, তাহা হইলে সে আজিকার মতন এই উন্নত সমাজ ও সভ্যতা কিছুতেই গড়িয়া তুলিতে পারিত না।

আজও পৃথিবীতে যেসব আদিম মানুষ বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে যান-বাহনের কোনো ব্যবস্থা নাই এবং তাহাদের সমাজজীবনেও কোনো উন্নতি বা অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। পরিবহনের ব্যবস্থার অভাবেই এইসব দেশ আজও অনুন্নত রহিয়াছে। সুদূর গ্রামগুলির প্রতি তাকাইলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, পরিবহনের সুব্যবস্থার অভাবেই এইসব অঞ্চল অনুন্নত রহিয়াছে। আবার অন্যদিকে যেখানেই চলাচলের সুবিধা এবং পরিবহনের সুবিধা বর্তমান, সেখানকার জনসমষ্টির জীবনধারা অপেক্ষাকৃত উন্নত ও প্রগতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গতি ভিন্ন সভ্যতার প্রগতি নাই—সমাজেরও উন্নতি নাই। পৃথিবীতে যদি চলাচলের ব্যবস্থা না থাকিত, যদি পরিবহনের ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের জীবনযাত্রা একপ্রকার অচল হইত। পরিবহন তাই সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য এবং অতি প্রয়োজনীয়।

এই যে ধান, পাট, চা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়, সেগুলি এখন গ্রাম হইতে হাটে, হাট হইতে গঞ্জে এবং গঞ্জ হইতে বাণিজ্যকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয় ও অবশেষে উহা চালকলে ও পাটকলে চালান দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে মালবহনের জন্য বহুপ্রকার যান-বাহনের প্রচলন আছে। তবে স্থলপথে গরুর গাড়ি ও রেলগাড়ি এবং জলপথে নৌকা ও স্টীমারযোগেই মাল চলাচলের ব্যবস্থা। গ্রামাঞ্চলের ধান গরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া নিকটবর্তী কোন রেল ষ্টেশনে লইয়া আসা হয় এবং সেখান হইতে উহা রেলযোগে বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। স্থলপথে আজকাল মোটর লরীর প্রচলন হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্গম মেঠো রাস্তায় গরুর গাড়ি ভিন্ন মালবহনের আর কোনো উপায় নাই। ভারতে প্রায় ৯০ লক্ষ গরুর গাড়ি প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টন মাল বহন করিয়া থাকে। গরুর গাড়ির পর গ্রামাঞ্চল হইতে মালবহনের দ্বিতীয় উপায় নৌকা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নদীপথই বেশী; তাই সেখানে মাল পরিবহনের জন্য নৌকার ব্যবস্থাই সমধিক প্রচলিত। পার্বত্য অঞ্চলে গরুর গাড়ি চলিবার সুবিধা নাই বলিয়া সেখানে মালবাহী পশু এবং মোটর লরীর প্রচলন হইয়াছে। চা-বাগানগুলিতেও মাল বহনের এই ব্যবস্থাই রহিয়াছে।

চাষীর জীবনযাত্রা ঃ এইবার আমরা কৃষিজীবী মানুষের জীবনযাত্রার কথা বলিব। কৃষিজীবীদের সমাজ পর্বতবাসীদের সমাজের ন্যায় অস্থায়ী নহে। ইহাদের

মাল বহনের ব্যবস্থা : জলপথে নৌকা ; স্থলপথে গরুর গাড়ী

পার্বত্য অঞ্চলে মালবাহী পশু

অর্থনীতিক জীবনের স্থায়িত্ব আছে। একস্থানে বাস করিয়া ইহাদের পক্ষে চাষবাস করা, খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং উৎপন্ন পণ্যদ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব বলিয়া কৃষিজীবী জনসমষ্টির জীবনযাত্রা সুস্থ এবং স্থায়িভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা বিকশিত হইয়াছে। এই গোষ্ঠী-চেতনা হইতে চাষীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হইয়াছে।

বাংলাদেশ, বিশেষ করিয়া দক্ষিণবঙ্গ কৃষিপ্রধান। এই কৃষিপ্রধান জনসমষ্টি গ্রামেই বাস করে। এই গ্রাম্য জনসমষ্টির মধ্যে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর মানুষ আছে—কৃষক বা চাষী, কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত জনসমষ্টি, জেলে ও মধ্যবিত্ত। ইহারা সকলেই স্থায়ী ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করে। ইহাদের গৃহগুলি সাধারণতঃ মাটির দেওয়ালের উপর খড় বা পাতা দিয়া আচ্ছাদিত। যাহাদের অবস্থা একটু ভালো তাহারা টিনের চাল দেয় এবং যাহারা একটু বিত্তবান তাহারা ইটের পাকাবাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করে। গ্রামের জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও কর্মময়; এমন কি, গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা পর্যন্ত কিছু না কিছু কাজ করিয়া থাকে। যে কোনো একটি গ্রামে গেলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, সেখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকলেই নিজ নিজ কাজ করিতেছে, কেহ বসিয়া নাই। চাষী মাঠে চাষ করিতেছে, জেলে মাছ ধরিতেছে, কামার হাপরে বসিয়া লোহার জিনিস তৈরী করিতেছে, কুমার মাটির দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে, তাঁতী কাপড় বুনিতেছে আর মেয়েরা ধান কুটিতেছে। এই রকম কোন না কোন একটি কাজে সকলে নিযুক্ত আছে। তারপর সারাদিন কাজকর্মের পর তাহারা গ্রামের হাটে-বাজারে বা চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মিলিত হয়; সেখানে তাহারা নানা বিষয় আলোচনা করে, পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথাও আলোচনা হয়। আবার গ্রামে যখন কোনো উৎসব হয় তখন সকলে মিলিয়া সেই আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দেয়। শহরের জীবনযাত্রায় ন্যায় গ্রাম্যজীবনযাত্রায় কোনো কৃত্রিমতা নাই। সমাজ-জীবন এখানে সহজ।

চা-বাগানের জীবনযাত্রা: আবার চা-বাগানে যাহারা কাজ করে, সেই জনসমষ্টির জীবনধারা কিন্তু স্বতন্ত্র। প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা দরকার—চা-বাগানের জনসমষ্টির জীবনযাত্রায় সমাজ-বোধ খুব কম, কারণ উহারা কোনো একটি সমাজের আশ্রয়ে বাস করে না। এখানকার জনসমষ্টি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত শ্রমিক-

দ্বারা গঠিত। বেশির ভাগ শ্রমিকই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চা-বাগান ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চা-বাগানের শ্রমিককে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—প্রথম, যাহারা চায়ের ক্ষেতে কাজ করে আর দ্বিতীয়, যাহারা কারখানায় কাজ করে। তবে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত এই জনসমষ্টি একান্ত আত্মীয়ের মতই পাশাপাশি বাস করে। চা-বাগানই তাহাদের পৃথিবী। বাগানের কাজ আর ঘর-সংসার, ইহাই তাহাদের জীবনের আশ্রয়। তবে গ্রাম্য সমাজের জনসমষ্টির মধ্যে যে বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহা দেখা যায় না। কারণ এখানকার জনসমষ্টি মুলতঃ একটি শ্রমিক উপনিবেশ। তবে বাগানের কুলিদের মধ্যে অনেকে এখন স্থায়ী অধিবাসী হইয়া দুই-তিন পুরুষ বাস করিতেছে এবং চাষ-আবাদ করিয়া পারিবারিক জীবনযাপন করিতেছে।

পার্বত্য গ্রাম: সমতলক্ষেত্রের জনসমষ্টির বসতি হইতে পার্বত্য অঞ্চলের জনসমষ্টির বসতির পার্থক্য অনেক—তাহাদের গ্রাম ও শহরের বৈচিত্র্যও অনেক। ভারতে বহু-প্রকারের পার্বত্য গ্রাম দেখা যায়। এইসব গ্রামের পার্থক্য নির্ভর করে ভূ-খণ্ডের সংস্থান, জলবায়ুর অবস্থা এবং পরিবেশের উপরে। উচ্চ পর্বতের উপরে এক ধরনের গ্রাম দেখা যায়, আবার কোথাও বা পার্বত্য নদীর তীরে আর এক রকমের গ্রাম দেখা যায়। কোন গ্রাম উপত্যকার উপর, কোন গ্রাম ঝরনার পাশে, কোন গ্রাম অরণ্যের মধ্যে, আবার কোন গ্রাম নদীতীরে অবস্থিত। জলবায়ুর তারতম্যের জন্য পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামগুলি নানা প্রকারের হইয়া থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে কেবলমাত্র গ্রামগুলির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা নহে, এখানকার শহরগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমাজ-জীবনে শিল্প

কৃষি ও শিল্প ঃ আমরা কৃষিপ্রধান সমাজের কথা আলোচনা করিলাম। এইবার আমরা শিল্পাঞ্চলের সমাজের কথা বলিব। কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে মানুষের সভ্যতা অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। সমাজ-জীবনে কৃষির যেমন, শিল্পেরও তেমনি উপযোগিতা আছে। বর্তমান সমাজ-জীবন কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর নহে, ইহা অনেকখানি শিল্প-নির্ভরও বটে। কৃষিজাত দ্রব্য হইতে প্রধানতঃ তিনটি শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, যথা চালকল, পাটকল ও চায়ের কারখানা। এই তিনটি শিল্পের কাঁচামাল হইল যথাক্রমে—ধান, পাট ও চা। অন্যান্য শিল্পগুলিতে যে সব কাঁচামাল প্রয়োজন হয় সেগুলি আমরা পাই খনি হইতে। তাই শিল্পের জন্য দুই প্রকার কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল। সোনা, রূপা, লৌহ, তামা, কয়লা, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ।

শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতা ঃ বর্তমান সভ্যতা শিল্পপ্রধান সভ্যতা। তাই মানুষের এখনকার সমাজ-জীবনে শিল্পের প্রভাব অসীম। যন্ত্রযুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় যে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা শিল্পজাত দ্রব্যের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। তথাপি ইহা সত্য যে যান্ত্রিক যুগের পূর্বে বাংলা দেশে যেসব শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইত সমস্ত পৃথিবীতে তাহার সমাদর ছিল। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, ইংরেজ আসিবার বহু পূর্বে দক্ষিণ বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে বাংলার বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য যথা, মসলিন ও রেশমের কাপড়, মাটির পাত্র, কাঠের জিনিস ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে বাংলার শিল্প ক্রমশঃ অবনতির পথে যায়। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে রাণীগঞ্জে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইল। তখন হইতে বাংলাদেশে আবার শিল্পের পুনরভ্যুথান দেখা দেয়। তাহার পর ধীরে ধীরে কলিকাতা বন্দর গড়িয়া উঠিল এবং এই কলিকাতাকেই কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ দেখা দিল।

কোনো দেশে শিল্প গড়িয়া উঠিবার পক্ষে কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে কাঁচামালই প্রধান। তাহার পর উপযুক্ত নদীপথ, যানবাহনের ব্যবস্থা, প্রচুর সংখ্যক কারিগর এবং শ্রমিক দরকার। সর্বোপরি প্রয়োজন মূলধনের। এই এতগুলি জিনিসের সমবায়েই একটি শিল্প গড়িয়া ওঠে। বাংলাদেশে ইহার কোনটিরই অভাব নাই, তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে এই রাজ্যে শিল্পের পত্তন হয় এবং প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর হইতেই এই শিল্পের প্রসার দ্রুত বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে। আমরা এইবার বাংলার শিল্প-প্রচেষ্টার কথা আলোচনা করিব।

প্রাকৃতিক অবস্থান ও কাঁচামালের পর্যাপ্ততার জন্য বাংলার বহু স্থানেই বিবিধ শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য : (১) কয়লা শিল্প ; (২) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। (৩) রেশম শিল্প ; (৪) পাট শিল্প ; (৫) শর্করা শিল্প ; (৬) চা শিল্প ; (৭) কাগজ শিল্প ; (৮) চামড়া-প্রস্তুত শিল্প ; (৯) দিয়াশলাই শিল্প ; (১০) মোটর নির্মাণ ও রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা। এইসব বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত জনসমষ্টি দ্বারা শিল্পাঞ্চলে এক নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমাজের জীবনযাত্রার কথা আমরা পরে বলিব।

লৌহ ও কয়লা শিল্প : এই রাজ্যের বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে পরিগণিত। এই শিল্প দুইটির অবস্থানক্ষেত্রও প্রায় এক। আধুনিক যুগে লৌহ এবং কয়লার প্রাধান্য বড় কম নহে। কয়লা হইতে আমরা অগ্নি, বাষ্প, বিদ্যুৎ সবই পাইয়া থাকি। শিল্পের রাজ্যে কয়লার প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশি। এমন কি লৌহ ও ইস্পাতশিল্প কয়লা ভিন্ন অচল। পশ্চিমবঙ্গে আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ভারতবর্ষের বৃহত্তম কয়লা খনি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের পর একমাত্র বিহার রাজ্যেই কয়লা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই রাজ্যে ঝরিয়ার কয়লা-খনি প্রসিদ্ধ। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম রাণীগঞ্জের কয়লাখনি হইতে কয়লা তোলা আরম্ভ হয়। এই অঞ্চলে ছয়শত বর্গ মাইল জুড়িয়া কয়লাখনি বিস্তৃত। ভারতের সমগ্র প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ কয়লা এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং রাণীগঞ্জের খনিগুলি ভারতের মধ্যে গভীরতম খনি। পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৮০টি কয়লাখনি আছে ; ইহার মধ্যে একটি ছাড়া আর সবগুলিই আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত। রাণীগঞ্জের খনিগুলিতে
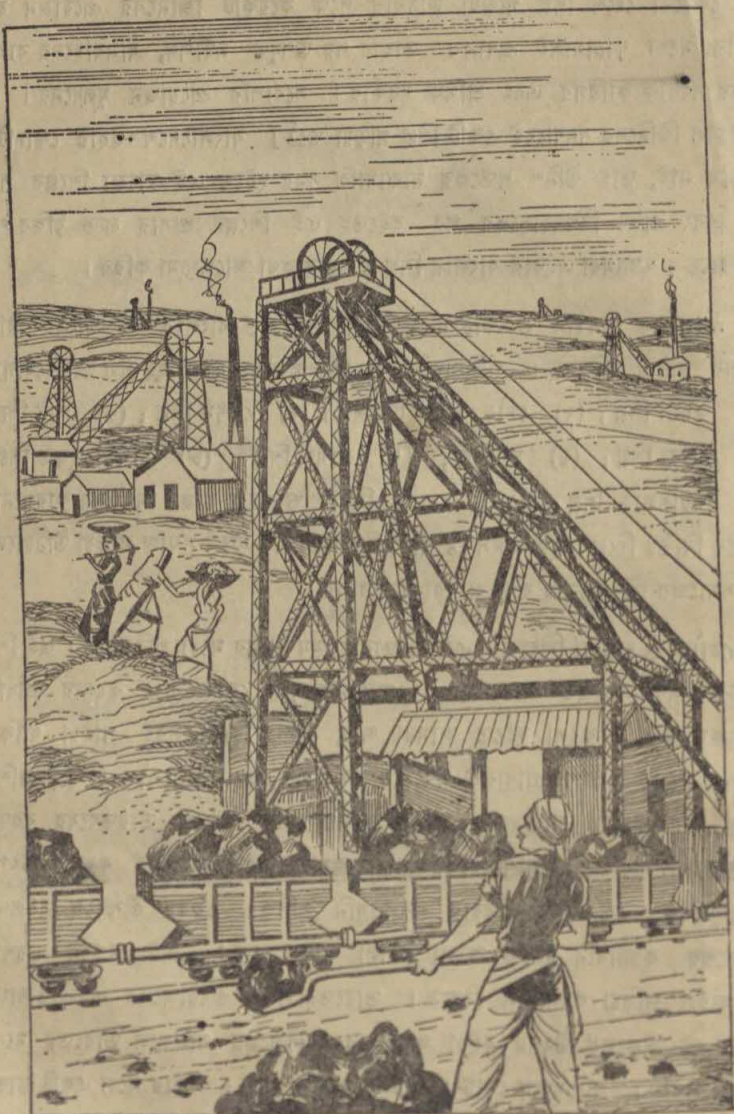
রাণীগঞ্জের কয়লার খনি

তিন শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কয়লাই পাওয়া যায়, যথা—কোকিং কয়লা, গ্যাস কয়লা এবং স্টীম কয়লা। ভালো কয়লা প্রধানতঃ রেলওয়ে এবং লৌহ-ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়।

কয়লা খনি ঃ ইহা যেন পাতালপুরীর দেশ। মাটির নীচে গভীর খাদের মধ্যে নামিয়া হাজার হাজার শ্রমিক প্রতিদিন এখানে কাজ করে। এই শ্রমিক সাধারণতঃ বিহার হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে। খনি বা খাদ এক রকমের নহে। পোখ্‌রা খাদ, হাঁটা খাদ, ও গভীর খাদ—এই তিন শ্রেণীর খাদের মধ্যে কয়লা উত্তোলনের কাজ চলে। কেবলমাত্র শ্রমিকদ্বারাই কয়লা তোলার কাজ চলে না, সেই সঙ্গে নানা রকমের আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিরও দরকার হইয়া থাকে। এক-একজন শ্রমিক গড়ে বৎসরে ২০০টন কয়লা উত্তোলন করিতে পারে। কয়লা খাদের ভিতরে কুলিদের কাজ দেখিবার মতন। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে একটি পথ খাদের গভীরে চলিয়া গিয়াছে—ডুলি বা খাঁচায় করিয়া সেই খাদের মধ্যে কুলিদের নামাইয়া দেওয়া হয়। ভিতরে সূচীভেদ্য অন্ধকার—ডেভিস সেফ্‌টি ল্যাম্প নামক এক প্রকার নিরাপদ বাতির সাহায্যে শ্রমিকেরা খাদের ভিতরে পথ করিয়া লয়। খনির ভিতরকে বলা হয় চৌথুপি। চারিদিকে কয়লা কাটিয়া যাওয়ার ফলে বহু সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণতঃ লোহার গাঁইতি দ্বারা বড় বড় কয়লার স্তূপ বা চাঙ্গড় কাটা হয়। কয়লা কাটিবার সময়ে বেশি গোলমাল বা শব্দ করা নিষেধ, অন্যথায় চাঙ্গড় ধসিয়া পড়িয়া বিপদ ঘটিতে পারে। খাদের ভিতরে কয়লা কাটিবার পর টবগাড়িতে বোঝাই করিয়া উহা উপরে তোলা হয়। খাদে পুরুষ-শ্রমিকেরা কয়লা কাটে, উপরে মেয়ে-শ্রমিকেরা (ইহাদিগকে 'কুলিকামিন' বলা হয়) কয়লা তোলা-ঝাড়া ও বাছাই ইত্যাদির কাজ করে। তারপর সেই কয়লা রেলগাড়ি করিয়া দূর-দূরান্ত দেশে চলিয়া যায়। কেবলমাত্র কয়লা বহন করিবার জন্যই পৃথক মালগাড়ি বা ওয়াগন আছে।

খনি-অঞ্চলে শ্রমিক ভিন্ন অন্যান্য কর্মচারীও আছে, যথা—খনির ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার, মুন্সী, খাজাঞ্চী, হাজিরাবাবু ইত্যাদি। এই সব কর্মচারী ও শ্রমিকদের লইয়াই খনি-অঞ্চলের সমাজ গড়িয়া উঠে। বড় বড় কর্মচারীরা থাকেন পাকা বাড়িতে আর শ্রমিকরা বাস করে বস্তিতে। খনি-মজুর বিলাসপুর, রায়পুর, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং
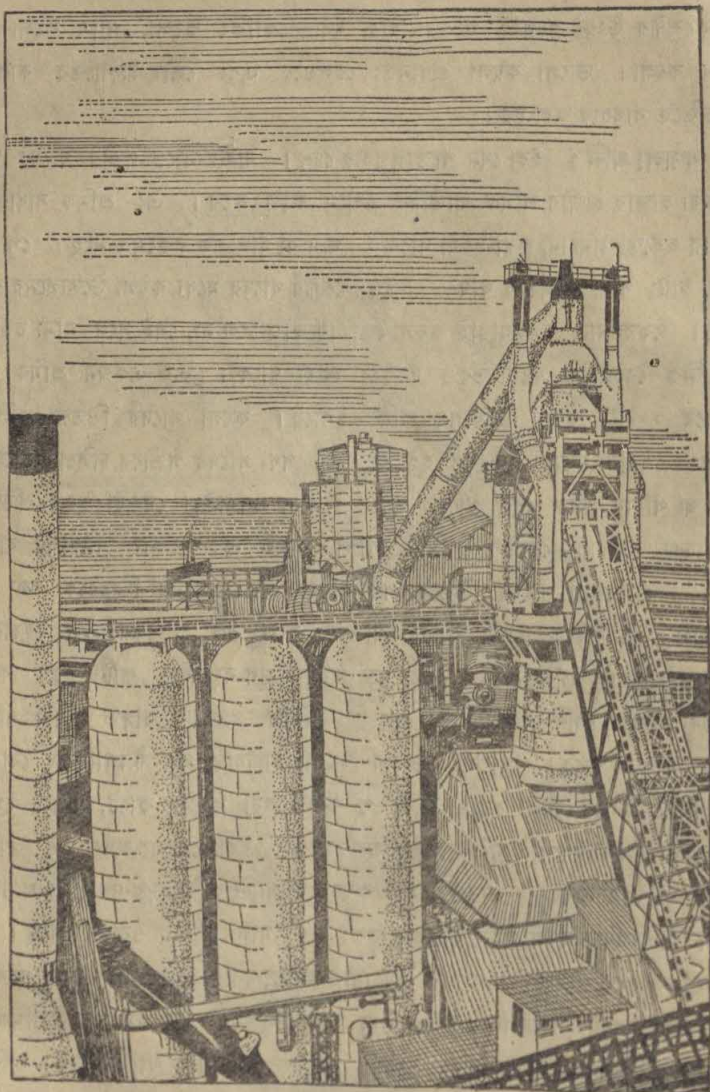
বার্ণপুরের ইস্পাত কারখানা

জাতি হিসাবে ইহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের শ্রমিকের রীতিনীতিও বিভিন্ন। খনির শ্রমিকেরা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং যাহারা যে-অঞ্চল হইতে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে এক-একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। আমোদ প্রমোদ, পূজা-পার্বণ, রীতিনীতি সবই ইহাদের আঞ্চলিক সংস্কার অনুযায়ী।

লৌহ-ইস্পাতের কারখানা: পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বৃহৎ **লৌহ-ইস্পাতের কারখানা** বার্ণপুর, হীরাপুর ও কুলটিতে অবস্থিত। বার্ণপুরে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড নামক একটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার বর্তমান নাম স্টীল-কর্পোরেশন অব বেঙ্গল। এই কারখানাটি আধুনিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত এবং বর্তমানে ইহার আরও প্রসার ঘটিয়াছে। এই কারখানাটির উন্নতি ও প্রসারের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে উহা সার্থক করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একত্রিশ কোটি টাকার অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে; এই টাকার মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ১৫ কোটি ও ভারত সরকারের নিকট হইতে ১০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। এখন এই কারখানা হইতে বিক্রয় উপযোগী ইস্পাত ৭ লক্ষ টন ও ৪ লক্ষ টন ঢালাই লৌহ উৎপন্ন হইতেছে।

লৌহ তৈরি: কেমন করিয়া খনিজ পদার্থ হইতে ইস্পাত ও লৌহ তৈরি হয়, এইবার সেই কথা বলিব। প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক প্রথায় উচ্চতাপের চুল্লী প্রস্তুত করা হয়; ইহাকে বলা হয় ব্ল্যাস্ট ফার্নেস। এই ফার্নেসের মধ্যে তখন লৌহপাথর, চুনাপাথর এবং ডলোমাইট দেওয়া হয়। চুনাপাথর ও ডলোমাইট চুল্লীতে আরো অধিক তাপের সৃষ্টি করে। তারপর সেই কঠিন লৌহপাথর ধীরে ধীরে গলিতে থাকে এবং অবশেষে উহা গলিয়া জলবৎ হইয়া যায়। তখন সেই গলিত লৌহ চুল্লীর নিম্নস্থ গর্তে সঞ্চিত হয় এবং এই স্থান হইতে উহা জলস্রোতের মত বাহির হইয়া আসে। অবশেষে এই গলিত লৌহ-স্রোতকে বালি দ্বারা নির্মিত এক প্রকার বিশেষ পথ দিয়া প্রবাহিত করিয়া পাত্রে সঞ্চিত করা হয়। এই পাত্রগুলি রেলগাড়ির সহিত যুক্ত থাকে। এইভাবে একখানি রেলগাড়ির পাত্র পূর্ণ হইলে তথায় আর একখানি রেলগাড়ি আসিয়া দাঁড়ায় এবং একই প্রথায় পাত্রগুলি পূর্ণ হইতে থাকে। তারপর গাড়িগুলি একটি
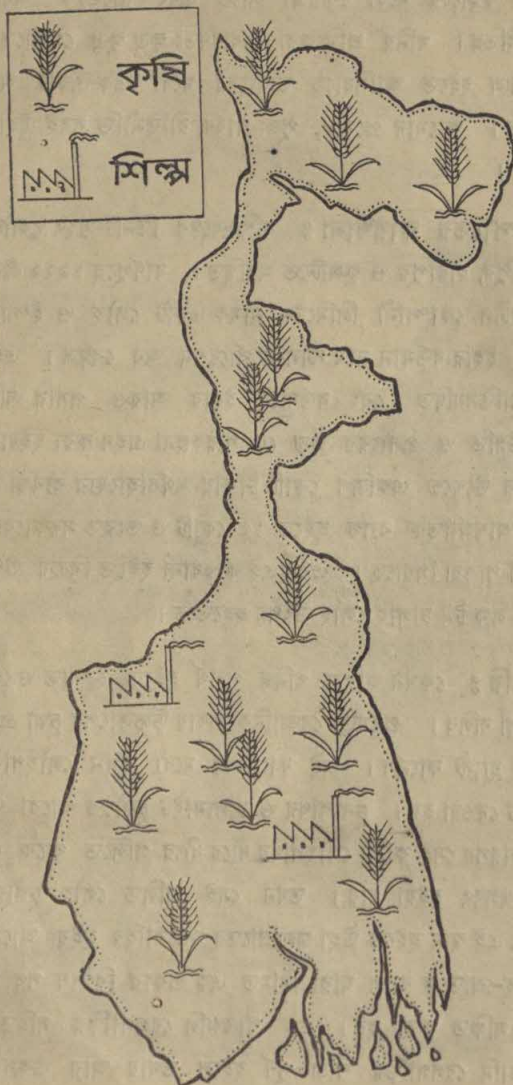
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শিল্পাঞ্চলসমূহ
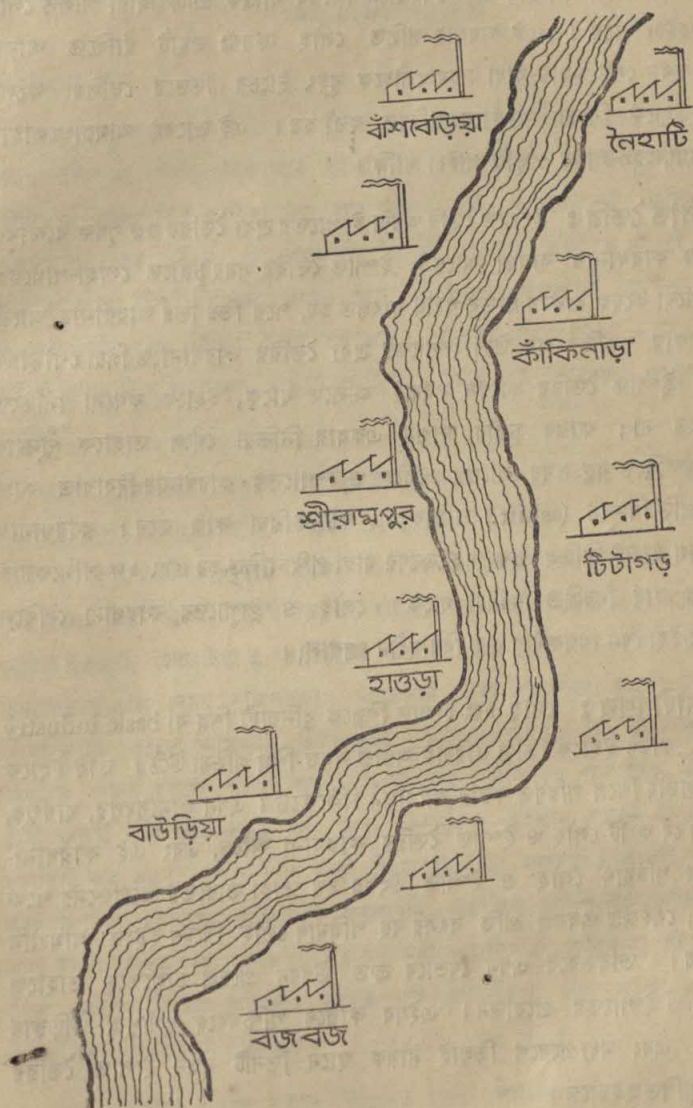
হুগলী নদীর দুই তীরে পাটকল

কারখানায় আসিয়া পৌঁছায় এবং সেইস্থানে বিশেষ যান্ত্রিক প্রক্রিয়াদ্বারা গলিত লৌহ শোধিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় গলিত লৌহ ক্রমশঃ জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। তখন সেই জমাট-বাঁধা নরম লৌহকে বৃহৎ ছাঁচের ভিতরে ফেলিয়া কলের সাহায্যে উহাকে বিভিন্ন আকারে পরিণত করা হয়। এই ভাবেই আমরা লোহার কড়ি, বরগা, রেল-লাইন প্রভৃতি পাইয়া থাকি।

ইস্পাত তৈরি ঃ ইস্পাত তৈরি অথবা ইস্পাতের দ্রব্য তৈরির জন্য পৃথক বন্দোবস্ত এবং পৃথক কারখানার ব্যবস্থা আছে। ইস্পাত তৈরির সময় চুল্লীতে লোহা-পাথরের সহিত আরো কয়েক প্রকার ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয়, পরে ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় আরো কয়েক প্রকার পদ্ধতির পর উহা ইস্পাতের দ্রব্য তৈরির কারখানাতে গিয়া পৌঁছায়। লৌহ ও ইস্পাত তৈরির ফার্নেস সর্বদাই জ্বলিতে থাকে, ইহাকে কখনো নিভিতে দেওয়া হয় না; কারণ চুল্লীর আগুন একবার নিভিয়া গেলে তাহাকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করিতে বহু সময় লাগে। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় দিবারাত্র কাজ চলে। প্রতি সিফ্‌টে (shift.) শ্রমিকেরা ৮ ঘণ্টা করিয়া কাজ করে। কারখানার বেশির ভাগ কাজই বিভিন্ন প্রকারের ক্রেণের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং দক্ষ শ্রমিকেরাই কারখানার কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা দেখিলে মনে হইবে ইহা যেন বিশ্বকর্মার এক বিরামহীন যন্ত্রশালা।

বুনিয়াদী শিল্প ঃ লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পকে বুনিয়াদী শিল্প বা basic industry বলা হয়। কারণ ইহাকে ভিত্তি করিয়াই অন্যান্য সমস্ত শিল্প গড়িয়া উঠে। তাই ইহাকে বর্তমানে জাতীয় শিল্পে পরিণত করার আয়োজন চলিতেছে। এখন জামসেদপুর, বার্ণপুর, ও মহীশূরে যে কয়টি লৌহ ও ইস্পাত তৈরির কারখানা আছে, এবং এই কারখানা-গুলিতে যে পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাহা ভারতের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে; সেইজন্য এখনও প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ লৌহ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ভারতবর্ষে এখন যেভাবে দ্রুত উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতে প্রচুর লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন। এইসব কারণে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর, উড়িষ্যায় রাউরকেল্লা এবং মধ্যপ্রদেশে ভিলাই নামক স্থানে তিনটি নূতন ইস্পাত তৈরির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন

আগে আমাদের দেশে রেলের ইঞ্জিন বা রেলগাড়ি তৈরি করিবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, অথচ ভারতবর্ষে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত রেলপথের জন্য ইঞ্জিন ও রেলগাড়ির চাহিদা বড় কম নহে। এই অভাব দূর করিবার জন্য ভারতবর্ষে এখন ইঞ্জিন ও রেলগাড়ি তৈরির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আসানসোলের নিকট চিত্তরঞ্জন নামক স্থানে একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, ঐ কারখানায় রেল ইঞ্জিন তৈরি হইতেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে প্রতিষ্ঠিত এই কারখানাটি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই অবস্থিত। ইহার নাম 'চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস'।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী চিত্তরঞ্জন কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা। যাহাতে প্রতি বৎসর ১২০খানি পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিন এবং ৫০টি বয়লার প্রস্তুত করিতে পারা যায়, সেইভাবেই এই কারখানাটি পরিচালিত হইতেছে। একটি বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া ইহা স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার চারিদিকে নূতন পরিকল্পনায় শহর গড়িয়া উঠিতেছে। চিত্তরঞ্জনের জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন তাহা প্রধানতঃ কুলটি, বার্ণপুর ও জামসেদপুর হইতে আমদানি করা হইয়া থাকে; কয়লা এবং অন্যান্য জিনিস নিকটস্থ অঞ্চল হইতে আনা হয়। কারখানার অনতিদূরে পাহাড়ের উপরে বাঁধ দিয়া একটি বৃহৎ জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইখান হইতে চিত্তরঞ্জনে জল সরবরাহ করা হয়। সকল দিক দিয়া চিত্তরঞ্জনে এই নূতন শিল্প-শহরটি আকর্ষণীয়। কারখানাটির একদিকে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি, অন্যদিকে বার্ণপুরের লৌহ-কারখানা এবং ইহার দুইদিক দিয়া অজয় ও বরাকর নদী প্রবাহিত। কারখানা হইতে বিভিন্ন দিকে রেলপথ বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা সর্বপ্রকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত।

প্রথমে এখানে বিদেশ হইতে ইঞ্জিনের অংশ আনিয়া জোড়া লাগান হইত। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই ভারতীয় যন্ত্রবিদ্‌রা নিজেরাই সম্পূর্ণ ইঞ্জিন নির্মাণের যাবতীয় বিদ্যা ও কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে চিত্তরঞ্জনে প্রায়
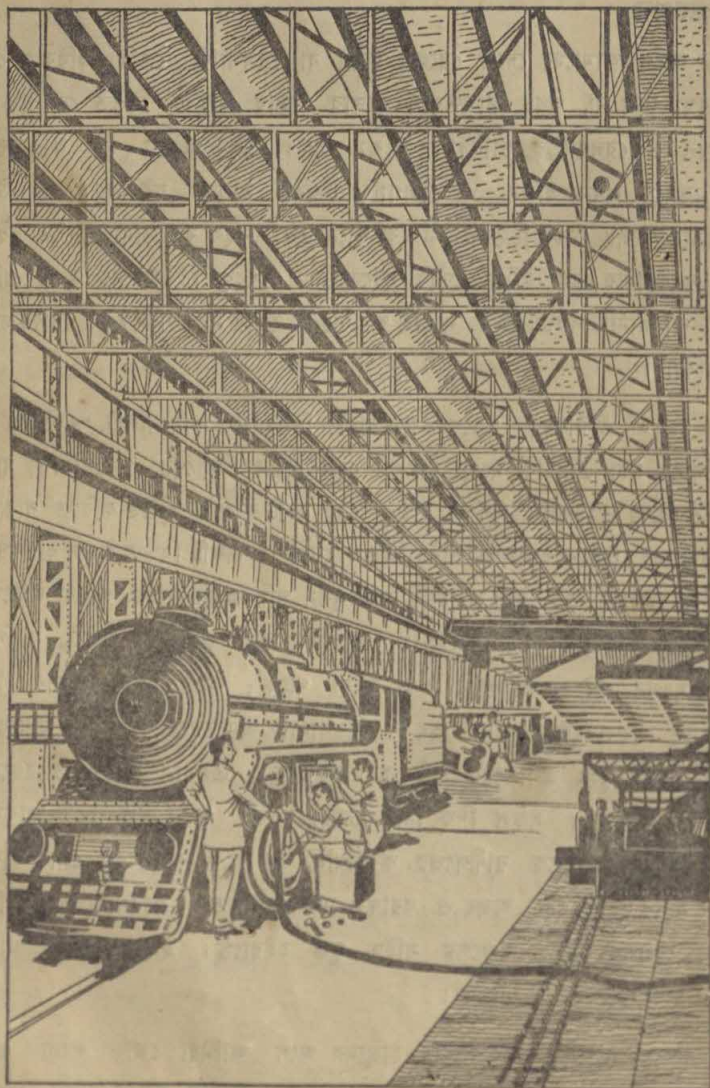
চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈরির কারখানা

পঞ্চাশখানি পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিন তৈরি হয়। বর্তমানে এই উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু ইঞ্জিন নহে, ইঞ্জিনের যাবতীয় কলকব্জা এবং সরঞ্জামও এখন চিত্তরঞ্জন কারখানায় তৈরি হইতেছে।

পুরাতন শিল্পনগর হাওড়া

প্রসঙ্গতঃ পুরাতন ও নূতন শিল্পনগরের কথা আলোচনা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে পুরাতন শিল্পনগর হিসাবে হাওড়ার প্রসিদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশি। হাওড়া একটি পুরাতন শহর। পূর্ব হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করিয়া সেই পরিকল্পনা মত নগর তৈরি হয় নাই, ইহা নিতান্তই অপরিকল্পিত ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ইহাই বৃহৎ শিল্পনগর। উনিশ শতকের শেষ ভাগ হইতে এইখানে নানাবিধ কারখানা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে হাওড়ায় শিল্প-কারখানা ও জনবসতি দুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছোট ছোট যন্ত্রপাতি মেরামতের ও তৈরির কারখানার সংখ্যাই এখানে বেশি। হাওড়া শহরের বেলিলিয়াস অঞ্চলের কারখানা-গুলি প্রসিদ্ধ। সমগ্র হাওড়া শহরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-কারখানার সংখ্যা প্রায় ৩৫০, এবং ইহার মধ্যে লোহা ঢালাই ও রোলিং কারখানার সংখ্যাই ১০০। যেসব শিল্পের কল-কারখানা হাওড়ায় আছে তাহাদের মধ্যে তুলার গাঁটবাঁধা কল, পাটের গাঁটবাঁধা কল, ময়দার কল, ধানের কল, মোজা-গেঞ্জির কল, দড়ি ও সুতার কল, কাঠচেরাই কল, রবারের জিনিসের কারখানা, রং-বার্ণিসের কারখানা, কাঁচের কারখানা, নাটবল্টু ও পেরেকের কারখানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই বিরাট শিল্পশহরের রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়িগুলি একান্ত বিশৃঙ্খলভাবে নির্মিত হইয়াছে। লোকসংখ্যার তুলনায় জলসরবরাহ ও ড্রেনের ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুপযুক্ত। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও শহরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। নগর-পরিকল্পনার অভাবে এই শিল্পশহরের জনস্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই শোচনীয়। শহরের বহু স্থানেই অস্বাস্থ্যকর বস্তী'। বর্তমানে অবশ্য হাওড়ার নাগরিক রূপ কিছুটা বদলাইয়াছে।

নূতন শিল্পনগর চিত্তরঞ্জন

অন্যদিকে হাওড়ার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের নূতন শিল্পনগর চিত্তরঞ্জন সকল দিক দিয়া একটি আদর্শ শিল্পনগর। ইহা যেমন সুপরিকল্পিত, তেমনই সুবিন্যস্ত ও সুন্দর। এই কারখানা ও নগর আয়তনে প্রায় সাত বর্গমাইল। এখানকার পিচঢালা রাস্তাগুলি
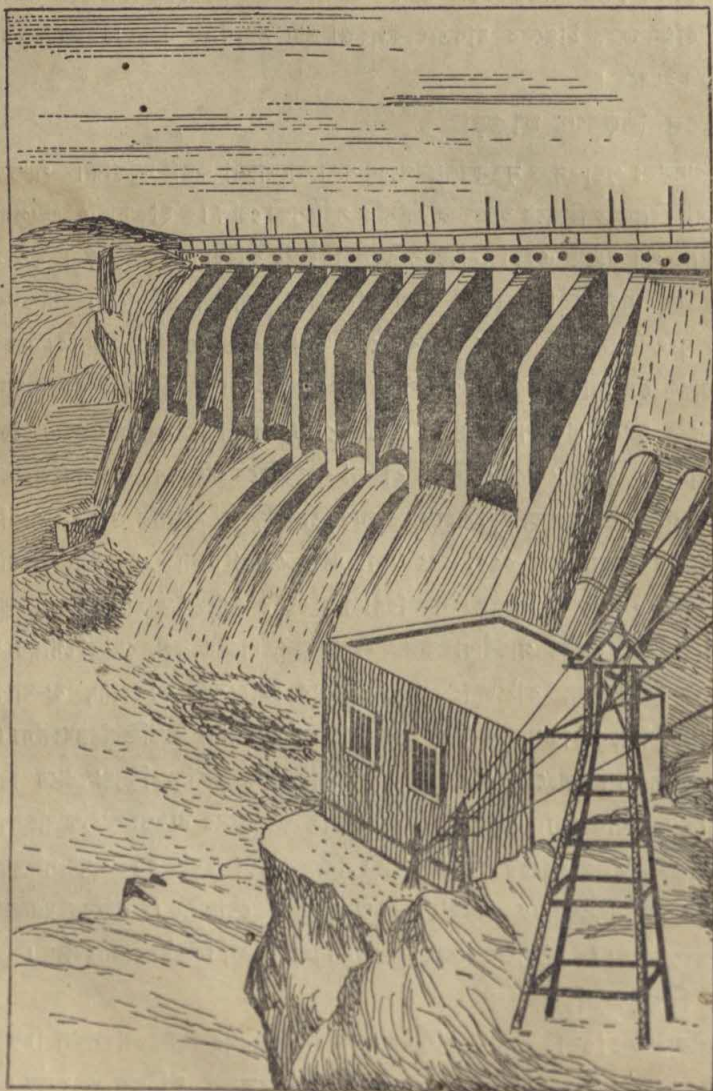
দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা

প্রশস্ত এবং বহু স্থানেই সোজা। হাওড়ার ন্যায় চিত্তরঞ্জনের রাস্তার পার্শ্বে দুর্গন্ধযুক্ত উন্মুক্ত ড্রেন নাই। রাস্তার দুইধারে ছায়া-শীতল বৃক্ষের সারি। জল সরবরাহ ও পায়খানার বন্দোবস্ত উন্নত। চিত্তরঞ্জনে অপরিচ্ছন্ন বস্তীর চিহ্নমাত্র নাই। কারখানার শ্রমিকদের বাসস্থানগুলিও অতি সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত। মোট কথা, আধুনিক সকল রকম সুখ-সুবিধা এই নূতন শিল্পনগরে বিদ্যমান।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের বিবিধ উন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রসিদ্ধ। নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল নদীর জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং সেচের জন্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলের পরিপূর্ণ ব্যবহার। দামোদর নদের বন্যানিয়ন্ত্রণ, জল-স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত জলধারা সেচের জন্য নিয়মিতভাবে সমীপবর্তী অঞ্চলের চাষভূমিতে সঞ্চালন—ইত্যাদি উদ্দেশ্য লইয়া দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা গৃহীত হয়। দামোদর নদ ছোটনাগপুর উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বরাকর নদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরেই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর বর্ধমান জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কলিকাতার সন্নিকটে ফলতার অপর তীরে গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেট পাহাড়—এই চারিটি স্থানে চারিটি বড় বাঁধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা, এবং সেচের জল নিয়ন্ত্রণের জন্য দুর্গাপুরে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই বাঁধগুলি হইতে দশ লক্ষ একর চাষভূমিতে জলসেচের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক খাল কাটা হইয়াছে এবং প্রায় এক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনাটিতে খরচ হইয়াছে ১৩৭ কোটী টাকা। ইহার পরিচালনা ভার দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন নামক একটি সংস্থার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ফলেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক রূপান্তর ও শিল্পোন্নয়ন—বিশেষ করিয়া উপত্যকার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে কুটীর শিল্পের প্রসার সম্ভব হইয়াছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা : (১) রেলপথ

যে কোনো দেশের উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের রেলপথের উপর। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মিত হয় এবং তাহার পর প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত এদেশের রেলপথের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার তাই এইদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন। ভারতবর্ষে এক রকম বিনা পরিকল্পনায় বহু রেলপথ স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতসরকার রেলপথের পুনর্বিন্যাস করিয়া ইহাকে সাতটি প্রধান মণ্ডলে (zone) ভাগ করিয়াছেন, যথা—(১) পূর্ব রেলপথ; (২) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ; (৩) উত্তর-পূর্ব রেলপথ; (৪) উত্তর রেলপথ; (৫) মধ্য রেলপথ; (৬) পশ্চিম রেলপথ এবং (৭) দক্ষিণ রেলপথ। এইগুলির মধ্যে দক্ষিণ রেলপথই সর্ববৃহৎ; ইহা প্রায় ৬০০০ মাইল বিস্তৃত। এই সাতটি রেল-পথের মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রধান অফিস কলিকাতায় অবস্থিত। পূর্ব রেলপথ আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ। ইহা পশ্চিমবঙ্গ হইতে গঙ্গানদীর দক্ষিণে বিহারের মধ্য দিয়া উত্তরপ্রদেশের কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ৩০০০ মাইল দীর্ঘ; ইহা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়া চলিয়াছে। সমগ্র ভারতের রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩৪,০০০ মাইল এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মাত্র ১৯০০ মাইল রেলপথ আছে। এই রাজ্যের প্রায় সমস্ত রেলপথই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত। কলিকাতার পূর্বে শিয়ালদহ ও পশ্চিমে হাওড়া এই দুইটি বৃহৎ রেলষ্টেশন দিয়া রেলপথে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করা যায়। ভারত বিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে রেলপথের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গ ও আসামের সহিত দক্ষিণ বঙ্গের দূরত্ব বাড়িয়া গিয়াছে এবং যাতায়াতেরও অসুবিধা হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ি চলাচল করিতেছে।

(২) স্থলপথ

যাতায়াত ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে মালপত্র প্রেরণের জন্য রেলপথের পরেই স্থলপথের প্রয়োজনীয়তা সর্বদেশে স্বীকৃত। ভারতে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল স্থলপথ আছে; ইহার মধ্যে প্রায় আশি হাজার মাইল পাকা রাস্তা। অবশ্য ভারতের

প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুবই কম। সেইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের স্থলপথের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতের পথ-ঘাটগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) জাতীয় সড়ক (National Highways); (২) রাজ্য সড়ক এবং (৩) অন্যান্য সড়ক যাহার মধ্যে জিলা সড়ক, মিউনিসিপ্যালিটির সড়ক ও অন্যান্য গ্রাম্য সড়ক ধরা যাইতে পারে। ভারতে জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ১৩ হাজার ৮০ মাইল।

পশ্চিমবঙ্গে শহর এবং শিল্পাঞ্চল ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই রাস্তাগুলির অবস্থা যারপরনাই শোচনীয়। গ্রাম অঞ্চলে বেশির ভাগই কাঁচা রাস্তা; বর্ষাকালে এইসব রাস্তাগুলি দিয়া যানবাহন যাইতে পারে না। এই রাজ্যে কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া হাজার মাইলেরও অধিক দীর্ঘ একটি রাস্তা বহু পুরাকাল হইতে বিদ্যমান। এই রাস্তাটি শেরশাহের আমলে প্রথম নির্মিত হয়। ইহাকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বলা হয়। ইহা ভিন্ন কলিকাতা শহরের রাস্তা, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এর রাস্তাগুলি উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা বন্দর

পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই বন্দর থাকে। বন্দরহীন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সুবিধা নাই এবং বন্দর ভিন্ন কোন জাতির অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব নহে। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে কয়েকটি বন্দর আছে তাহাদের মধ্যে কলিকাতা বন্দর প্রাচীন এবং বৃহত্তম। কলিকাতা যেমন ভারতরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নগর, ইহার বন্দরও তেমনি শ্রেষ্ঠ। ইহা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বন্দরও বটে। বঙ্গোপসাগর হইতে প্রায় ৯০ মাইল ভিতরে হুগলী নদীর মোহনায় কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। ১৫,০০০ টনের জাহাজ এই বন্দরে প্রবেশ করিয়া জেটীতে নোঙর করিতে পারে। নদীপথে ৬০টি সমুদ্র-গামী জাহাজ যাহাতে নোঙর করিয়া থাকিতে পারে তেমনি ব্যবস্থা আছে। খিদিরপুর ডকে ৩০টি ও কিং জর্জ ডকে ১৪টি জাহাজ নোঙর করিতে পারে। কলিকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সেইমত কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব-উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহের নিকটবর্তী বৃহত্তম বন্দর বলিয়া কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব এত বেশী। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার,

কলিকাতা বন্দর

পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যদ্রব্যই এই বন্দরপথে বিদেশে প্রেরিত হয় এবং বিদেশ হইতে আনীত হয়। ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে যত মাল বিদেশে চালান যায় তাহার অধিকাংশই কলিকাতা বন্দরের ভিতর দিয়া যায়। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পণ্যগুলি কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানি হয়, যথা—পাটজাত দ্রব্য, কয়লা, চা, হাড় ও হাড়চূর্ণ, লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য, লাক্ষা, পেট্রোলিয়ম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। আর লবণ, খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, কাচের বাসন, পেট্রোলিয়ম, ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি, আসফাল্ট, বিটুমেন প্রভৃতি এই বন্দরপথে আমদানি হয়।

অন্যান্য শিল্প

এইবার পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কথা বলিব। এই রাজ্যের বহু অঞ্চলে অবিন্যস্তভাবে একাধিক ছোট ছোট কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্প গড়িয়া তুলিবার মতন পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব—সেই কারণেই এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উদ্ভব হইয়াছে। এইসব শিল্পকে কতকটা কুটীরশিল্পের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। অনেক মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত ভদ্রলোক অথবা উদ্বাস্তু পরিবার অতি সামান্য মূলধন সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ বাড়িতেই এই জাতীয় ছোট ছোট কারখানা গড়িয়া তোলেন। কেহ বা ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছদ তৈরি করেন; কেহ পুতুল, কেহ ধূপকাঠি, কেহ সাবান, তরল আলতা-জাতীয় বস্তু, কেহ বা স্বল্পমূল্যের প্রসাধন-দ্রব্য। এইভাবে কলিকাতা ও হাওড়ার বহু অঞ্চলেই ছোট ছোট শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও কোথাও ইহা পারিবারিক গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া ছোট যৌথ কোম্পানীতেও পরিণত হইয়া থাকে।

এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় যে সব দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেগুলি কলিকাতার বৃহৎ বাজারে অল্প পরিবহন খরচে আসিয়া থাকে। এই জাতীয় কারখানা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলা ও জনবহুল অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেখানে উদ্বাস্তুরা ইহাতে লিপ্ত তাহারা ভারত সরকারের (কোনো কোনো ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের) নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকে। ভারত সরকার ক্ষুদ্রশিল্প-প্রসারে ইহাদিগকে প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়াছেন। এই

জাতীয় শিল্পের মধ্যে গেঞ্জির কল, প্লাষ্টিকের কারখানা, কাঠের দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা, চিরুণী তৈরির কারখানা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত শিল্পদ্বারা জনসংখ্যার বিশেষ এক অংশের অন্নেরও সংস্থান হইয়াছে।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, সমাজ-জীবনে শিল্প একটি বিশেষ স্থান করিয়া লইয়াছে। শিল্পনির্ভর সমাজ-জীবনে দ্রুত অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধিত হইয়া থাকে। সমাজ যদি কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে আজ আমরা সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহা আদৌ সম্ভব হইত না। সমাজের অগ্রগতির পক্ষে তাই শিল্প এবং শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। এখনকার সমাজ-জীবন তাই অনেকখানি শিল্পানুগ। ইহা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন নানাবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছে, তেমনি ইহা তাহার জীবনে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাও আনিয়া দিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাজ-জীবনে গ্রাম ও শহর

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে গ্রাম সর্বাপেক্ষা পুরাতন। গ্রাম নাই পৃথিবীতে এমন দেশ নাই। প্রকৃতপক্ষে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রথম পত্তনই গ্রামে। তাহার প্রাথমিক সমাজচেতনার উন্মেষও এই গ্রামীণ জীবন হইতে। আমাদের ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ। এখানে শহরের তুলনায় গ্রামের সংখ্যাই বেশি। তাহার একটি প্রধান কারণ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিজীবী জনসমষ্টির অধিকাংশই গ্রামে বাস করিয়া থাকে—কৃষিক্ষেত্রের নিকটেই তাহাদের গ্রামগুলি অবস্থিত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত গ্রামগুলির বিন্যাস (pattern) সর্বত্র কিন্তু এক প্রকার নহে। জলবায়ুর তারতম্যে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির দরুণ নানা ধরণের গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ভিন্ন স্থানীয় জনসমষ্টির আচার ও প্রকৃতির জন্যও গ্রামগুলির মধ্যে তারতম্য থাকিতে বাধ্য। তবে প্রধানতঃ আমরা ভারতের গ্রামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, যথা—(১) সুসংবদ্ধ গ্রাম এবং (২) অসংবদ্ধ গ্রাম। যে গ্রামগুলি বেশ সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিকেই আমরা সুসংবদ্ধ গ্রাম বলিতে পারি, আর যেগুলির বিন্যাসে কোনো ছন্দ নাই, গড়নে কোনো পরিকল্পনা নাই—সেইগুলিকেই বলা হয় অসংবদ্ধ গ্রাম। অসংবদ্ধ গ্রামের গৃহগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট নহে—বিক্ষিপ্ত এবং ছড়ানো। সুসংবদ্ধ গ্রামের গৃহ-বিন্যাস ঘন এবং স্বল্পপরিসরের মধ্যে আবদ্ধ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামে নানাপ্রকার অসুবিধা—সবচেয়ে প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত পথঘাটের অভাব। পানীয় জলের অভাবও কম নহে। প্রাক-ইংরেজ আমলে বাংলা তথা ভারতের গ্রামগুলির যে শ্রী ছিল, যে সমৃদ্ধি ছিল, এখন তাহা ইতিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাধি, দারিদ্র্য আর অভাব—ইহাই ভারতের গ্রামগুলির বর্তমান রূপ।

অন্যদিকে তুলনায় ভারতের শহরগুলি যথেষ্ট শ্রীমণ্ডিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন। যদিও অন্যান্য সভ্যদেশের শহরগুলির তুলনায় ভারতের শহরগুলি তেমন উন্নত নহে, তথাপি

এখানকার গ্রামের তুলনায় শহর ঢের ভালো। মানুষ গ্রাম হইতে নগরজীবনে প্রবেশ করিয়াছে। সভ্যতার অগ্রগতির পথে তাহার এই নগরমুখী অভিযান তাহার সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে—তাহার রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আনিয়া দিয়াছে বৈচিত্র্য। নাগরিক-সভ্যতার আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত মানুষের মনের প্রসারতা এখন শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রামের কূপমণ্ডুক জীবনে কত রকমের কুসংস্কার তাহার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, শহরের উদার পরিবেশে মানুষের মন সর্বসংস্কারমুক্ত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায়। অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু কৃত্রিমতাও যে না আসে তাহা নহে। শহরে প্রকৃতির সাহচর্যলাভের স্বযোগ না থাকার দরুণ শহরবাসী মানুষের জীবন কিছুটা কৃত্রিম।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ শহরগুলিতে রাস্তাঘাট, জনবসতি ও যানবাহনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে এবং অনেক ক্ষেত্রেই উহা উন্নত নহে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লী প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান শহর ভিন্ন অন্যান্য সকল শহরেই রাস্তাঘাটের চরম দুর্দশা। অনেক শহরেই পথঘাট অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং শহরগুলির মধ্যে যোগস্থত্রও অতি অল্প; ইহার কারণ বেশির ভাগ শহর বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। এমন অনেক রাজ্য আছে যেখানে পর পর কয়েকটি শহর রহিয়াছে, কিন্তু তারপর বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে আর কোনো শহরের অস্তিত্ব নাই। ভারতের প্রধান শহরগুলিতে স্থানের তুলনায় জনসমাবেশ অত্যধিক এবং ইহার ফলে এখানকার শহরগুলিতে মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির আধিক্য প্রায়ই দেখা যায়।

আমাদের **দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগুলির** কথা এইবার আলোচনা করিব। এগুলি প্রায়ই বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাশাপাশি দুই গ্রামের মধ্যে রহিয়াছে একটি বিস্তৃত মাঠ। অবশ্য কোনো কোনো অঞ্চলে যে পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের অবস্থিতি নাই, এমন নহে। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ ভূমিখণ্ড খাল, বিল, নদী-নালায় পরিপূর্ণ এবং ইহাই গ্রামগুলির বিক্ষিপ্ত অবস্থানের একটি প্রধান কারণ। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসী চাষী, তাই এক-একটি গ্রামের পরেই বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র দেখা যায়। এই কৃষিক্ষেত্রগুলি যখন বর্ষার জলে ভরিয়া যায়, তখন দূর হইতে গ্রামগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত দেখায়।

দক্ষিণবঙ্গে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) বর্ধিষ্ণু ও (২) কৃষি-নির্ভর গ্রাম। বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি প্রায়ই কৃষিক্ষেত্র হইতে দূরে নদীর তীরে অথবা উচ্চ ভূমিখণ্ডে অবস্থিত। এই সব গ্রামে নানাশ্রেণীর লোক বাস করে এবং ইহাদের জীবিকাও নানা প্রকারের হইয়া থাকে। এইগুলিকে আমরা গণ্ডগ্রাম বলিতে
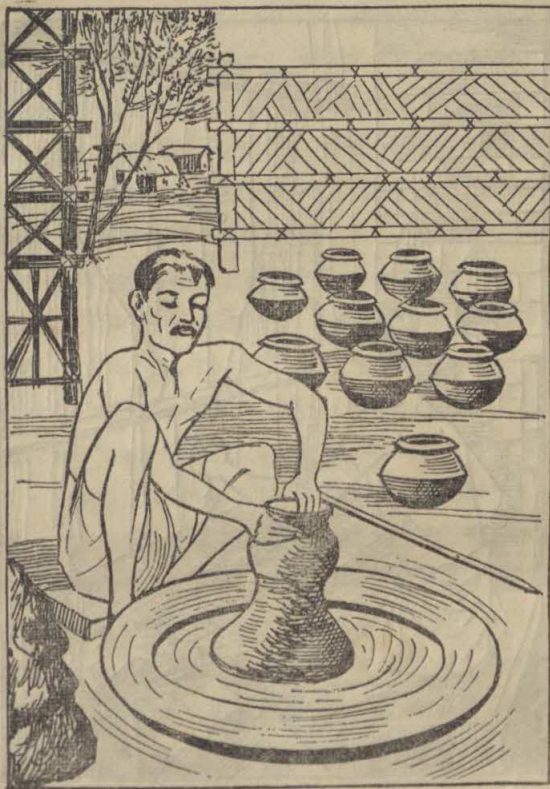
গ্রামের কুমার

পারি। এই ধরণের গ্রামে এক এক বর্ণের ও বৃত্তির জনসমষ্টি এক এক পাড়ায় বাস করে। কোনো কোনো অঞ্চলে স্থানীয় জমিদারের পোষকতায় এই শ্রেণীর গ্রাম গড়িয়া উঠে। দক্ষিণবঙ্গের বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলিতে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী যেসব জনসমষ্টি দেখা যায় তাহাদের

মধ্যে কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি শ্রেণী উল্লেখযোগ্য। বর্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্রেই একটি করিয়া পাঠশালা বা বিদ্যালয় থাকে। এই সব গ্রামের শহরাঞ্চলের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ থাকার জন্য নাগরিক জীবনের বহু সুবিধা এখানকার অধিবাসীরা ভোগ করিয়া থাকে। কোনো কোনো গ্রামে এক-এক শ্রেণীর প্রাধান্য বেশি, যেমন—বর্ধমানের

গ্রামের তাঁতী

শ্রীখণ্ড গ্রাম বৈদ্য-প্রধান; কাঞ্চননগর পূর্বে কর্মকার-প্রধান ছিল; বীরভূম জিলার বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম একদা তন্তুবায়-প্রধান ছিল। এই রকম অনেক গ্রামের নাম করা যাইতে পারে যেখানে এক বর্ণের ও এক বৃত্তির লোকের বসবাস অধিক।

কৃষিনির্ভর গ্রামগুলি সাধারণতঃ চাষের জমির সংলগ্ন উচ্চ স্থানে অবস্থিত। এই ধরণের গ্রামের জনসমষ্টির অধিকাংশ লোকের জীবিকা হইল কৃষি। কোন কোন কৃষিপ্রধান গ্রামে মৎস্যজীবীরাও বাস করিয়া থাকে। কৃষক ও ধীবরদের সহিত মাটি ও কাদার বিশেষ সম্বন্ধ। পনর-কুড়িটি পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি কৃষক ও মৎস্যজীবী পরিবার লইয়াই এইরূপ এক-একটি গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ষার সময়ে এই গ্রামগুলির দৃশ্য এক রকম, আবার বর্ষার পরে ইহাদের দৃশ্য আর এক রকম। বর্ষার জল যখন সরিয়া যায়, তখন দেখা যায় এক-একটি প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যস্থলে বা পার্শ্বে এক একটি গ্রাম মাথা উঁচু করিয়া অবস্থান করিতেছে। মাইলের পর মাইলব্যাপী দিগন্তপ্রসারী শূন্য মাঠের মাঝখানে ছোট ছোট গ্রামগুলি দেখা যায়। কৃষিপ্রধান গ্রামের সব ঘর-বাড়ীরই খড়ের চাল।

গ্রাম্য গৃহের গড়ন সাধারণতঃ ঢালু চালবিশিষ্ট চতুষ্কোণ হইয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে বাঁশ চিরিয়া পাটি করিয়া বা বাতা দিয়া ঘরের চারিদিকে দেওয়াল দেওয়া হয়, তাহার উপর কোথাও মাটি লেপা থাকে; কোথাও খড় দিয়া ঢাকা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে মাটির দেওয়াল দেওয়া খড়ের চালের ঘরই বেশি। অনেক ক্ষেত্রে খড়ের পরিবর্তে হোগলা বা অন্য কোন পাতা ঘাস দ্বারা ঘরের চাল ছাওয়া হয়। কোথাও কোথাও টিন, টালি বা খোলার চালও থাকে। চাল সবই প্রায় ঢালু ও চতুষ্কোণ। একচালা, দোচালা, চারচালা, আটচালা সব রকমের ঘরই আছে। দোচালা ঘর সাধারণতঃ দরিদ্র চাষীদেরই বেশি; আর যাহারা একটু সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক তাহার চারচালা ও আটচালা ঘরে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলী প্রভৃতি জেলার কৃষিপ্রধান অঞ্চলে চারচালা ও আটচালার ঘরই বেশি। এই ধরণের ঘরের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার চারটি চালই সম্মুখে বৃত্তাকারে বাঁকানো, চালের কোণগুলি ছুঁচালো, দেখিতে অতি সুন্দর। ভারতের আর কোন অঞ্চলে এরূপ গৃহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের কথা আমরা বলিলাম। এইবার আমরা দক্ষিণ ভারতের **কেরালার** গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই অঞ্চলের গ্রামগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) উত্তর-কেরালার বিক্ষিপ্ত গ্রাম এবং

(২) দক্ষিণ কেরালার সংঘবদ্ধ গ্রাম। কেরালার উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গ্রামগুলি প্রথম পর্যায়ে পড়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রামগুলি দক্ষিণ দিকে ধান্যক্ষেত্রের অঞ্চলে অবস্থিত। উত্তরে নদী ও হ্রদ-পরিবেষ্টিত স্থানে অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ড দেখা যায়।, এই সব অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ডেই বিক্ষিপ্ত গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে। কেরালার সংঘবদ্ধ গ্রামগুলি দক্ষিণে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে অবস্থিত। উত্তর কেরালার সকল শ্রেণীর জনসমষ্টিকে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করিতে হয়। এই অঞ্চলে গাছের মধ্যে তাল ও নারিকেলই বেশি। উত্তর কেরালায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই শ্রেণীর অধিবাসীর বাস। গ্রামের যাহারা মাতব্বর বংশ তাহারাই সাধারণতঃ জমির মালিক। দক্ষিণ-কেরালায় নাম্বুদ্রি শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ জমির মালিক হইয়া থাকে। নাম্বুদ্রিদের পরেই জমির মালিক হিসাবে নায়ার-শ্রেণীর নাম উল্লেখযোগ্য। নায়ারদের মধ্যে যাহারা নিম্নশ্রেণীর তাহারাই ক্ষেত-খামারের কাজ করিয়া থাকে।

উত্তর প্রদেশের গ্রামের কথা এইবার বলিব। এই রাজ্যে নানা শ্রেণীর জনসমষ্টির সমাবেশ দেখা যায়। এখানকার গ্রামগুলি সংঘবদ্ধ অর্থাৎ compact এবং প্রধানতঃ সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। গ্রামের জনসমষ্টির বেশির ভাগই কৃষকশ্রেণীর লোক। দুই রকমের কৃষক উত্তর প্রদেশে দেখা যায়, যথা—(১) জমি আছে এমন কৃষক এবং (২) জমি নাই এমন কৃষক। জমিযুক্ত চাষীর সংখ্যাই বেশি। উত্তর প্রদেশে গ্রামাঞ্চলে অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হয়; সেই কারণে চাষীদের জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রতি গ্রামের নিকটবর্তী ভূমিখণ্ডে অনেকগুলি গভীর কূপ কাটা হয়। এই সব কূপের ধার হইতে লম্বা খাল কাটা হয়। সাধারণতঃ ষাঁড়ের সাহায্যে কূপ হইতে জল উপরে তোলা হয় এবং ঐ জল খালের উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠে লইয়া আসা হয়। ইহাই উত্তর প্রদেশের জলসেচের ব্যবস্থা।

জমির মালিক এবং ব্যবসায়ী—উত্তর প্রদেশের গ্রামগুলিতে প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীর লোকের বাস। যাহারা জমির মালিক তাহারা জমিহীন চাষীদের দিয়া চাষ-আবাদের কাজ করাইয়া থাকে। আগে এই অঞ্চলের চাষীরা

জমির মালিকদের কাছ হইতে জমি ইজারা লইয়া চাষ করিত, এখন এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। উত্তর প্রদেশের গ্রামের জনসমষ্টির মধ্যে সহযোগিতার ভাব খুব প্রবল। প্রায় গ্রামেই একটি করিয়া গ্রাম্যসমিতি আছে। এই সব সমিতি স্থানীয় অঞ্চলের নানা শ্রেণীর লোক দ্বারা গঠিত। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণিগত কার্যে সহযোগিতা সৃষ্টি হইয়াছে। এখানকার গ্রামের গৃহগুলি বেশির ভাগই মাটির দেওয়াল ; মাটির দেওয়ালের উপরে খড়ের বা খাপড়ার চাল।

পাঞ্জাবের গ্রামগুলিও সংঘবদ্ধ। এখানে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর লোক বাস করে, যথা—(১) ধনী এবং ভূমির মালিক ; (২) মধ্যবিত্ত এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও (৩) চাষী এবং মজুরশ্রেণী। উত্তর প্রদেশের ন্যায় পাঞ্জাব প্রদেশে বৃষ্টিপাত অতি সামান্য। এখানেও তাই চাষীদের জলসেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীতে বহু খাল ; ঐ সব খাল হইতে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হয়। যে সব অঞ্চলে জনসমষ্টি কম, সেখানকার গ্রামগুলি কৃষিক্ষেত্রের পার্শ্বেই অবস্থিত। বিভিন্ন বর্ণের লোক বসবাস করিলেও এখানকার প্রত্যেক গ্রামের জনসমষ্টি সংঘবদ্ধ। বর্তমানে দেশ-বিভাগের পরে এই সংঘবদ্ধ গ্রামগুলিতে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে।

ভারতবর্ষে বহু শহর বা নগর আছে। এই শহরগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। সাধারণতঃ যেখানে স্বতন্ত্র পৌর-প্রতিষ্ঠান বা মিউনিসিপ্যালিটি আছে, সেই স্থানকেই শহর বলা হইয়া থাকে। পৌর-প্রতিষ্ঠান না থাকিলে অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোকের বসতি আছে, এমন স্থানকেও আমরা শহর বলিতে পারি। জনসংখ্যা ও বৃত্তির অনুপাতেই শহরের শ্রেণীভেদ হয় ; আবার ইহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব অনুসারেও শহরের প্রকারভেদ হইতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী শহরের শ্রেণীভেদ এইভাবে নির্ণয় করিয়া থাকেন, যথা—(১) নদী-তীরবর্তী শহর ; (২) সমতলভূমির শহর ; (৩) পার্বত্য শহর ; (৪) তীর্থশহর এবং (৫) স্বাস্থ্য শহর। বর্তমান সভ্যতায় আর এক শ্রেণীর শহর দেখা যায় যাহাকে আমরা বাণিজ্য এবং শিল্পকর্মের শহর বলিতে পারি। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল

হইতেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বহু রূপান্তর সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শহরের আকৃতির সহিত আধুনিক যুগের কোন শহরের তুলনা করা যাইতে পারে না। মধ্যযুগের সমাজ-জীবনের ধারা তখনকার নগর-বিন্যাসে প্রতিফলিত হইত। পুরাতন দিল্লী, আগ্রা অথবা পশ্চিমবঙ্গের গৌড়, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের শহর-গুলি দেখিলে আজও তাহাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। এ যুগে মানুষের সামাজিক জীবনে নানা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, তাই আধুনিক যুগের শহরগুলি সাধারণতঃ সুপরিকল্পিত অর্থাৎ নাগরিকদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এখনকার নগরগুলি গঠিত হইতেছে।

গ্রামের ক্রম-বর্ধমান প্রসারেই শহরের সৃষ্টি। গ্রাম বড় হয় কেমন করিয়া? ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ গ্রামের মধ্যে যদি কোন বৃহৎ শিল্প (Industry) গড়িয়া উঠে তবে ক্রমশঃ জনসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামের আকৃতি পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং অবশেষে একদিন সেই গ্রামটি একটি ক্ষুদ্র শিল্প-শহরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তখন সেখানে বড় বড় ইমারত গড়িয়া উঠে—গড়িয়া উঠে প্রশস্ত রাস্তাঘাট এবং বৃহৎ হাটবাজার ও দোকানপাট। যেখানেই শিল্প গিয়াছে, সেখানেই তাহার আনুষঙ্গিক জিনিসগুলি গিয়াছে ; মানুষের রুচির পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার রীতিনীতি বদলাইয়াছে এবং এইগুলিই গ্রামের অনিবার্য রূপান্তরের মধ্যে আশ্চর্য ভাবে প্রতি-ফলিত হইয়া উঠে। পশ্চিমবঙ্গে এই জাতীয় শহরের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বাটানগর, বজবজ্, ডানলপ নগর, ইত্যাদির নাম করিতে পারি। এ ছাড়া, যদি কোন গ্রামের উপর দিয়া রেলপথ যায় এবং সেখানে একটি রেল স্টেশন থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে সেই গ্রামটি বৃহদাকার ধারণ করিয়া শহরে পরিণত হয়। রেলপথ দ্বারা দূর দেশের সহিত সংযোগ সাধিত হওয়ার ফলে সেই গ্রামে পণ্য চলাচলের সুবিধা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জনসমাবেশ অনিবার্য এবং ইহারই ফলে গ্রামের রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। আবার কোন গ্রামে যদি সরকারী দপ্তর স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সরকারী কর্মচারীদের বসবাসের জন্য জনসমাগম বৃদ্ধি পায়। হাটবাজার ও রাস্তাঘাটের উন্নতিও হইতে থাকে এবং ইহার ফলেও অনেক সময় গ্রাম শহরে পরিণত হইতে পারে। এ ছাড়া কোন গ্রামে যদি কোন প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার ফলে ঐ গ্রামের

রূপান্তর সাধিত হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ ইহার দৃষ্টান্ত। এইখানে কয়লা-খনি আবিষ্কারের ফলে ইহা এখন একটি বিরাট শহরে পরিণত হইয়াছে। আবার কোন গ্রামে যদি দেবতার স্থান থাকে এবং উহা একটি তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহা হইলে পুণ্যার্থী এবং ব্যবসায়ী বহু লোকের যাওয়া-আসার ফলে সেই গ্রামটি ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ এইরূপ একটি শহর। অবশেষে কোন গ্রাম প্রাকৃতিক জলবায়ুর গুণে যদি স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে, তাহা হইলে দেখা যায় যে স্বাস্থ্যান্বেষী লোকজনের যাতায়াতে উহা কালক্রমে শহরে পরিণত হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ঘাটশীলা, নলহাটী ইত্যাদি এই জাতীয় শহর।

কলিকাতা শহর

গ্রাম কেমন করিয়া বৃহৎ শহরে রূপান্তরিত হয়, ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের কলিকাতা শহর। এই মহানগরীর উৎপত্তির কথা আমরা এইবার আলোচনা করিব। ভারতবর্ষের এই বৃহত্তম শহরটি প্রকৃতপক্ষে বণিকসভ্যতার দান। ইহার বয়স আড়াই শত বৎসরের কিছু বেশি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য এবং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল-কাব্যে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ রহিয়াছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী (১৫৯০ খ্রীঃ) গ্রন্থেও 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমান কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জব চার্ণকের নামই উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলীর বাণিজ্যকুঠির একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি একবার হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত সূতানুটি গ্রামে আসিলেন। গ্রামটি তাঁহার পছন্দ হইল এবং তিনি সেইখানে একটি কুঠি স্থাপন করিলেন। হরিহর শেঠের 'কলিকাতা পরিচয়' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, "সূতানুটি গ্রাম তখন জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি ছিল। মশা মাছি এবং হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ও দস্যু-তস্কর অধ্যুষিত সূতানুটি গ্রামে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট জব চার্ণক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপন করিলেন। তাহার পর তিনি ঔরংজীবের পৌত্র ওসমানের নিকট হইতে মাত্র ষোল হাজার টাকায় সূতানুটি, গোবিন্দপুর, ডিহি-কলিকাতা—গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল ও প্রস্থে এক মাইল ছিল।" এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়ম

প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম; বর্তমান এসপ্লানেড হইতে বড়বাজার পর্যন্ত যে অঞ্চল উহাই তখন ডিহি-কলিকাতা নামে পরিচিত ছিল। এবং বড়বাজার হইতে বাগবাজার পর্যন্ত ছিল সুতানুটি গ্রাম। তাহার পর জব চার্ণক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনকর্তা হইয়া তিনি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি—এই তিন গ্রামে আসিয়া বসবাস করিবার জন্য পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আবেদন জানান। এইভাবে শহর কলিকাতার পত্তন হয়।

বর্তমান জেনারেল পোস্ট অফিসের (G. P. O.) সন্নিকটে জব চার্ণক আসিয়া প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়; আর এখন যেখানে হাইকোর্ট অবস্থিত, পূর্বে সেখানে ছিল তাঁহার বাসস্থান। ইংরেজদের পানীয় জলের জন্য জব চার্ণক এখানকার লালদীঘিটি খনন করিয়াছিলেন এবং বর্তমান মহাধিকরণের স্থানে পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দপ্তরখানা ও বসবাস ছিল। এখনকার লালবাজারে পূর্বে ইংরেজদের দরকারী জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য একটি বাজার ছিল, আর ইহার কিছু দূরে মলঙ্গা লেনে কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীরা বাস করিতেন। সেকালের কলিকাতার বাসিন্দাদের বাগবাজার হইতে কালীঘাটের কালীমন্দির যাইতে হইলে এখনকার চিৎপুর ও চৌরঙ্গী হইয়া পায়ে হাঁটা রাস্তায় যাতায়াত করিতে হইত। এই রাস্তা ছিল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া, আর অত্যন্ত বিপদ্‌-সঙ্কুল। এখনকার গড়ের মাঠ ছিল তখন ভীষণ জঙ্গলময় এবং উহা দস্যু, তস্কর ও হিংস্রজন্তুর আবাসস্থান ছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা চৌরঙ্গীর আশে-পাশে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। গড়ের মাঠের এখনকার পুকুরগুলি ইহাদের পানীয় জলের জন্য খনন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের দিকে বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হয়! বর্গীদের হাত হইতে কলিকাতাকে রক্ষার জন্য ইংরেজরা 'মারাঠা ডিচ' নামে কলিকাতার উত্তর-পূর্ব দিকে খাল খনন করেন। এ সময় মিত্র, দেব, দত্ত, মল্লিক প্রভৃতি অনেক বনেদী হিন্দু পরিবার কলিকাতায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইহারা কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। এইভাবে বন-জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে কলিকাতার সুসংস্কৃত রূপ ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। দুর্গ তৈরি হইল, আত্মরক্ষার

জন্য। ইংলণ্ডের রাজা তখন তৃতীয় উইলিয়ম। তাঁহারই নামানুসারে এই দুর্গটির নাম রাখা হয় ফোর্ট উইলিয়ম। ইহা ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়। বর্তমান দুর্গটি অবশ্য ইহার বহু পরে নির্মিত হয়। দুর্গ স্থাপিত হইবার ফলে এই অঞ্চলে দস্যু-তস্করের ভয় হ্রাস পাইল এবং লোকের বসতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লোকবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার দেখা দিল এবং ইহার ফলে দোকানপাট, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি একের পর এক হইতে লাগিল।

প্রকৃতপক্ষে পলাশি-যুদ্ধের পর ইংরেজ কলিকাতায় কায়েমী হইয়া বসে এবং তখন হইতেই শহরটি চারিদিকে প্রসার লাভ করিতে থাকে। তাহার পর কলিকাতার আশেপাশে একটির পর একটি করিয়া শিল্প গড়িয়া উঠিতে লাগিল, কলিকাতায় ভারতের রাজধানী স্থাপিত হইল এবং তৎপরে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে যখন কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত প্রথম রেলপথ স্থাপিত হইল তখন হইতে কলিকাতা একটি মহানগরীতে পরিণত হইল। শুধু তাহাই নহে। সমগ্র ভারতের মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল। মোট কথা, উনিশ শতকের গোড়া হইতে কলিকাতা শহরের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে, এবং এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্ধে আরো বেশি দ্রুতগতিতে শহরের বিকাশ হয়। অবশ্য য়ুরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা এই দ্রুত বিকাশসাধনে কিছুটা সহায়তা করিয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে টাউন ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি, ১৮১৪-তে লটারী কমিশনার্স এবং ১৮১৭-তে লটারী কমিটি গঠিত হয়। তারপর শহরের রাস্তাঘাট, ড্রেণ, আলো, ঘরবাড়ি ইত্যাদির উন্নত পরিকল্পনার জন্য ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে কমিশনার নির্বাচন করিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। এবং ইহার নয় বৎসর পরে 'কর্পোরেশন' নাম দিয়া তিনজন কমিশনারের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। ইহার পরে নানা পর্বে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের নানা পরিবর্তন হইয়াছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে শহরের আয়তন ও পল্লী-সংখ্যা (ward) বাড়িতে লাগিল এবং ইহার ফলে পৌরশাসনের ও নগর-পরিকল্পনার সমস্যাও ক্রমে জটিল হইয়া উঠিল। এতদিন পর্যন্ত শহর গড়িয়া উঠিয়াছে অপরিকল্পিত ভাবে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার ঘরবাড়ি ও পথঘাটের উন্নতিসাধনের জন্য 'কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। এই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কার্যকলাপের ফলে শহরের

সেকালের কলিকাতা
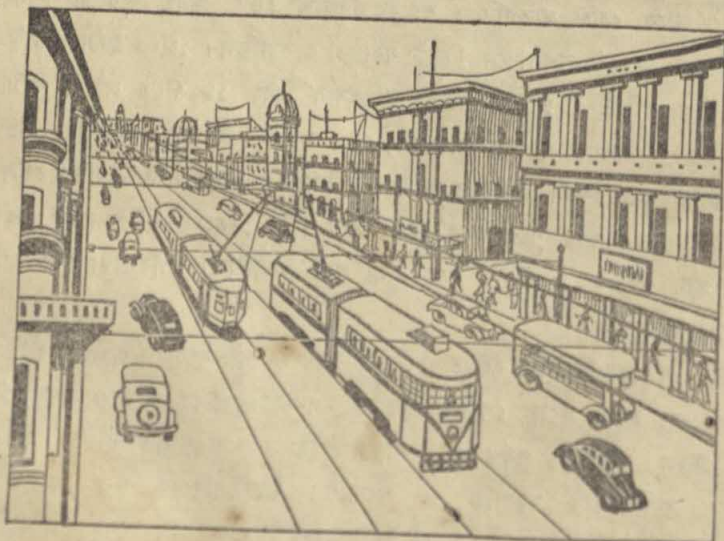
একালের কলিকাতা

বহু অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং বহু নূতন অঞ্চলে পরিচ্ছন্ন বসতি ও প্রশস্ত পথঘাট নির্মিত হইয়াছে। মহানগরীর নবরূপান্তর-সাধনে এই সংস্থার দান স্বীকার্য। শহর কলিকাতা তারপর দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শহরের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে ইহার লোকসংখ্যা যত বাড়িয়াছে, আয়তন তত বাড়িয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৬ লক্ষ, উনিশ শতকের শেষেও এই লোকসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায় নাই; এমন কি ১৯২১ সালে কলিকাতার জনসংখ্যা ৯ লক্ষের কোঠায় ছিল; তারপর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে লোকসংখ্যা ২১ লক্ষ হইয়াছে। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে এই শহরের পাকা ও কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৮৮ ও ১৪,৪৫০ খানি। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে উহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৯,৭৬৫ ও ৪১,৭৪৫।

আমাদের বাসগৃহ:

এইবার আমাদের **বাসস্থানের কথা** আলোচনা করিব। সমাজ-জীবনে মানুষের যে কয়েকটি মৌল প্রয়োজন, গৃহ বা বাসগৃহ তাহার মধ্যে একটি। গুরুত্ব বিচারে খাদ্যের পরই গৃহের স্থান। যেমন-তেমন স্থানে মাথা গুঁজিয়া থাকিলেই তাহাকে বাসস্থান বলা হয় না। প্রচুর আলো ও বাতাসযুক্ত গৃহকেই আদর্শ বাসগৃহ বলা হয়। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই দুইয়েরই প্রয়োজন। সূর্যের আলো জীবাণু ধ্বংস করে এবং বাতাস হইতে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। শুষ্ক উচ্চ জমির উপর বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হয়। নতুবা স্যাঁতসেঁতে জমিতে জীবাণুর সৃষ্টি হইয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতে পারে। তারপর যেস্থানে গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে, তাহার চারিদিকে কিছুটা জমি ফাঁকা রাখা দরকার। নতুবা গৃহের মধ্যে বাতাস অবাধে চলাচল করিতে পারিবে না। গৃহ নির্মাণের সময় উত্তর ও দক্ষিণ উন্মুক্ত রাখিয়া দেওয়াই বিধি। একটি পরিবারের বাসোপযোগী গৃহ বলিতে সাধারণতঃ বৈঠকখানা, শয়নঘর এবং রন্ধন করিবার ঘর—ইহাই বুঝায়। রান্নাঘরের উপযুক্ত জানালা-দরজার ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং ঘরের মধ্যে যাহাতে ধোঁয়া দাঁড়াইতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা রাখাও প্রয়োজন। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—সে সামাজিক জীবন যাপন করিয়া থাকে। নিকট প্রতিবেশীর সঙ্গে তাহার সমাজ-জীবন অঙ্গাঙ্গী-

ভাবে জড়িত। ইহা বিবেচনা করিয়া শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন অঞ্চলেই গৃহ নির্মাণ করা বিধেয়।

বিক্রয়কারী গ্রাম: গ্রাম বা গ্রাম্যসমাজ বলিতে আমরা চাষীবহুল স্থানের কথাই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু কৃষক ভিন্ন গ্রামের মধ্যে অন্যান্য বৃত্তিজীবীরও বাস আছে; যেমন কামার, জেলে, কুমোর ও তাঁতী ইত্যাদি। কিন্তু চাষীদের সংখ্যাই গ্রামে সাধারণতঃ বেশি। এই রকম দুইটি বৃত্তিজীবীর কথা আমরা আলোচনা করিতেছি।

কিন্তু তাহর পূর্বে **বিক্রয়কারী গ্রামের কথা** একটু বলা দরকার। ভারতবর্ষে এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে সব সময় নানাপ্রকার কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য ও কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে এবং এইভাবেই ঐগুলি দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর গ্রামকেই বিক্রয়কারী গ্রাম বা Village market বলা হইয়া থাকে। সমাজের অর্থনীতি অনেক পরিমাণে এই শ্রেণীর গ্রামগুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই দ্রব্যাদির বেশির ভাগ হাট-বাজারে বিক্রয় হয়। কখন কখন এইগুলি গ্রাম হইতেও বিক্রী করা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে গ্রামবাসীরা জিনিস-গুলি নিজেদের গ্রামের ঘরে মজুত রাখে। বাহির হইতে ছোট-ছোট ব্যবসায়ীরা আসিয়া ঐগুলি কিনিয়া লয়। গ্রামগুলি তখন সত্যই একটি বাজারের রূপ ধারণ করে এবং প্রতিটি গৃহ যেন এক-একটি দোকানে পরিণত হয়। গোলার ধান, তাঁতের কাপড় ও গামছা, হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি বিক্রয়ের মরশুম পড়িয়া যায়। এই গ্রাম-বাজারের অর্থনীতির দুইটি দিক আছে, প্রথম—ব্যবসায়ীদের এইভাবে জিনিস ক্রয় করিতে দরের দিক দিয়া কিছুটা সুবিধা হয়; দ্বিতীয়—গ্রামবাসীদের বাজার পর্যন্ত উৎপন্ন দ্রব্য বহিয়া লইয়া যাইতে হয় না এবং তাহাদের আর ক্রেতার সন্ধান করিতে হয় না।

কৃষিকার্য ভিন্ন গ্রামের অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের মধ্যে তন্তুবায় ও কুম্ভকার শ্রেণীর লোক বেশী। ভারতের বহু গ্রামের জনসমষ্টি কেবলমাত্র তাঁতের কাপড় তৈরী করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। পশ্চিম বাংলার হুগলী, হাওড়া, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন গ্রাম তাঁতবস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। এইসব গ্রামে প্রবেশ করিলেই শুধু তাঁতের খটখট শব্দ শোনা যায়। শান্তিপুর, রাজবলহাট, ধনেখালি প্রভৃতি গ্রামের

তাঁতবস্ত্রের খ্যাতি আজও আছে। প্রাচীনকাল হইতে বাংলা দেশের তাঁতশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলের আরম্ভ হইতে এবং কলের তৈরী কাপড়ের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বর্তমানে ভারতসরকার আবার ইহার পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হইয়াছেন।

তাঁতের কাপড় যেমন, তেমনি মাটির তৈরি জিনিসের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রাম প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতেই মাটির পাত্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কুমার নাই এমন গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে বিরল। ইহারা সাধারণতঃ মাটির হাঁড়ি, কলসী, কুঁজা প্রভৃতি তৈরি করিয়া থাকে। এই শিল্পের প্রধান ও একমাত্র উপকরণ মাটি এবং একটি কাঠের চাক। ইহার দ্বারাই লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী পুরুষানুক্রমে তাহাদের জীবিকা-অর্জন করিয়া থাকে। বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে এই মৃৎশিল্পটিকে একটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এলুমিনিয়মের বাসনপত্র আসিয়া মাটির হাঁড়ি-কলসীর স্থান দখল করিয়াছে।

গ্রাম্য মেলা: এইবার আমরা **গ্রাম্য মেলার** কথা আলোচনা করিব; গ্রাম্যসমাজের অর্থনীতিতে এই মেলাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। গ্রামে যে সব খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় তাহা সবই গ্রামের প্রয়োজনে লাগে না। উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র বাহিরের লোকের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। সাধারণতঃ এইগুলি ফিরি করিয়া বা গ্রামান্তরের হাটে লইয়া গিয়া বেচা হয়। কিন্তু ফিরি করা ও হাটে যাওয়া ভিন্ন বিক্রয়ের আরো একটি ব্যবস্থা আছে। গ্রাম্য মেলা হইল সেই ব্যবস্থা। রথ, রাস, পৌষ-পার্বন, শিবরাত্রি, শিবের গাজন প্রভৃতি পর্ব উপলক্ষে ভারতের নানা স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। এইসব মেলায় বহু লোক-সমাগম হয় এবং হরেক প্রকার জিনিসের কেনা-বেচা চলে। এক এক মেলায় এক এক জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। কোন মেলায় চাষের যন্ত্রপাতি, কোন মেলায় বাসন-কোষন, কোথাও কম্বল-সতরঞ্চ, কোথাও শীতবস্ত্র ও কোথাও তাঁতবস্ত্র প্রচুর ও সস্তায় পাওয়া যায়; অন্ততঃ লোকের তাই ধারণা। পূজার পর হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মেলা বসিবার প্রশস্ত সময়। কলিকাতা শহরে রথের মেলায় নানা রকমের গাছপালা, পাখী ইত্যাদির আমদানি হয়। কোন কোন মেলায় আবার গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ধরণের মেলা দেখা যায়। কোন মেলা দু-চার দিন চলে, আবার কোন মেল এক মাসেরও উপর চলিয়া থাকে। অনেক মেলা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বীরভূমের কেঁদুলিগ্রামের জয়দেব-মেলা খুব প্রাচীন। পৌষ-সংক্রান্তির দিন হইতে এই মেলা বসে, নিকটবর্তী ও বহুদূরের গ্রাম হইতে এই মেলায় জিনিসপত্রের ও লোকজনের আমদানি হয়। নবদ্বীপে রাস-পূর্ণিমার মেলাও প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে নানা সময়ে ছোট বড় অনেক মেলা বসিয়া থাকে। মেলাগুলির অর্থনৈতিক দিক যেমন আছে, তেমনি ইহার সামাজিক দিকও আছে। সামাজিক মেলামেশা, যাত্রা, কবি, থিয়েটার, সিনেমা, সার্কাস প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান এইসব বিভিন্ন মেলার একটা বৈশিষ্ট্য। বিক্রেতারা সাধারণতঃ এইসব মেলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে; প্রচুর লোকের সমাবেশ-হেতু তাহাদের জিনিসপত্র শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় হইয়া যায়। বর্তমানে যানবাহন ও পথঘাটের বিস্তারের ফলে দোকানপাট ও হাটবাজারের আধিক্যহেতু এইসব মেলাগুলি ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। মেলার অবনতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতি উভয়েরই ক্ষতি হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমষ্টির জীবনধারা

আমরা এ পর্যন্ত আমাদের দেশের বিভিন্ন জনসমষ্টির কথা আলোচনা করিলাম। এইবার আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনসমষ্টির জীবনধারার পরিচয় লইব। আমাদের আলোচনার বিষয় ঃ

(১) উত্তর সাইবেরিয়ার জনসমষ্টি
(২) মালয়ের জনসমষ্টি
(৩) সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরের জনসমষ্টি
(৪) সুইডার সী-র ওলন্দাজ জনসমষ্টি
(৫) উত্তর-চীনের জনসমষ্টি
(৬) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরি অঞ্চলের জনসমষ্টি
(৭) পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ার জনসমষ্টি ; এবং
(৮) রাইন নদীর উপত্যকার জনসমষ্টি

এই সব জনসমষ্টির প্রত্যেকের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য আছে এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাইব যে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছন্দ একই। সেখানে ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলের একটি জনসমষ্টির জীবনযাত্রার সহিত পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের (অবশ্য যে অঞ্চলের মানুষ সমাজবদ্ধ-ভাবে বাস করিয়া থাকে) একটি জনসমষ্টির জীবনযাত্রার বহুল পরিমাণে ঐক্য বিদ্যমান। বৈচিত্র্য যেটুকু পরিলক্ষিত হয় তাহা একান্তভাবেই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের ফল। এই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন বা পরিবেশ জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যেদিন হইতে সামাজিক জীবনযাত্রা গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে সেইদিন হইতে প্রকৃতি হইতে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হইলেও, প্রকৃতির উপর নির্ভরতা সে একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এই নির্ভরতার প্রভাব আঞ্চলিক জনসমষ্টির উপর পড়িতে বাধ্য।

মানুষের সমাজ কিছুটা প্রকৃতি আর কিছুটা জনকৃতির ফল। এই নিয়ম পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে চলিতেছে।

উত্তর সাইবেরিয়ার জনসমষ্টি :

ভূগোলে তোমরা **সাইবেরিয়ার** নাম পড়িয়াছ এবং মানচিত্রে উহার অবস্থানও দেখিয়া থাকিবে। উরাল পর্বতশ্রেণী হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল প্রসারিত। ভূ-বিদ্‌দের মতে পৃথিবীর এই অঞ্চল অত্যন্ত শীতপ্রধান। সাইবেরিয়ার শীতে শুধু নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় না, দুধ, মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যও জমিয়া শক্ত হইয়া যায়। এক কথায়, সাইবেরিয়া বরফের দেশ। বল্গা-হরিণের চাকাবিহীন স্লেজগাড়ি ভিন্ন এই তুষারপ্রদেশে চলাফেরা করা

সাইবেরিয়ার অধিবাসী

অসম্ভব। এই অঞ্চলে বলিষ্ঠ মানুষের বসতি; এখানকার জমিতে সাধারণ গাছ-গাছড়া বাঁচিতে পারে না। সাইবেরিয়ার অরণ্যে তাই দেবদারু, ফার, স্প্রুস, পাইন প্রভৃতি গাছেরই আধিক্য বেশি। শিকার ও পশুপালন এখানকার অধিবাসীদের জীবিকা। পশুর মধ্যে বলগা-হরিণই প্রধান। এই তুষার-মরুভূমিতে শস্য-উৎপাদন

অসম্ভব মনে করিয়া স্থানীয় জনসমষ্টি বল্‌গা-হরিণ পালন করিত, অরণ্যের জন্তু শিকার করিত এবং নদ-নদীতে মাছ ধরিত। জারের আমলে সাইবেরিয়ার যে চেহারা ছিল, বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার আমলে সে চেহারা আর নাই। রুশ বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়াররা এখন নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া সাইবেরিয়ার জনসমষ্টির জীবনযাত্রার বহুল পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছে। যাহারা এক সময়ে কেবল বল্‌গা-হরিণ পালন ও শিকার করিত, তাহারা এখন যৌথ খামার (collective farm) গড়িয়া গমের চাষ করিতেছে ও পশুপালন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে; এই রুক্ষ ও অনুর্বর অঞ্চলের যাবতীয় প্রতিকূল পরিবেশকে মানুষ নিজেদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায় অনেকখানি আয়ত্তে আনিয়াছে। সাইবেরিয়াতে এখন শহর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

সাইবেরিয়ার উত্তরে চুকচিস, তুঙ্গুস, সাময়েড প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতি বাস করে। এই উত্তর অঞ্চলের জনসমষ্টি বল্‌গা-হরিণ পালন করে। ইহারা চামড়া অথবা বরফের ঘর তৈরী করিয়া সমস্ত শীতকাল সেই ঘরের মধ্যে থাকিয়া দিনাতিপাত করে। বল্‌গা-হরিণই ইহাদের জীবনযাত্রার একমাত্র আশ্রয়; তাহাদের আহার্য-হিসাবে ইহার মাংস ব্যবহৃত হয়; ইহার চামড়া ও লোম দিয়া জামা প্রস্তুত হয়। ইহা ভিন্ন বল্‌গা-হরিণের মাংস, চামড়া এবং লোমের বিনিময়ে বহু জিনিস আমদানি করা হইয়া থাকে। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্দেশ অনুযায়ী সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলের জনগোষ্ঠী যৌথভাবে বল্‌গা-হরিণ পালন করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু উত্তর-সাইবেরিয়ার বরফাচ্ছন্ন নদীগুলির এখন পর্যন্ত উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

সমগ্র উত্তর-সাইবেরিয়ায় যাতায়াতের অসুবিধা এখনও বিদ্যমান। এখানকার দুর্গম পর্বতমালায় অনেক রকম খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রচণ্ড শীতের দরুণ ঐসব খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করা এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। রুশ-বৈজ্ঞানিকেরা এই অঞ্চলের জমিতে ফসল উৎপাদন করিবার আশাও করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে সোভিয়েট সরকার একটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রমাগত উন্নয়নের ফলে এই অঞ্চলে বর্তমানে এক কোটি লোকের বসতি স্থাপন করা হইয়াছে। যাতায়াতের অসুবিধার জন্যই এই উন্নয়ন আশানুযায়ী হইতেছে না। নদীই এই অঞ্চলে যাতায়াতের একমাত্র উপায়, কিন্তু নদীগুলি প্রায় সারা বৎসর

বরফে জমিয়া দুর্গম হইয়া থাকে। যখন নদীপথে উত্তর-সাইবেরিয়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্নত হইবে, তখন আশা করা যায়, স্থানীয় জনসমষ্টি তাহাদের বল্‌গা-হরিণগুলি বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ঐসব অঞ্চলে অধিবাসীদের পশুপালনের যৌথপদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের রপ্তানি-ক্ষেত্রে প্রসার সম্ভবপর হইবে। বর্তমানে বিমানপথ দ্বারা এখানকার অধিবাসীদের সহিত যোগাযোগ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সোভিয়েট সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমেই এই স্থানের জনসমষ্টি তাহাদের যাযাবর জীবনের পরিবর্তে উন্নত এবং আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইতেছে।

মালয়ের জনসমষ্টি ঃ

অরণ্য—ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বে **মালয় উপদ্বীপ**। সমগ্র মালয় ও তাহার সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ গভীর অরণ্য ও জলাভূমি-সমাকীর্ণ অঞ্চল। মালয়ের অরণ্য প্রসিদ্ধ। বিষুবরেখার সন্নিকটে বলিয়া মালয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাই এখানে অরণ্য গভীর। এত অসংখ্য প্রকারের গাছ এবং এই রকম বিশাল গাছ পৃথিবীর অন্য কোথাও বড় একটা জন্মে না। এখানকার কোন কোন গাছের উচ্চতা ২৫০ ফুট পর্যন্ত। মালয়ের পূর্বাঞ্চলের অরণ্য তেমন নিবিড় নয়। সমগ্র মালয় দেশের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র জলাভূমি।

রবার ও টিন—মালয়ের রবার ও টিন পৃথিবী-বিখ্যাত। সমগ্র পৃথিবীতে যত রবার ও টিন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই মালয়ে উৎপন্ন হয়। রবার এক রকমের গাছের আঠা ; এই আঠা বা কষ শুকাইয়া রবারের চাদর তৈরী করা হয় কারখানায়, এবং সেই চাদরই বাহিরে রপ্তানি করা হয়। আসামের যেমন চা-বাগান, মালয়ের তেমনি **রবার-বাগান** (Rubber plantation) প্রসিদ্ধ। মালয়ের প্রধান খাদ্য-শস্য ধান। পশ্চিম উপকূলের নিম্নভূমিতে ধানচাষ হয়, আবার দ্বীপপুঞ্জের পার্বত্য-অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে থাক কাটিয়া (আলমোড়া অঞ্চলের চাষের মতন) চাষ হয়। নারিকেল গাছ মালয়ের আর একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। এত নারিকেল গাছ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। মালয়ের প্রধান বন্দর তিনটি, যথা—সিঙ্গাপুর,

পেনাঙ ও মালাক্কা; ইহার মধ্যে সিঙ্গাপুরই কেন্দ্রীয় বন্দর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইহাই বৃহত্তম বন্দর। চারিপাশের দ্বীপপুঞ্জ হইতে রপ্তানির মালপত্র সিঙ্গাপুরের বন্দরে আসে এবং সেখান হইতে জাহাজে করিয়া বিদেশে চালান যায়। অভ্যন্তরের সহিত যোগাযোগের জন্য রেলপথ ও মোটরপথ আছে।
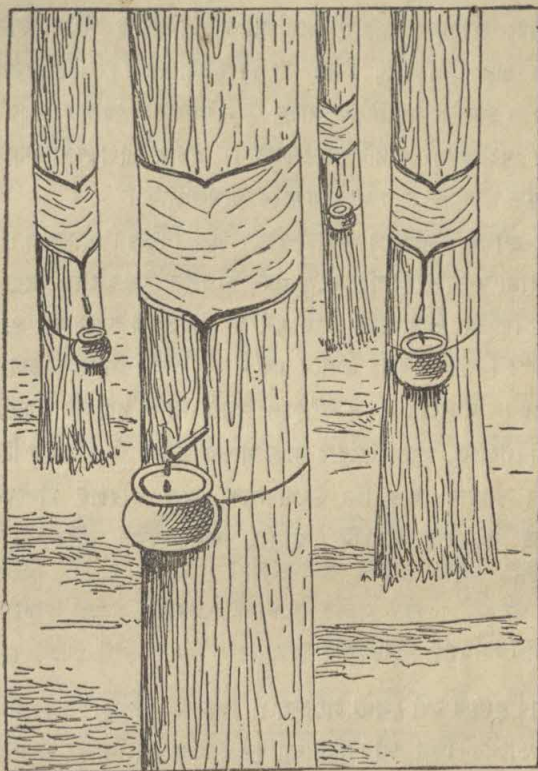
মালয়ের রবার ক্ষেত

আদিবাসী ও নূতন বাসিন্দা—মালয়ের অরণ্যের মধ্যে সাকাই, সেমাং, বামুন, ওরাং ও বেনুয়া নামে কয়েকটি জনসমষ্টি বাস করে। ইহারা দেখিতে খর্বাকৃতি, গায়ের রঙ তামাটে কৃষ্ণবর্ণ ও নাক চ্যাপ্টা। ফলমূল সংগ্রহ করা এবং শিকার ইহাদের জীবিকা। এইসব অধিবাসী ভিন্ন বহু মুসলমান, ভারতীয়, চীনা এবং

ইউরোপীয়গণ মালয়ে বসতিস্থাপন করিয়াছে। অধিকাংশ ভারতীয় ও চীনা অধিবাসী রবার বাগানে কুলির কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। মালয়ে শ্রমিকের অল্পতার জন্য বাহির হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হয়। রবার চাষকে কেন্দ্র করিয়াই মালয়ের বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চল পরিষ্কৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট এবং আধুনিক সুখ-সুবিধার সমস্ত প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া উঠিয়াছে। রবার ভিন্ন মালয়ে প্রচুর পরিমাণে টিনও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই টিনের কারখানাতেও বহু ভারতীয় ও চীনা শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এইভাবে বহিরাগত ভারতীয় ও চীনাদের একটি স্থায়ী বসতি মালয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ বন্দরে ও নগরে বাস করে। প্রকৃত মালয়ীরা বাস করে মালয়ের গ্রামগুলিতে।

সমাজ-জীবন—মালয়ের সমাজ-জীবন এক বিচিত্র মিশ্র-সমাজ। রবার-শিল্প ও টিনের কারখানা স্থাপিত হইবার ফলে এই দ্বীপপুঞ্জ অল্পকালের মধ্যেই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং ধর্ম ও কৃষ্টিসম্পন্ন জনসমষ্টি প্রধানতঃ রবারের আবাদের উপর নির্ভর করিয়াই এখানে এক নূতন সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে বলা যাইতে পারে। মালয়ের সমুদ্র উপকূলে সারি সারি রবারের বৃক্ষগুলি মাইলের পর মাইল চলিয়া গিয়াছে, আর অরণ্যের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে একাধিক টিনের কারখানা। এই রবারের আবাদ আর টিন উৎপাদনকে কেন্দ্র করিয়াই মালয়ের সমাজ-জীবন যেমন উন্নত হইয়াছে, তেমনি স্থানীয় জনসমষ্টিরও জীবনযাত্রায় আসিয়াছে নানা পরিবর্তন।

সেণ্ট লরেন্স তীরের জন-সমষ্টি ঃ

কানাডার বৃহত্তম নদী **সেণ্ট লরেন্স**। কানাডার প্রাকৃতিক বিন্যাস বড় বিচিত্র। ইহার চার ভাগের তিন ভাগ বরফাচ্ছাদিত অঞ্চল এবং পশ্চিম অংশ উচ্চ পর্বতমালায় আচ্ছাদিত; বসতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা একমাত্র দক্ষিণ কানাডায়। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার লেক সুপিরিয়র হইতে প্রবাহিত সেণ্ট লরেন্স নদীর দুই তীরে ও অববাহিকা অঞ্চলে এখানকার সুসমৃদ্ধ জনপদ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অপর্যাপ্ত কাঁচামালের জন্য এই অঞ্চল প্রসিদ্ধ।

কানাডার দক্ষিণ ভাগ উর্বর ও ফলপ্রসূ। খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার বলিয়া

কানাডার প্রসিদ্ধি আছে। কয়লা, লোহা, তেল, সোনা, তামা, রূপা ও নিকেল ইত্যাদি এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই কানাডার অধিবাসীদের এক অংশ শিল্পকার্যে লিপ্ত, আর অপর অংশ কৃষিকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। মধ্য কানাডার অধিবাসীদেরই জীবিকা হইল কৃষি। খনিজ অঞ্চলে বহু কলকারখানা ও উন্নত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। লরেন্সের তীরে কানাডার দুইটি বিখ্যাত শহর হইল কুইবেক ও মনট্রিয়েল। কুইবেক ও মনট্রিয়েল একসঙ্গে বন্দর এবং শহর।

সেণ্ট লরেন্স নদীর উপত্যকার জনসমষ্টি বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, আইরিশ এবং স্কটল্যাণ্ডের লোক প্রধান। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য দেখা যায়। কানাডার কৃষিক্ষেত্রগুলি মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত। যখন চাষ করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জনসমষ্টি মধ্য অঞ্চলে গমন করিয়া কৃষিকার্য পরিচালনা করে এবং কৃষিজাত দ্রব্য রেলপথে লরেন্স নদীর তীরে আনিয়া জমা করে। এইখান হইতে তাহারা কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে।

নদীর তীরের জনসমষ্টির একটি বিপুল অংশ আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে মাছ ধরিবার কার্যে নিযুক্ত আছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে টিনে প্যাক করিয়া এই সব মাছ তাহারা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান দেয়। ইহাকে বলা হয় tinned fish বা টিনের মাছ। এই ব্যবসায়ে কানাডার প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়। সেইজন্য কানাডার উপকূল অঞ্চলে মাছের ব্যবসা খুব সমৃদ্ধ। কড্, শীল, হেরিং, চিংড়ি প্রভৃতি নানাপ্রকার মাছ এই অঞ্চলে ধরা হয় এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মনট্রিয়েল বন্দর হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ মাছ বিদেশে চালান যায়। এই মাছ রপ্তানির ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া এই সব অঞ্চলে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

সেণ্ট লরেন্স নদীর উপকূলে যে জনসমষ্টির বসতি, তাহাদের জীবন মুখ্যতঃ শিল্পকেন্দ্রিক। লোকসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় এখানে অপর্যাপ্ত কাঁচামাল (raw material) উৎপন্ন হইয়া থাকে। সভ্যতার নিয়মই হইল পৃথিবীর যে অঞ্চলে কাঁচামাল প্রচুর, সেই অঞ্চলের ঐশ্বর্যও তত বেশি। লরেন্স নদীর উপত্যকা

ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কাঁচামালকে কেন্দ্র করিয়াই এই উপত্যকায় নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পৃথিবীর মধ্যে এই নদীর উপকূল অঞ্চল শিল্পপ্রধান অঞ্চল-হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। স্থানীয় জনসমষ্টির সমাজ-জীবনে এই শিল্পের প্রভাব প্রত্যক্ষ। অধ্যবসায়, শ্রমকুশলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা—লরেন্স নদীর উপত্যকাবাসীদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্থইডার সী-র ওলন্দাজ জনসমষ্টি ঃ

য়ুরোপের মধ্যে একটি বিচিত্র দেশ **হল্যাণ্ড**। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় ডাচ্ বা ওলন্দাজ। এই ওলন্দাজ জনসমষ্টির কথা এইবার বলিব। নিম্নভূমির অধিবাসী বলিয়া ডাচ্‌দিগকে নেদারল্যাণ্ডবাসীও বলা হইয়া থাকে। হল্যাণ্ড অতি ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু ইহার অধিবাসীদের উদ্যম ও কর্মশক্তি বিস্ময়কর। এই ক্ষুদ্র দেশের অধিবাসীরাই একদা সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ভারতবর্ষ ও পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জে এক বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহা হইল ইতিহাসের কথা। ডাচ্‌দের খ্যাতি তাহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধির জন্য। ডাচ্‌রা একাধারে ব্যবসায়ী এবং কৃষক।

এই হল্যাণ্ড দেশ ডাচ্‌দের নিজেদের সৃষ্টি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে হল্যাণ্ড অনেক নীচু দেশ। এই নিম্নভূমি নালা ও ডোবায় ভরা এবং বহু টুকরায় খণ্ডিত। সমুদ্রের জল আসিয়া সমস্ত দেশটাকে প্রায়ই প্লাবিত করিয়া দিতে পারে। একদিকে সমুদ্র আর অন্যদিকে জলাশয়—হল্যাণ্ডের অধিবাসিগণকে বহুকাল ধরিয়া ইহারই সহিত লড়াই করিতে হইয়াছে। প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশ যে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবন কতখানি নিয়ন্ত্রণ করে ডাচ্‌দের 'স্থইডার সী' হইতে ভূমি উদ্ধারের পরিকল্পনা তাহার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

উত্তর-সাগরের সহিত সংযুক্ত একটি খাঁড়ির নাম স্থইডার সী (Zuider Zee)। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থইডার সী-র পার্শ্ববর্তী প্রায় সমস্ত অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিম্নে অবস্থিত এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। সুতরাং উহা উত্তর সাগরের জলে ভাসিয়া যাইত। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ডাচ্‌রা উত্তর হল্যাণ্ডে একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া বন্যার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনার ফল স্থইডার সী। প্রথমে সমুদ্রের মুখে একটি কুড়ি মাইল দীর্ঘ এবং বিশ-পঁচিশ ফুট

উঁচু বাঁধ তাহারা নির্মাণ করিয়াছে। এই বাঁধগুলির জন্য সমুদ্রের জল দেশকে প্লাবিত করিতে পারে না। ইহার পরে তাহারা সমুদ্রতীরে উইণ্ডমিল (wind-mill) নামক বায়ুচালিত এক প্রকার যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছে এবং দেশের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট খালও কাটিয়াছে। ঐ সব খাল দিয়া উইণ্ড মিলের সাহায্যে জল বাহির হইয়া যায়।
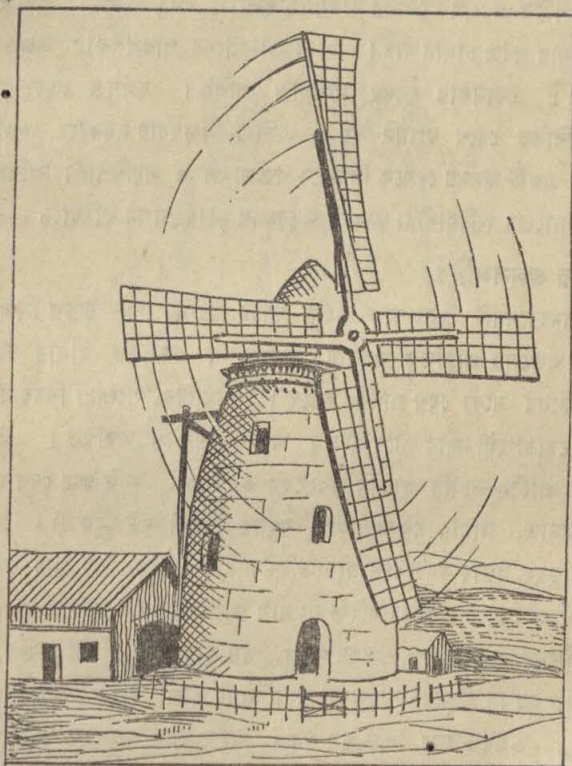
হল্যাণ্ডের উইণ্ড-মিল

এইভাবে জলনিকাশ হওয়ায় বহু জলমগ্ন ভূমি এখন শস্যক্ষেত্রে ও চারণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই সব খালে এখন নৌকা ও স্টীমার চলে। এই পরিকল্পনার কাজ এখনও চলিতেছে। এইভাবে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া ডাচরা এখন উন্নত সমাজ-সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে।

আগে যখন বৃহৎ জলাশয় ছিল তখন এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মাছ ধরিয়া জীবিকা-অর্জন করিত, কিন্তু এখন জল বাহির হইয়া যাওয়ায় জলাশয় ডাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে ; সুতরাং অধিবাসীদের জীবনধারায় পরিবর্তন আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য, পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা দ্বারা ইহারা এখন সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। পনীর ও মাখন তৈরির ব্যবসায়ে হল্যাণ্ড এখন প্রসিদ্ধ। হল্যাণ্ডের মাখন ও পনীর পৃথিবীর সর্বত্র চালান যায়। জাহাজ-নির্মাণের পারদর্শিতার জন্যও ডাচ্‌দের খ্যাতি আছে। এখানকার ফুলের ব্যবসাও প্রসিদ্ধ। হল্যাণ্ড হইতে প্রচুর ফুল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। একনিষ্ঠ অধ্যবসায় সহকারে প্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়া একটি জলময় দেশকে কিভাবে শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারা যায়, হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

উত্তর চীনের জনসমষ্টি :

চীন উপমহাদেশটি প্রকৃতপক্ষে দুইটি ভাগে বিভক্ত, যথা—**উত্তর চীন** ও **দক্ষিণ চীন**। দুই অঞ্চলের প্রাকৃতিক জলবায়ু, ভূ-সংস্থান, এমন কি স্থানীয় অধিবাসীদের শারীরিক গঠনের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় উত্তর চীনের জনসমষ্টি। হোয়াংহো নদীর তীরে উত্তর চীনের ভূমিখণ্ড অবস্থিত। এই অঞ্চলের সভ্যতা খুব প্রাচীন—চারি হাজার বৎসরের কম নহে। অতি রুক্ষ দেশ উত্তর চীন। বৃষ্টিপাত নামমাত্র, আবার কোন কোন বৎসর আদৌ বৃষ্টি হয় না। কোন বৎসর হোয়াং-হোর দুরন্ত বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। হল্যাণ্ডের ন্যায় উত্তর চীনের জনসমষ্টিকেও এই ভাবে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া কৃষিকার্য করিতে হয়।

উত্তর চীনের প্রধান শস্য ও খাদ্য গম। গম ছাড়া ভুট্টা, জোয়ার, জই, মটর, বীন প্রভৃতির চাষও হয়। উত্তরের খনিজ সম্পদের মধ্যে শান্সী অঞ্চল কয়লা ও লোহার জন্য বিখ্যাত। উত্তর চীনের বসতি খুব ঘন। জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিকার্যের যোগ্য স্থান যথেষ্ট না থাকার দরুণ একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে। জনসমষ্টিকে তাই কঠোর পরিশ্রম করিয়া খুব ভালভাবে চাষ করিয়া জমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন করিতে হয়। ইহাকে বলা হয় গভীর চাষ (intensive cultivation)। গুটিপোকা হইতে রেশম উৎপাদনও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই গুটিপোকারও চাষ করে।

উত্তর-চীন কৃষিপ্রধান দেশ। জমির স্বল্পতাহেতু এখানে গভীর চাষের অর্থাৎ intensive cultivation-এর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। শিল্পের দিক দিয়া উত্তর-চীন এক কাল অনুন্নত ছিল। বর্তমানে শিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। গণতন্ত্রী চীনে কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে এখন জমি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কৃষি-সমবায় গড়িয়া উঠিয়াছে

উত্তর-চীনের অধিবাসী

এবং এই সব প্রতিষ্ঠানকে চীনের জাতীয় সরকার প্রচুর ঋণ দিয়া সাহায্য করিতেছেন আধুনিক ট্রাক্টর ব্যবহারের ফলে চাষবাসের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং পূর্বের তুলনায় ফলন এখন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে হোয়াং-হো নদীর বন্যার দরুণ শস্যের খুব ক্ষতি হইত, এখন সেই বন্যাকে আয়ত্তে আনিবার জন্য নদীতে বাঁধ দিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে কৃষিপ্রধান প্রায় সকল দেশেই নদীতে বাঁধ দিয়া ক্ষেতে জলসেচের ব্যবস্থা উন্নততর করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদীতে এবং

উড়িষ্যায় মহানদীতে এইভাবে বাঁধ নির্মাণপূর্বক কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনে ভারত-সরকার মনোযোগী হইয়াছেন।

চীনের রাজধানী পিকিং উত্তর-চীনে অবস্থিত। পিকিং নগরে এখন বহু কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্বত্র নূতন নূতন রেলপথ প্রসারিত হইতেছে। এই শিল্পায়ন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমবায় প্রথায় চাষবাসের ফলে উত্তর-চীনের অধিবাসীদের শতাব্দীব্যাপী বিড়ম্বিত জীবনধারায় যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিয়াছে বলিলে চলে। চীনের সমাজে পারিবারিক ভিত্তি খুব দৃঢ়। পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি এবং চীনের পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া এখানকার সমাজ-জীবনে বাহিরের প্রভাব কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। যৌথ চাষবাস, সংঘবদ্ধ কাজকর্ম এবং সেই সঙ্গে নিজেদের সুপ্রাচীন সামাজিক ঐতিহ্যবোধ—ইহার ভিতর দিয়াই উত্তর-চীনের জনসমষ্টি এক নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে।

আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চল :

আমরা ভূগোল পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, উত্তর আমেরিকায় চারটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল আছে ; যথা—(১) অরণ্য অঞ্চল ; (২) পার্বত্য অঞ্চল ; (৩) তৃণভূমি অঞ্চল ও (৪) সমতলভূমি অঞ্চল। ইহার মধ্যে তৃণভূমি বা **প্রেইরি (Prairie)** অঞ্চলের জনসমষ্টির কথা এইবার আলোচনা করিব। তৃণভূমি অঞ্চল দুইভাগে বিভক্ত—গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তৃণভূমি এবং নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি। এই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমিকেই 'প্রেইরি' অঞ্চল বলা হইয়া থাকে। প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকাই এই অঞ্চলের অন্তর্গত। প্রেইরি অঞ্চল এক প্রকার দীর্ঘ তৃণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এখানে কোন বৃক্ষ জন্মায় না, কেবল ঘাস জন্মিয়া থাকে। সেইজন্যই ইহার নাম প্রেইরি বা তৃণভূমি। দূর হইতে বিস্তীর্ণস্থানব্যাপী এই তরঙ্গায়িত তৃণভূমি দেখিতে মনোরম।

প্রেইরি আমেরিকার গম-শস্য উৎপাদনের বৃহৎ অঞ্চল। গম ছাড়াও এখানে ভুট্টা এবং তুলার চাষও হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে কৃষিকার্য অত্যন্ত কঠিন। এখানকার জনসমষ্টি প্রধানতঃ গো-পালন দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। তৃণক্ষেত্রগুলি পশুচারণক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। এক-একজন মালিকের বহুসংখ্যক গরু থাকে। স্থানীয় জনসমষ্টি দ্বারাই তাঁহারা গোপালন করিয়া থাকেন। এই গো-পালকের দল মাঠের মধ্যে কাঠের ঘর তৈরি করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বসবাস করে।

শহরগুলি খুব দূরে অবস্থিত। তাই প্রেইরি অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। মালিকেরা গরু কেনা-বেচার জন্য সময়ে সময়ে গোপালকদের শহরে পাঠাইয়া দেয়। প্রেইরি অঞ্চলের জনসমষ্টি গোপালন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায়। পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসী-জনসমষ্টির তুলনায় প্রেইরি অঞ্চলের জনসমষ্টি উন্নততর জীবন-যাপন করিয়া থাকে। খোলা মাঠে প্রচুর আলো-হাওয়ার মধ্যে থাকে বলিয়া ইহাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল। ঘোড়ায় চড়িয়া গোরু চরায় বলিয়া অশ্বারোহণেও ইহারা খুব দক্ষ।

প্রেইরি অঞ্চলের ক্ষেতের আয়তন খুব বড় হয় এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যেই চাষ করিতে হয়। লাঙলের বদলে ট্রাক্টর দিয়া জমি চষিতে হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ফসল কাটিবার সময়। ফসল কাটা ও ঝাড়া দুই-ই যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। ক্ষেত হইতে বস্তা বোঝাই গম আড়তে পাঠান হয়। আড়ত হইতে লরী করিয়া রেল-স্টেশনের বা নদীর বন্দরের কাছে বড় শস্যাগারে গম মজুত করা হয়। সেখান হইতে উহা রেলপথে বিভিন্ন কলকারখানায় বা জলপথে বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা তৃণভূমি-অঞ্চলের জনসমষ্টি উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা অনেক উন্নত। আবার দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আর্জেন্টিনা অনেক উন্নত। এখানকার তৃণভূমিতে চাষবাস ও পশুপালন দুই-ই হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে আর্জেন্টিনার গমের যথেষ্ট খ্যাতি ও চাহিদা আছে। গম ভিন্ন এখান হইতে মাংস এবং পশম প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান যায়। গম, মাংস ও পশমের বাণিজ্যের জন্য এখানকার যানবাহন খুব উন্নত ধরনের। পথঘাট, রেলপথের যেখানে প্রাচুর্য সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা স্বভাবতঃই উন্নত না হইয়া পারে না।

পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ার জনসমষ্টি ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার ভৌগোলিক পরিবেশটি এই রকম ঃ ইহার মধ্যভাগে নিম্নভূমি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিকে উচ্চভূমি। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী ভূমি ক্রমে খাড়া হইয়া উচু দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কিছু অংশ শুষ্ক ও অনুর্বর, কিছুটা অরণ্য ও

আবাদী ভূমি এবং কিছুটা তৃণভূমি। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া একটি মরুময় অঞ্চল; কিন্তু এই মরু অঞ্চলেও প্রচুর চাষ-আবাদ হয়।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন জনসমষ্টির বসতি। ইহাদের জীবনধারা উন্নত। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। পৃথিবীর পরিচিত চারিটি মহাদেশের পর অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়। তখন হইতেই এখানে ইংরেজদের বাস। য়ুরোপ হইতে ইহারা দলে দলে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে থাকে। তথাপি স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের কিছু কিছু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বনে-জঙ্গলে, মরুপ্রান্তরে অথবা সমুদ্রের উপকূলে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের মাথার চুল কোঁকড়ান, প্রায় উলঙ্গ বলিলেই হয়, নাক চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ ঘোর কালো। শিকার ইহাদের জীবিকা।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াতে উনিশ শতকের শেষভাগে দুইটি সোনার খনি আবিষ্কার হয়। খনি দুইটির নাম কালগুলি ও কুলগাডি। ইহার কিছু পরে এখানে কয়েকটি কয়লার খনিও আবিষ্কৃত হয়। এই খনিগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমান পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার শহরগুলি খনি-শহর নামে প্রসিদ্ধ। সোনার খনি এবং কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইবার পর এখানে কৃষিকার্য, পশু-চারণ এবং অন্যান্য কলকারখানা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই এখানকার জনসমষ্টি এক উন্নত ধরণের রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া কৃষিকার্য হয়। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে গমের ফলনই বেশি। এখানে এত অপর্যাপ্ত গম উৎপন্ন হয় যে স্থানীয় জনসমষ্টির চাহিদা মিটাইয়া প্রচুর পরিমাণে গম বিদেশে চালান যায়। পশুপালনের জন্যও অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতি আছে। এখান হইতে বিদেশের বাজারে প্রচুর মাংস ও চামড়া রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে জনসংখ্যা অল্প, জিনিসপত্র হয় বেশি; তাই অষ্ট্রেলিয়ার জনসমষ্টি প্রভূত পরিমাণে পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে দেশের রেলপথ, স্থলপথ এবং বিমানপথ উন্নত। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে আর একটি হইল ফল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসমষ্টি তাই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। প্রকৃতির অকৃপণ ও অফুরন্ত দান আর

মানুষের বিপুল পরিশ্রম এই দুই মিলিয়া দেশ কত সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

রাইন নদীর উপত্যকার জন-সমষ্টি :

য়ুরোপের নদ-নদীর মধ্যে **রাইন** নদী বিখ্যাত। য়ুরোপের মানচিত্রে দেখিতে পাইবে, সুইজারল্যাণ্ডের এক হিমবাহ হইতে রাইন নদীর উৎপত্তি। পাহাড়ী নদীর মতন ইহা উৎস হইতে বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত প্রবাহপথের উত্তর দিক হইতে জার্মানি ও ফ্রান্সকে ভাগ করিয়া, একটি বিশ মাইল প্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া রাইন নদী বহিয়া গিয়াছে। ইহাকে বলা হয় রাইনের মধ্যভাগ। পশ্চিম জার্মানির মধ্য দিয়া প্রবাহিত রাইনের উপত্যকায় অতি অল্পকালের মধ্যে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। উপত্যকা অঞ্চলটি বহু প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ; সেই কারণে ইহা শিল্প-প্রধান হইতে পারিয়াছে। রাইনের মধ্য উপত্যকায় দুইটি নদী আসিয়া মিশিয়াছে। ইহাদের নাম—নেকার ও মেন। মেন ও রাইনের সঙ্গমমুখে বিখ্যাত শিল্পশহর ফ্র্যাঙ্কফার্ট। ইহা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কয়লা ও লোহা এখানে নদীপথে আনা হয়।

কলোনের কাছে রাইন নদী সমভূমিতে নামিয়াছে। এইখানে একটি বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। কলোন একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র, এসেন ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র এবং ডুটস্‌বার্গ এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ নদীবন্দর। এইখানে রুঢ় (Ruhr) নদী আসিয়া রাইনের সহিত মিশিয়াছে। রুঢ়ের কয়লা-খনি ও লোহার খনি য়ুরোপের মধ্যে বৃহত্তম। কয়লা ও লোহাই এখানকার প্রধান সম্পদ। লোহার খনি থাকার দরুণ এই অঞ্চলে বিরাট ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ জানিয়া রাখা দরকার যে, বর্তমান যুগে পৃথিবীর যে অঞ্চলে কয়লা ও লোহা—এই দুইটি খনিজদ্রব্যের মিলন হইয়াছে, সেখানেই বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র ও শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে অনুরূপ কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে আসানসোল অঞ্চলে একটি বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে।

রাইন নদীর উপত্যকায় যে বিরাট জনসমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে শিল্পজীবী জনসমষ্টি বলা যাইতে পারে। ইহার পার্বত্য অঞ্চলে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে

ঘড়ি প্রস্তুতের কারখানাগুলি অবস্থিত। সমগ্র রাইন উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে এই কয়টি বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা—ছুরি ও চামচ তৈরির কারখানা, জাহাজ নির্মাণের কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্য ও রঙের কারখানা; বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও পেনসিলের কারখানা; পশম ও রেশম শিল্পের কারখানা, গেঞ্জির কারখানা এবং ঘড়ি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কারখানা। একটি নদীর প্রবাহপথকে কেন্দ্র করিয়া এত গুলি শিল্প পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

আমরা এখানে যে কয়টি বিদেশী জনসমষ্টির কথা আলোচনা করিলাম, তাহাদের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা জানিয়া রাখা দরকার। ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রা ও বিশেষ শিল্পদ্রব্য-উৎপাদনের সম্পর্ক কতখানি, তাহা সাইবেরিয়া, উত্তর-চীন, রাইনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও মালয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ-জীবন যত উন্নত হইতেছে, ততই শিল্পের প্রাদুর্ভাব ও প্রসার ঘটিতেছে; বর্তমানের সমাজ-জীবন তাই বহুল পরিমাণে শিল্পকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে। এই শিল্প-সভ্যতার (industrial civilization) যুগে মানুষের সমাজ-জীবনের সকল স্তরেই বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। কৃষিযুগ অতিক্রম করিয়া এখন মানুষ শিল্পযুগে আসিয়াছে এবং ইহার ফলে তাহার সমাজ পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

1. What is the relation between individual and community? Discuss the object and necessity of man's living in community,

ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? মানুষের সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

2. Give a brief account of the communities in our country.

আমাদের দেশের জনসমষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

3. How does the community help us to meet our primary needs of food, dress and shelter?

কিভাবে জনসমষ্টি আমাদের খাদ্য, পোষাক ও বাসগৃহ এই তিন প্রাথমিক প্রয়োজন-সাধনে সাহায্য করিয়া থাকে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

1. Discuss the food-gathering economy of the primitive men and of the present civilized people.

আদিম মানুষের ও আধুনিক সভ্য মানুষের খাদ্যসংগ্রহের পদ্ধতির একটি তুলনা-মূলক আলোচনা লিখ।

2. Give a brief account of the life of the Andamanese people.

আন্দামান দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

1. Where is Almora? What are the peculiar features in the life of the farmers and pastoral people of the Almora Hills?

আলমোড়া কোথায়? আলমোড়া পাহাড়ের কৃষক ও পশুপালকদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা কর।

2. Describe the seasonal migration of the Almora people with their cattle and their temporary shelters and permanent villages.

আলমোড়াবাসীদের ঋতুভেদে পশুপাল লইয়া স্থানান্তরে গমন ও তাহাদের সাময়িক আবাস ও স্থায়ী গ্রামগুলি বর্ণনা কর।

3. Describe fairs and market scenes of the Almora hill-tribes.

আলমোড়ার পার্বত্য অধিবাসীদের মেলা ও বাজারের দৃশ্য বর্ণনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

1. What changes were marked in the life of man with the coming of agriculture ?

কৃষিপদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন দেখা দেয় ?

2. What are the different types of cultivation and crops in the south and north of Bengal ?

বাংলাদেশের দক্ষিণে ও উত্তরে কৃষিপদ্ধতি ও শস্যের কিরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় ?

3. Describe the cultivation of rice and jute in the south of Bengal and plantation and forestry in the north.

বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশের ধান ও পাট চাষ এবং উত্তরভাগের চা বাগান ও বনজ সম্পদ বর্ণনা কর।

4. Give a brief description of scenes and life in a tea garden.

চা বাগানের দৃশ্য ও জীবন বর্ণনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1. 'The present civilisation is an industrial civilisation'. Discuss the truth of this statement.

'বর্তমান সভ্যতা শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতা।' এই উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর।

2. Describe coal-mining in Asansol area.

আসানসোল অঞ্চলের কয়লা খনির বর্ণনা কর।

3. Describe scenes in the iron-works in Burnpur.

বার্ণপুরের লৌহ কারখানার দৃশ্য বর্ণনা কর।

4. Contrast between an old town like Howrah and a new town like Chittaranjan.

হাওড়ার মত একটি পুরাতন শহর ও চিত্তরঞ্জনের মত একটি নূতন শহরের তুলনামূলক আলোচনা কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

1. What do you understand by village and town life in our country ?

আমাদের দেশে গ্রাম্যজীবন ও শহর-জীবন বলিতে কি বুঝ ?

2. Describe scattered villages of Lower Bengal and compact villages of the Uttar Pradesh.

নিম্নবঙ্গের ছড়ানো গ্রাম ও উত্তর প্রদেশের সংঘবদ্ধ গ্রামের বর্ণনা কর।

3. How do villages grow larger and fuse into towns ?

গ্রামগুলি কিভাবে বর্ধিত হইয়া শহরে পরিণত হয় ?

4. Give the story of the growth of Calcutta from three small villages.

তিনটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে কলিকাতা নগরীর উৎপত্তির কাহিনী বর্ণনা কর।

5. Give a description of fairs in the countryside.

গ্রাম্য অঞ্চলের মেলার বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. Give a general description of the life led by the people of the following foreign regional communities :—

(a) A collective rein-deer farm in North Siberia ; (b) American

Prairies ; (c) A Malayan Community ; (d) A Mining Community in Western Australia.

নিম্নলিখিত বৈদেশিক অঞ্চলের জনসমষ্টির জীবনযাত্রার একটি সাধারণ বিবরণ দাও ঃ (ক) উত্তর সাইবেরিয়ার জনসমষ্টি ; (খ) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরি অঞ্চলের জনসমষ্টি ; (গ) মালয়ের জনসমষ্টি ; (ঘ) পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার জনসমষ্টি ।

2. Write notes on :—

(a) St. Lawrence ; (b) D. V. C. (c) Chittaranjan ; (d) Zuyder Zee ; (e) Rhineland.

টীকা লিখ ঃ—(ক) সেণ্ট লরেন্স ; (খ) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা ; (গ) চিত্তরঞ্জন ; (ঘ) সুইডার সী ; (ঙ) রাইন অঞ্চল ।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা ॥
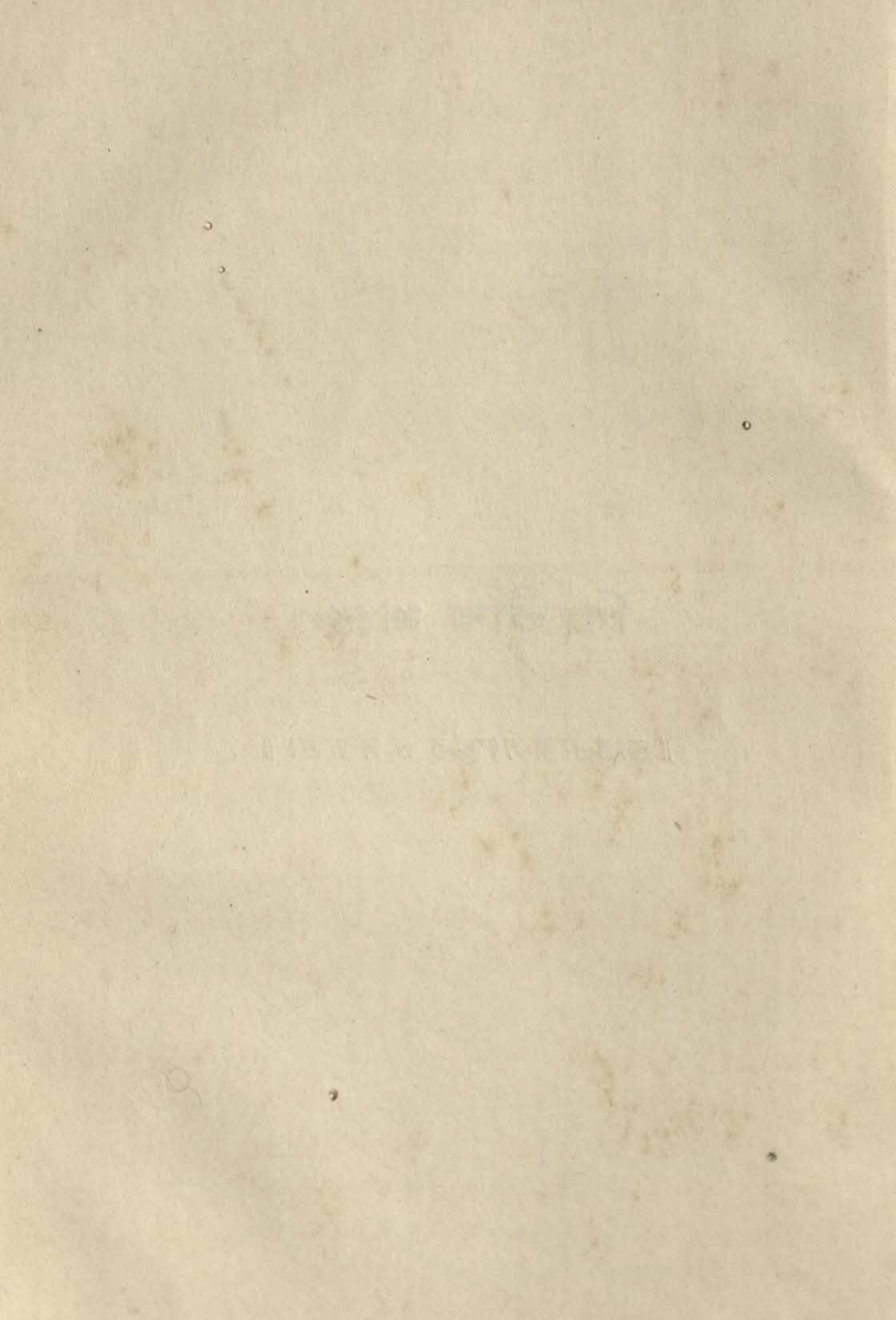
প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি—বহির্জগতের সহিত সংস্পর্শ ও সম্পর্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তাহার প্রভাব

ইতিহাস : ইতিহাসের সহিত সমাজবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইতিহাস কেবল যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী বা রাজবংশের কাহিনী কিম্বা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী নহে। ইতিহাসের সংজ্ঞা খুবই ব্যাপক। কৌটিল্যের মতে—পুরাণ ইতিহাস, আবার ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রও ইতিহাস। সকল বিদ্যার সারকথা ইতিহাসে থাকিবে। ইতিহাসে ধর্মের কথা, অর্থনীতির কথা, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির কথাও থাকিবে। এই সব মিলাইয়া ইতিহাস। সমাজবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় মানুষের জীবন ও সমাজ ; আবার ইতিহাসেরও আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ মানুষ ও তাহার সমাজ। সুতরাং ইতিহাসের সহিত সমাজবিদ্যার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। ইতিহাসের জ্ঞান ভিন্ন সমাজবিদ্যার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ ধীরে ধীরে কেমন করিয়া আগাইয়া আসিয়া সভ্যতার স্তরে আসিয়া পৌছাইল, এবং সভ্য মানুষ কেমন করিয়া ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া সভ্যতার বর্তমান স্তরে আসিয়া পৌছাইল তাহার বিবরণ লইয়াই মানুষের ইতিহাস। এই সভ্যতার ধারা সকল জাতির মধ্যে একভাবে বিকশিত হয় নাই এবং সকল মানবগোষ্ঠী সমান গতিতে সভ্যতার পথে আগাইতে পারে নাই। এমন কি বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠীর সভ্যতার প্রকৃতিও একরূপ নহে। বিভিন্ন পরিবেশ বিভিন্ন ধরণের ইতিহাস গড়িয়া তোলে ; আবার মানুষের প্রতিভা বা শক্তি অনুসারে তাহার ইতিহাসের বৈচিত্র্য সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং সেই দেশের জনসমষ্টির প্রতিভা সেই দেশের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত করিয়া থাকে।

পরিবেশ : ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান পরিবেশ। জনসমাজ এবং জনগোষ্ঠী

পরিবেশের আশ্রয়েই বিকাশলাভ করে। সমাজ ও সভ্যতার উত্থান-পতনও বহুলাংশে এই পরিবেশ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। দেখা যায় যে, সভ্যতার সেই আদিমযুগ হইতেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিবার উদ্দেশ্যে মানুষকে পরিবেশের পরিবর্তন করিয়া লইতে হইয়াছে। ইহা সে করিয়াছে তাহার ক্ষমতা ও বুদ্ধির বলেই। এই ভাবেই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, স্থাণুর মতন একটি বিশেষ পর্বে বা স্তরে আসিয়া তাহার অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই। সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানুষকে বিভিন্ন পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; আবার কোথাও তাহাকে সুবিধামত নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। এইভাবেই পুরাতন পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করিয়া সে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে এবং পরিবেশের এই ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়াই তাহার জীবনধারা এবং সেই সঙ্গে তাহার ইতিহাস বিরচিত হইয়াছে। এইজন্যই সমাজবিজ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, ইতিহাসের বনিয়াদ হইল মানুষ ও তাহার পরিবেশ। প্রসঙ্গতঃ জানিয়া রাখা দরকার যে, বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের পরিবেশ সেই সব দেশের ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করে। আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য :

এই বার আমরা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ও ইহার ভূ-প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিব। ইতিহাসের ধারা বুঝিবার পক্ষে ইহা অপরিহার্য। ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত একটি বৃহত্তম দেশ। আয়তন ও জনসংখ্যার বিশালতায় ইহাকে একটি উপ-মহাদেশ বলিলেও চলে। ইহা উত্তর-দক্ষিণে দুই হাজার মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় আড়াই হাজার মাইল বিস্তৃত। এই বিশাল ভূ-খণ্ডের সীমারেখার অধিকাংশই পর্বত ও সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আরব সাগর। এই সুন্দর সীমারেখা ভারতবর্ষকে রাশিয়া, বেলুচিস্থান ও ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বর্তমানে ভারত-বিভাগের ফলে ইহা অবশ্য কিছুটা ব্যাহত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক গঠন বড় বিচিত্র। ইহার আকৃতি ত্রিভুজের মত। ইহার ভূ-প্রকৃতিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) উত্তরের পার্বত্য প্রদেশ, (২) উত্তর ভারতের নদীগঠিত বিশাল সমভূমি, (৩) দক্ষিণ ভারতের মালভূমি, এবং (৪) দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্তী অপ্রশস্ত নিম্নভূমি।

হিমালয় অঞ্চল: উত্তরের পার্বত্য প্রদেশকে আমরা হিমালয় অঞ্চল বলিতে পারি। হিমালয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বত। তরাই অঞ্চল হইতে হিমালয়ের উপর পর্যন্ত ক্রম-উচ্চতা-বিশিষ্ট ভূ-খণ্ড ইহার অন্তর্গত। কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি পার্বত্য দেশগুলি এই ভূখণ্ডে অবস্থিত। প্রাকৃতিক অবস্থান হেতু এই দেশগুলির সহিত সমতলে অবস্থিত দেশগুলির যোগাযোগ খুব সহজ-সাধ্য নয়; সেইজন্য বাহিরের কোন সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক প্রভাব এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

উত্তর-ভারতের সমভূমি: পশ্চিমে পঞ্জাব হইতে পূর্বে আসামের পার্বত্য প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় ১,৭০০ মাইল দীর্ঘ ও হিমালয় হইতে দক্ষিণাপথের মালভূমি পর্যন্ত ২০০ মাইল প্রশস্ত অঞ্চলকে নদীগঠিত বিশাল সমভূমি বলা হয়। ইহার মধ্যভাগে আরাবল্লী পর্বতমালা। এই পর্বতের ভূ-ভাগ পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে ঢালু ও পূর্বদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বে ঢালু। এই অংশেই দীর্ঘতম নদীগুলি প্রবাহিত এবং তাহাদের দ্বারা বাহিত পললস্তর এই সমভূমির স্থানে স্থানে ১০০ ফিট পর্যন্ত গভীরভাবে সঞ্চিত হইয়া সমগ্র সমভূমিকে পৃথিবীর একটি উর্বরতম অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীগুলি এই সমভূমির প্রাণ। এই নদীগুলি হিমালয়ের হিমবাহপুষ্ট বলিয়া চির-স্রোতস্বিনী। সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজস্থানের জনবিরল থর মরুভূমি। এই সমভূমির পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ঘন জনবসতি অঞ্চল।

দক্ষিণ ভারতের মালভূমি: দক্ষিণ-ভারতের মালভূমি ত্রিভুজাকৃতি। এই মালভূমির উপর দিয়া নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীগুলি বর্ষাকালে জলপূর্ণ ও খরস্রোতা থাকে, কিন্তু অন্য ঋতুতে প্রায় শুকাইয়া যায়, সারা বৎসর ধরিয়া জল সরবরাহ করিতে পারে না। এখানকার জমি উত্তর-ভারতের সমভূমি অপেক্ষা অনুর্বর, এখানে লোকবসতিও বিরল।

দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্তী নিম্নভূমিঃ দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পূর্বে ও পশ্চিমে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট নামে দুইটি পর্বত অবস্থিত। পশ্চিমঘাট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ নিম্নভূমি এবং পূর্বঘাট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত আর একটি বিস্তৃত নিম্নভূমি রহিয়াছে। পশ্চিমভাগে মালাবার উপকূল ও পূর্বভাগে করমণ্ডল উপকূল। এই দুই উপকূলভাগের অধিবাসীরা সমুদ্রপথে নানা দেশের সহিত বাণিজ্য করিত।

প্রকৃতির প্রভাবঃ

প্রকৃতি-দত্ত সম্পদ ও তাহার লোভে বৈদেশিক আক্রমণঃ ভারতের ভূ-প্রকৃতি দেশের ইতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জমির উর্বরতা এবং খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্যের ফলে মানুষকে দিনরাত পরিশ্রম করিতে হয় না; সুতরাং নানা বিষয়ে উচ্চ চিন্তা করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসিগণ জ্ঞানচর্চা ও শিল্পসাধনার জন্য প্রচুর সুযোগ ও সময় পাইয়াছে। এজন্য প্রাচীনকাল হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে ভারত সমুজ্জল হইয়াছিল। প্রকৃতির দানে ভারত চিরকালই সম্পদশালী। ভারতের অপরিমিত ধনসম্পদই বিদেশের বহু জাতিকে বহুবার ভারত-আক্রমণে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

স্থায়ী ঐক্যের অভাবঃ ভারতের মধ্যে অনেক নদ-নদী, পর্বত ও বন থাকায় দেশটি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। এই সব বিচ্ছিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে কোন কালেই স্থায়ী ঐক্য সৃষ্টি হইতে পারে নাই। এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সহিত আত্মকলহে লিপ্ত থাকিত, সম্মিলিতভাবে বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হইত না। ইহার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারাইয়া বহুবার বৈদেশিক শত্রুর পদানত হইয়াছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যঃ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ফলে ভারতবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। ভারতবর্ষের কোন স্থান উর্বর ও সমতল, কোন স্থান উসর ও মরুময়; আবার কোন স্থান পর্বতসঙ্কুল ও অরণ্যপূর্ণ। পার্বত্য প্রদেশের এবং মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা উর্বর সমভূমির অধিবাসীদের মত সহজে জীবিকা অর্জন করিতে পারে না। তাহাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়।

এইজন্য তাহারা কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমশীল ও সাহসী। পর্বতসঙ্কুল মহারাষ্ট্র দেশের ও মরুপ্রধান রাজপুতানার অধিবাসীরা খুব বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়া ভারত-ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছে।

বিদেশে বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিস্তার : সুপ্রাচীনকাল হইতেই দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরে বহু বন্দর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সব বন্দর বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় বন্দর হইতে বহির্গামী জাহাজসমূহ শুধু ভারতীয় পণ্যই বহন করিত না, উহারা ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প ও সভ্যতারও বাহক ছিল। ভারতীয়গণ এ সব দেশে ও দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও তাহার ফল : ভারতবর্ষে রাজপুত, মারাঠা ও শিখের ন্যায় শক্তিশালী, কর্মঠ ও তেজস্বী বীর থাকা সত্ত্বেও এই দেশ বহিরাগত আক্রমণকারীদ্বারা কেন বার বার পর্যুদস্ত হইয়াছিল? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ভারতের জল-বায়ু নহে, ইহার প্রকৃত কারণ বহির্জগৎ সম্বন্ধে ভারতবাসীর অজ্ঞতা। ভারতের বাহিরে পশ্চিম-এশিয়ায় বা মধ্য-এশিয়ায় কি নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল বা কি কি নূতন রণকৌশল বা সামরিক অস্ত্র আবিষ্কার হইল, ইহার কোন খবরই ভারতীয়গণ রাখিত না।

বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য : ভারতবর্ষে নানা ধর্মের বহু বিভিন্ন জাতি বাস করে, তাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্নরূপ জীবন যাপন করে। তাহাদের মধ্যে সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার ও ভাষাগত পার্থক্যের অন্ত নাই। কিন্তু এইরূপ বিবিধ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও নানা দিক দিয়া ভারতীয় সভ্যতার মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুধর্মই ভারতের এই সংস্কৃতিগত ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুধর্মের ন্যায় সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সভ্যতার মূলগত ঐক্যসাধনে সহায়তা করিয়াছিল। আর্য-সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও ভারতের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে এবং এখনও সমগ্র ভারতে সংস্কৃত ভাষার সমাদর দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যও ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যভাব গঠনে সহায়তা করিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে পরে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাভারতের যুগ হইতেই এই রাজনৈতিক

ঐক্যের সূচনা। তারপর ঐতিহাসিক যুগে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পৌত্র অশোকের সময়ে এবং পরবর্তী কালে মুঘল আমলেও সার্বভৌম সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। আধুনিক যুগে ইংরেজগণও ভারতবর্ষে এক সুসংবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। চতুর্থতঃ, অতীতে ধর্মসংক্রান্ত ও রাজনৈতিক ঐক্য উপলব্ধি করিয়া ভারতবাসিগণ ক্রমশঃ অনুভব করিয়াছিল যে, ভারতের মহাদেশসুলভ বিশালতা ও বৈচিত্র্যের পশ্চাতে একটা মূলগত ঐক্য নিহিত রহিয়াছে। সমগ্র ভারতভূমি একটি ভৌগোলিক দেশ, ইহার বিভিন্ন প্রদেশগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ও একতাবদ্ধ, এই ধারণা সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে দেশবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র দেশ 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা 'ভারতবাসী' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

অনুশীলনী

1. Discuss the influence of the physical features of India on the character and culture of the people.

ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দেশের লোকের চরিত্রের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ?

2. Discuss the influence of the physical geography on the history of India.

ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোল দেশের ইতিহাসের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আলোচনা কর।

3. 'India possesses unity in diversity,'—Discuss.

'ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিরাজিত।'—আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারত-ইতিহাসের উপাদান

বিভিন্ন যুগের উপাদান বিভিন্ন রূপ ঃ ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন দেশ। অতি প্রাচীনকালে ইহার ইতিহাস আরম্ভ হইয়া আমাদের সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সুদূর অতীতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় কি ? তখন যদি কেহ উহা লিখিয়া রাখিত তাহা হইলে তাহা পড়িয়া তখনকার সব কথা জানিতে পারিতাম। কিন্তু এমন সময় ছিল যখন কেহ লেখাপড়া জানিত না ; সেই সময়ের ইতিহাস জানিবার উপায় কি ? তাহারও উপায় আছে। বিভিন্ন যুগের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য বিভিন্ন ধরণের উপাদান পাওয়া যায়। সেই সকল উপাদানের প্রকৃতিও বিভিন্নরূপ। প্রাচীন যুগের উপাদানগুলির সন-তারিখ ও রাজনৈতিক মূল্য অনিশ্চিত ; আন্দাজ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উহা স্থির করিতে হয়। প্রাচীন যুগ হইতে যতই বর্তমানের দিকে আগাইয়া আসি ততই সন-তারিখ ও রাজনৈতিক ইতিহাস নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হয়।

তিন যুগ ঃ ভারতের ইতিহাস প্রধানতঃ তিন যুগে বিভক্ত, যথা—(১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্যযুগ ও (৩) বর্তমান যুগ। এই তিন যুগের ইতিহাসের উপাদান বিভিন্নরূপ ; সুতরাং বিভিন্ন যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হইতেছে।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনার উপাদান

ভারত ইতিহাসের উপাদান
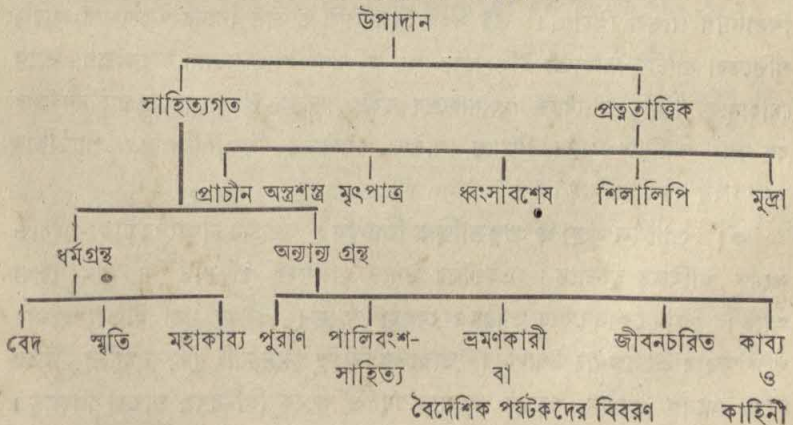
১। **প্রাচীন সাহিত্য ঃ** বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু কথা আমরা জানিতে পারি। তাহা ছাড়া সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় রচিত হিন্দুযুগের কয়েকখানি ইতিহাসও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবি বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষচরিতে মহারাজ হর্ষবর্ধনের সময়ের কথা জানা যায়। বাক্‌পতিরাজের গউড়বহোকাব্যে যশোবর্মনের গৌড়বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। কবি বিহ্লন-প্রণীত বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের ইতিহাস পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী-রচিত রামচরিতে পালবংশীয় রাজা রামপালের কথা জানা যায়। কবি কহ্লন-প্রণীত রাজ-তরঙ্গিনী সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ; ইহাতে কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

২। **শিলালিপি ও তাম্রশাসন ঃ** পাথরের দেওয়ালে, থামে, পর্বতগাত্রে বা মন্দিরগাত্রে প্রাচীনকালের লেখা অনেক লিপি পাওয়া গিয়াছে, এই গুলিকে বলে শিলালিপি বা শিলালেখ। তামার ফলকে লেখা লিপিকে বলে তাম্রশাসন। তাম্রশাসনে সাধারণতঃ জমিবিক্রয় বা দানের কথা লেখা থাকে। শিলালিপি ও তাম্রশাসন ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। মৌর্যসম্রাট অশোক পাহাড়ের গায়ে ও পাথরের থামে তাঁহার বাণী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এলাহাবাদের একটি থামে তাঁহার বিজয়কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আরো অনেক রাজার এইরূপ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক তথ্য পাইয়াছেন। সেইরূপ ভাবে মোহান্‌জোদারোয় আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে ভারত-ইতিহাসের সুপ্রাচীনকালের বহু তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে, যদিও এইস্থানের শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

৩। **প্রাচীন মুদ্রা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঃ** প্রাচীন রাজাদের টাকা-পয়সাও অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির উপরে রাজাদের প্রতিকৃতি ও নাম লেখা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারিখও দেওয়া আছে। এইসব মুদ্রা ইতিহাসরচনার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। ভারতের বিভিন্ন স্থানে মাটি খুঁড়িয়া মাটির ভিতর হইতে অনেক প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ ও অনেক জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল নিদর্শন দেখিয়া পণ্ডিতেরা তাহাদের একটা আনুমানিক তারিখ স্থির করিয়াছেন এবং সেই সময়ের সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ইতিহাসও গড়িয়া তুলিয়াছেন।

৪। **অন্যান্য উপাদানঃ** প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখিয়া সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা জানিতে পারা যায়। বিশেষ বিশেষ যুগে নির্মিত স্মৃতিসৌধগুলি হইতেও ইতিহাসের বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোগল-যুগের স্থাপত্যকলার নিদর্শন হইতে সেই যুগের ইতিহাসের বিশেষ ধারাটি বুঝিতে পারা যায়। তারপর প্রাচীনকালে বহু বৈদেশিক ভ্রমণকারী বা পর্যটক ভারতে আসিয়া এদেশ সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। দিগ্‌বিজয়ী বীর আলেকজান্দারের বহু অনুচর ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে ভারতবর্ষে বাস করিয়া এদেশ সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে মৌর্যযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। চীনদেশীয় পর্যটক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ পাই। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক হিউয়ান সাঙ্‌ খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়া এখানে কয়েক বৎসর বাস করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু কথা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সে যুগের ইতিহাস-রচনার পক্ষে অতি মূল্যবান উপাদান। হিন্দুযুগের শেষভাগে অলবিরুণী নামে এক মুসলমান পণ্ডিত ভারতে আসেন এবং এদেশের তৎকালীন সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই-সকল বৈদেশিক বিবরণ ইতিহাস রচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান উপাদান।

৫। **মুসলমান যুগের বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণঃ** সেই রকম ইবন্ বতুতার বিবরণ হইতে সুলতানী আমলের ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। স্যার টমাস রো, তাভার্ণিয়ে, বার্ণিয়ে প্রভৃতি একাধিক য়ুরোপীয় ভ্রমণকারিগণ মোগলযুগে দেশের অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজদরবারের সমারোহের কথা বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।

৬। **মুসলমান যুগের ঐতিহাসিক রচনাঃ** মুসলমান যুগে বহু ঐতিহাসিক বিভিন্ন সুলতান ও বাদশাহের রাজত্ব-বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মিনহাজ-উস-সিরাজের

'তবকৎ-ই-নাসিরা', জিয়াউদ্দিন বরণীর 'তওয়ারিখ-ই-ফিরূজশাহী', বাবরের 'জীবনস্মৃতি', গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা', জাহাঙ্গীরের 'জীবনস্মৃতি', আবুলফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মুসলমান যুগের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।

৭। **বৃটিশ যুগের সরকারী কাগজপত্র, বৈদেশিক পর্য্যটকদের বিবরণ, এবং ভারতীয় ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের রচনা** হইতে বৃটিশ ও বর্ত্তমানযুগের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

1. What are the sources of Indian History ?
   ভারত-ইতিহাসের উপাদান কি কি ?
2. What are the sources of Ancient Indian History ?
   প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান কি কি ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা

ভূমিকা :

মানুষের জীবনযাত্রা ও কার্যাবলীর ধারাবাহিক বিবরণই তাহার ইতিহাস। সুতরাং মানুষ যাহা সাধন করিয়াছে তাহার যদি কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় তবেই তাহার ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। সেইজন্য অতি সুদূর প্রাচীনকালে কিরূপ মানুষ ভারতবর্ষে বাস করিত তাহা জানিবার কোন উপায় নাই ; কারণ সেই সব মানুষ তাহাদের কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। কোন দেশের ইতিহাস লিখিবার জন্য যখন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তখন হইতেই বাস্তবিক পক্ষে সেই দেশের ইতিহাস আরম্ভ হয়। তাহার আগেকার কালকে বলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। প্রাচীন যুগের মানুষেরা যেসব অস্ত্র-শস্ত্র ও জিনিসপত্র দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করিত তাহার মধ্যে অনেকগুলি ছিল পাথর ও ধাতুনির্মিত। এইসব জিনিস মাটি চাপা পড়িয়া লুক্কায়িত আছে। প্রাচীন যুগের অনেক শহর-নগর ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হইয়া মাটির তলে প্রোথিত ছিল। এখন মাটি খুঁড়িয়া সেইসব ধ্বংসাবশেষ বাহির করা হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এই খনন কার্য পরিচালিত করিয়া থাকে। ভূগর্ভস্থ প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ হইতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ। মানুষের সমাজ ও ইতিহাসের আলোচনায় এই প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইয়াছে। রাজশাহী জেলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) পাহাড়পুরে একটি বিরাট বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ বাহির হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্কার হইল সিন্ধু প্রদেশে (ইহাও বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) মোহানজোদারো ও পাঞ্জাব প্রদেশে হরপ্পা নামক দুইটি স্থানে দুইটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহানজোদারোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়া ভারত-ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করেন।

ঐতিহাসিক যুগের পূর্বে অতি সুদূর প্রাচীনকালে ভারতের অধিবাসীরা যেসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত তাহার অনেকগুলি নদীগর্ভে ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাহারা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত বলিয়া তাহাদিগকে প্রস্তরযুগের লোক বলা হয়। পুরাতন প্রস্তরযুগের লোকেরা পাথরের টুকরা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। তাহারা এক রকমের প্রস্তরখণ্ড দিয়াই নানা কাজ সারিয়া লইত। পাথর কুঁদিয়া বিভিন্ন কাজের উপযোগী রকমারী অস্ত্র তৈয়ারি করিতে জানিত না। তাহারা বন-জঙ্গলে, গাছের কোটরে ও পর্বতগুহায় বাস করিত। তাহারা চাষ-আবাদ করিত না, আগুন জ্বালিতে পারিত না ; বন্যপশু শিকার করিয়া কাঁচা মাংস খাইত আর বনের ফল-মূল খাইত। তাহারা দেখিতে আফ্রিকার নিগ্রোদের মত কাল, খর্বাকৃতি ও কুৎসিত ছিল। আজকাল নীলগিরি পর্বতে যে টোডা জাতি বাস করে এবং সিংহলে যে ভেদ্দা জাতি আছে, তাহারাই পুরাতন প্রস্তরযুগের অধিবাসীদের বংশধর বলিয়া মনে হয়।

পুরাতন প্রস্তরযুগের বহুকাল পরে আসিল নূতন প্রস্তরযুগ। নূতন প্রস্তরযুগের লোকেরা প্রস্তরখণ্ডের পরিবর্তে পাথর কুঁদিয়া বিভিন্ন আকারের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারি করিত। তাহারা চাষ-আবাদ ও পশুপালন করিত, মাটির পাত্র গড়িয়া তাহার গায়ে নানা কারুকার্য করিত। তাহারা আগুনের ব্যবহার জানিত ও রান্না করিয়া খাইত। সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলে কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল আদিম জাতি বাস করে, তাহারাই নূতন প্রস্তরযুগের অধিবাসীদের বংশধর।

সিন্ধু-সভ্যতা :

প্রস্তরযুগের পরে পাথর ও তামার জিনিস ব্যবহৃত হইত। লৌহযুগের পূর্বতন এই কালকে প্রস্তর-তাম্রযুগ বলা হইয়া থাকে। সিন্ধু প্রদেশে মোহানজোদারো ও পাঞ্জাব প্রদেশে হরপ্পা নামক স্থানে মাটির ভিতর হইতে প্রস্তর-তাম্রযুগের প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ বাহির করা হইয়াছে। সেখানে যে সকল জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে লোহার কোন দ্রব্য নাই, কিন্তু পাথর, ব্রোঞ্জ ও তামার জিনিস প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল শীলমোহরে ষাঁড়, মহিষ, হাতী, বাঘ, বানর, কুকুর, শশক প্রভৃতি জীবজন্তুর ছবি এবং এক প্রকার চিত্রলেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রাচীনকালে এইরূপ চিত্রদ্বারা লিখিবার

প্রথা অনেক দেশে প্রচলিত ছিল। মোহানজোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত শীলমোহরের লিপিগুলির এখনও পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং উহা হইতে সেই যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই।

মোহানজোদারোয় প্রাপ্ত শীলমোহর

কিন্তু প্রাচীন নগরের যে ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে তাহা হইতে আমরা সেকালের লোকের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি। নগরের
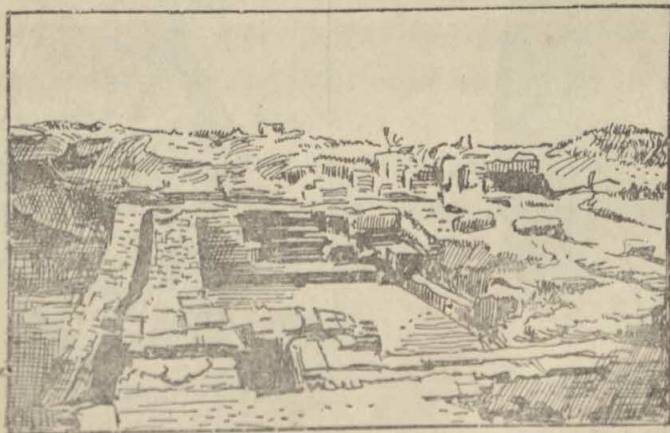
মোহানজোদারোয় প্রাপ্ত স্নানাগার

রাস্তাগুলি সোজা ও চওড়া ছিল এবং ইহাদের দুই পাশে পোড়ান ইটের ভাল ভাল বাড়ি ছিল। বাড়িতে খোলা উঠান, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল-নিকাশের খুব সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক বাড়ি হইতে নল বা নালা দিয়া জল বাহির হইয়া গিয়া রাস্তার বড় নর্দমায় পড়িত। বাড়ির জঞ্জাল ও ময়লা ফেলিবার জন্য রাস্তায় বড় বড় পাত্র থাকিত। কয়েকটি বড় বড় ঘরও বাহির হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি ছিল সাধারণ স্নানাগার এবং আর একটি বোধ হয় ছিল সভাগৃহ। ঘরগুলির দেওয়ালে কোনো চিত্রাদি আঁকা নাই।

পণ্ডিতদের অনুমান এই যে, মোহানজোদারোতে একটি কৃষিপ্রধান সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। এইখানকার লোকেরা চাষ-আবাদ করিয়া খাইত, এবং সমতলভূমিতে

মাটির পাত্র

মোহানজোদারোয় প্রাপ্ত মূর্তি

ভালভাবে চাষ করিত। যব, গম ও তূলার চাষ হইত। এখানে বহু সূতাকাটার টাকু আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহা হইতে জানা যায় যে, লোকে সূতা কাটিতে ও কাপড়

বুনিতে জানিত। সূতার কাপড়েরও এক টুকরা পাওয়া গিয়াছে। লোকে সাধারণতঃ কার্পাস বস্ত্র এবং শীতের জন্য পশমী কাপড় ব্যবহার করিত। অধিবাসীরা সোনা, রূপা, সীসা, তামা ও টিন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত। তামার বাসন ও অস্ত্রশস্ত্র এবং সোনারূপার অলঙ্কারও পাওয়া গিয়াছে।

কৃষিপ্রধান সভ্যতা হইলেও মোহানজোদারোতে শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। চেয়ার, কাছিমের খোলার চামচ ও রূপার পানপাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মোহানজোদারোতে মৃৎশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। নিকটে নদীতীরে ভাল মাটি পাওয়া যাইত। এই মাটি কুমারের চাকায় দ্রুত ঘুরাইয়া নানারকম পাত্র গড়া হইত এবং পাত্রগুলিকে গোল উনানে পোড়ান হইত। তারপর উহা পালিশ করা হইত। ইটের ভাঁটায় ইট পোড়ান হইত।

মোহানজোদারোতে কোন মন্দিরের চিহ্ন নাই, কিন্তু অনেক দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মাতৃমূর্তি। অনুমান হয়, এখানে মাতৃপূজাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ছিল। তিনটি মাথা-যুক্ত এক দেবমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এটি শিবমূর্তি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ছাড়া বৃক্ষ ও জীবজন্তুর পূজাও প্রচলিত ছিল।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সহিত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার বহু অংশে মিল রহিয়াছে। এই দুইটি সভ্যতা প্রায় সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের। প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতার সহিত এই সিন্ধুসভ্যতার অনেক মিল দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন, দ্রাবিড় জাতি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল হইতে উত্তর-পশ্চিমের গিরিদ্বার দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে ইহারা বেশ সভ্য ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। দ্রাবিড় জাতি এককালে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়াইয়া ছিল। বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতে সেই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির বংশধরেরা বাস করে।

অনুশীলনী

1. What is Indus Valley civilisation? Give its brief account.
   সিন্ধুসভ্যতা কি? উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্য-সভ্যতা—বৈদিক যুগ

আর্যজাতিঃ দ্রাবিড়জাতির পরে আর এক প্রাচীন জাতি আফগানিস্থান ও খাইবার গিরিদ্বার দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই সুশ্রী ও গৌরবর্ণ জাতি বেশ সভ্য ও শিক্ষিত ছিল। ঋগ্বেদ নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ইহারা নিজদিগকে বলিত আর্য, এবং ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী ও দ্রাবিড় জাতিকে দাস, দস্যু বা অনার্য নামে অভিহিত করিত। আর্যগণের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল এবং কখন ইহারা ভারতবর্ষে আসিল এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে কিছু লেখা নাই। ঐতিহাসিকদের অনুমান, ইহারা প্রথমে মধ্য-এশিয়ায় বাস করিত এবং কালক্রমে ইহারা আদি বাসভূমি ত্যাগ করিয়া য়ুরোপ ও এশিয়ার অনেকস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। আর্যদিগের একটি শাখা পারস্য ও ভারতবর্ষের দিকে চলিয়া আসে। এই শাখা আবার পরে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ পারস্যে ও অন্যভাগ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।

ভারতে বসতিস্থাপন ও অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহার উপর দিয়া সাতটি নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া উহা সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত। কাবুল নদী হইতে সরস্বতী নদী পর্যন্ত এই ভূভাগ বিস্তৃত ছিল। সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আর্যগণ ছোট ছোট উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এই সকল উপজাতি গন্ধারি, যদু, পুরু, ভরত ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। আদিম অধিবাসী ও দ্রাবিড়দিগকে যুদ্ধে হারাইয়া আর্যগণ ক্রমে ক্রমে দেশ দখল করিতে লাগিল। অনার্যগণ যুদ্ধে হারিয়া বনজঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় লইল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করিল।

বৈদিক সাহিত্য ঃ ভারতীয় আর্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের নাম বেদ। বেদ চারিটি, যথা—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাতে এক হাজারের বেশি স্তোত্র আছে। স্তোত্রগুলির অধিকাংশই কোন দেবদেবীর স্তুতিগান। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি দেখিয়া আর্যগণ বিস্ময়ে অবাক হইত এবং এই শক্তিগুলিকে এক-একটি দেবতা বলিয়া কল্পনা করিত।

দেবতাদের গুন-গান করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা হইত। এই সকল স্তুতিগানে আর্যদের কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পণ্ডিতদের মতে বেদ মানুষের রচিত নহে, ঈশ্বরের বাণী। ঋষিরা ধ্যানযোগে এই বাণী শুনিতেন বলিয়া বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। সমগ্র বেদ এককালে রচিত হয় নাই, বহুকাল ধরিয়া রচিত হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ নানা বিষয়ে যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছিল এবং যে সকল বিদ্যা লাভ করিয়াছিল, তাঁহার সম্যক ও বিস্তারিত বিবরণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, বৈদিক সাহিত্য বিবিধ ও বিভিন্ন প্রকার। ভাষা, কাল ও বিষয় ভেদে বৈদিক সাহিত্য সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

বেদের সংহিতা-ভাগ মুখ্যতঃ পদ্যে লিখিত। দেবতাদের স্তুতি বা মন্ত্র লইয়াই সংহিতা গঠিত। কালক্রমে বৈদিক মন্ত্রগুলি চারিটি সংহিতায় ভাগ করা হইয়াছিল; সুতরাং সংহিতা চারখানি—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। আর্য ঋষিগণ দেবতাদের স্তুতিগান করিতেন; এই স্তুতিগুলি লইয়াই ঋগ্বেদ। আর্য ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেন; কেমন করিয়া যজ্ঞ করিতে হয় সেই সব পদ্ধতি ও মন্ত্রগুলি লইয়াই যজুর্বেদ। ঋগ্বেদের যে স্তুতিগুলি যজ্ঞের সময় গান করা হইত সেইগুলি লইয়াই সামবেদ; আর অথর্ববেদে প্রধানতঃ রোগ, দানব ও হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা পাইবার অনেক মন্ত্রতন্ত্র লিখিত আছে।

চারিটি বেদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক 'ব্রাহ্মণ' আছে। ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ বৈদিক মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা। ইহা গদ্যে লিখিত। ইহাতে প্রত্যেক যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহার গুণাবলী, উৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ভাগ আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ। বৃদ্ধ বয়সে যাঁহারা অরণ্যে বাস করিতেন এবং যজ্ঞ-সম্পাদনের সুযোগ পাইতেন না, তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল। আরণ্যকে আনুষ্ঠানিক ধর্মের পরিবর্তে দার্শনিক চিন্তার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। আরণ্যকের যুগে লোকে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবিধ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর এই স্বাধীন চিন্তার

ফলেই আরণ্যকের সারভাগ লইয়া উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। উপনিষদে 'আত্মন্' ও 'ব্রাহ্মণ' সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উপনিষদ্ বেদের অন্ত (বেদান্ত), অর্থাৎ এইখানে আসিয়া বৈদিক সাহিত্য শেষ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে যজ্ঞসমূহের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি কালক্রমে সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। এই বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মগুলি অতি অল্প কথায় কয়েকটি মাত্র শব্দ বা অক্ষরের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত সূত্ররূপে রচনা করার প্রয়োজন হইল। এইরূপ সূত্রের আকারে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইল সেগুলি সাধারণতঃ সূত্র-সাহিত্য নামে খ্যাত। ছয়খানি বেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শন সূত্র-সাহিত্যের অন্তর্গত।

আর্যদের ধর্ম ঃ

বেদ হইতে আর্যদের ধর্ম ও দেবতার কথা জানা যায়। আর্যগণ সূর্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত। দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্দ্র আর বরুণ। ইন্দ্র ছিলেন বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা; বরুণ ছিলেন আকাশ ও সমুদ্রের দেবতা। কালক্রমে বরুণের প্রাধান্য কমিয়া গেল এবং ইন্দ্রই প্রধান হইলেন। দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বরলাভ করিবার জন্য আর্যগণ দেবতাদের স্তুতিগান করিত এবং তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিত। বেদির উপর আগুন জালিয়া ঘৃত, দুগ্ধ, সোমলতার রস ও পিষ্টক প্রভৃতি ঢালিয়া দেওয়া হইত। ইহাকেই বলিত যজ্ঞ। যজ্ঞের সময় আর্যগণ পশু বলি দিত এবং সোমলতার রস পান করিত। সোমরসে মাদকতা ছিল বলিয়াই উহার খুব আদর ছিল। আর্যগণ মনে করিত যে, সোমরস পান করিলে মানুষ অমর হয় ও দেবতাদের মত শক্তি লাভ করে।

শহর বলিতে যাহা বুঝায় বৈদিক যুগে সেরূপ কিছুই ছিল না। আর্যগণ গ্রামে বাস করিত। শত্রু, বন্যজন্তু এবং বন্যা হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য গ্রামের চারিধারে মাটির উঁচু বাঁধ দেওয়া থাকিত। সেকালে টাকা-পয়সার চলন ছিল না। গরু দিয়া সব জিনিসের দাম ঠিক করা হইত। গরুই ছিল আর্যদের প্রধান সম্পত্তি। আর্যগণ চাষ-আবাদ করিত, আর গরু, ঘোড়া, মেষ, ছাগল প্রভৃতি পশু-পালনে বেশী যত্ন লইত। তাহারা শিকার করিতে খুব ভালবাসিত, এবং মাংস, যবের পিষ্টক, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত নানাবিধ সামগ্রী, শাকসব্জী ও ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিত।

আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করে, তখন তাহারা স্ত্রী-পুত্র ও পশুপাল

সঙ্গে লইয়া বসবাস করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহাদের এক-এক পরিবার একসঙ্গে বাস করিত এবং পরিবারস্থ সকলেই গৃহপতির শাসন মানিয়া চলিত। কয়েকটি পরিবার একত্র হইয়া একটি দল গঠন করিত। এইরূপ কতকগুলি দল মিলিয়া একটি উপজাতি গঠন করিত। এক-এক উপজাতি এক-একটি অঞ্চল দখল করিয়া এক-একটি রাজ্য স্থাপন করিত। প্রত্যেক রাজ্যের একজন রাজা থাকিতেন। রাজা যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির কাজ করিতেন। যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। তলোয়ার, বর্শা এবং কুঠারও অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। রাজা সাধারণতঃ জনসাধারণের মতামত লইয়া শাসন করিতেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক লইয়া একটি সভা এবং প্রজাসাধারণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইত। রাজা এই সভা ও সমিতির পরামর্শমত কাজ করিতেন। রাজপুরোহিতদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। পুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিতেন এবং যুদ্ধে জয় হইলে রাজার জয়গান করিতেন।

সামাজিক জীবন:

সমাজে স্ত্রীলোকদের বিশেষ সম্মান ছিল। তাঁহারা অনেক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না করিয়া লেখাপড়া শিখিতেন এবং কেহ কেহ বেদের মন্ত্র পর্যন্ত রচনা করিতেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা প্রভৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মেয়েরা যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতেন।

গ্রামগুলি প্রায় স্বাধীন ছিল। রাজাকে কর দিতে হইত, গ্রামের শাসনব্যবস্থা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা গ্রামের পাঁচজন প্রধান লোকে চালাইত। বণিক ও শিল্পীদের সংঘ ছিল। রাজা এই সব সংঘের সমাদর করিতেন ও তাহাদের মতামত লইয়া চলিতেন।

ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেকালে এখনকার মত জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। আর্যগণ ছিল গৌরবর্ণ। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এইরূপে বিজেতা আর্য ও বিজিত অনার্য এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। এইরূপ বর্ণভেদ ছাড়া আর কোনরূপ জাতিভেদ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ক্রমে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি ও কর্ম অনুসারে চারি জাতির সৃষ্টি হইল। যাঁহারা শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী ও যাগযজ্ঞে দক্ষ হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিলেন এবং দেশশাসনে দক্ষতার পরিচয় দিলেন, তাঁহারা হইলেন ক্ষত্রিয়। যাঁহারা

কৃষি ও ব্যবসায়-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা হইলেন বৈশ্য। আর যাহারা সমাজে এই তিন বর্ণের সেবা করিত, তাহারা হইল শূদ্র। বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা কঠোর হইয়া উঠে নাই। এক বর্ণের লোক ইচ্ছা করিলে অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল না। পরবর্তী কালে মহাকাব্যের যুগে দেখিতে পাই আর্য-সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের জীবন চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। বাল্যকালে শিক্ষার জন্য সকলকেই গুরুগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। গুরুগৃহে বাস করিয়া সকলে অধ্যয়ন করিত এবং গুরুর নানা কাজ করিয়া দিত। এই জীবনকে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বলা হইত। দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য,—শিক্ষা শেষ করিয়া শিষ্য গৃহে ফিরিতেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী বা গৃহস্থ হইতেন। তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ—সংসার-জীবন শেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে গৃহস্থ গৃহ ছাড়িয়া পত্নীর সহিত তপস্যা করিবার জন্য বনে যাইতেন। আবার কখন কখন তিনি একাই বনগমন করিতেন। চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস;—বহুদিন তপস্যা করার পর লোকে সন্ন্যাসী বা যতি হইতেন। এই সময় তিনি একাকী সন্ন্যাসীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও ঈশ্বর-চিন্তায় সময় কাটাইতেন।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতি ঃ

আর্যগণ যখন ভারতে আগমন করে, তখন এই দেশে অনার্যেরা বাস করিত। অনার্যদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আর্যগণ দেশ দখল করে। অনার্যগণের অনেকেই বন-জঙ্গলে পলায়ন করে, আবার অনেকে আর্যসমাজের নিম্নস্তরে স্থান পায়। ক্রমে ক্রমে আর্য ও অনার্যদের পরস্পরের ধর্ম ও রীতির মধ্যে অনেক সমন্বয় সাধিত হয় এবং এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। এই মিশ্র সংস্কৃতিতে কোন্ জাতির দান কি তাহা ঠিক ভাবে বলা যায় না। আদিবাসী অনার্যরা এই সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে কতটা সাহায্য করিয়াছে তাহা আমরা জানি না; তবে ঝাড়-ফুঁক, খাদ্য সম্বন্ধে বাধা-নিষেধ, যাদুতে বিশ্বাস—এ সব আদিবাসীদের নিকট হইতেই আসিয়াছে।

অনার্যদের মধ্যে নানা জাতির লোক ছিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেশ সভ্য ছিল। তাহাদের বড় বড় দুর্গ ও সুরক্ষিত নগর ছিল। তাহারা শিল্পে ও কৃষিকার্যে বেশ উন্নতি করিয়াছিল। আর্যগণ আগে সামান্য সামান্য চাষ-আবাদ

করিত, পশুপালনই ছিল তাহাদের প্রধান পেশা। এখন তাহারা স্থায়িভাবে এক-এক জায়গায় বসতি স্থাপন করিয়া অনার্যদের নিকট কৃষিকার্য, জলসেচ প্রভৃতি শিখিয়া লইল। কিভাবে ধান চাষ করিতে হয়, কিভাবে ফলের ও আখের চাষ করিতে হয় এবং কিরূপে আখ মাড়িয়া গুড় তৈরি করিতে হয়—এইসব কৃষিবিদ্যা আর্যেরা অনার্যদের নিকট হইতে শিখিয়াছিল। বেশীর ভাগ গৃহপালিত পশু কাজে লাগানো, নদীপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, বাড়ীঘর তৈয়ার করা, ইট ব্যবহার করা, মাটির পাত্রে নানারূপ ছবি আঁকা, নগর-পত্তন—এই সমস্ত জিনিস আর্যগণ অনার্যদের নিকট হইতে শিখিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ঘোড়া ও লোহার ব্যবহার, দুগ্ধ ও মাদক দ্রব্য সেবন, পাশাখেলা, রথের দৌড়, কাপড় সেলাই করিয়া পোশাক তৈয়ার করা—এইগুলি আর্যদের দান।

বৈদিক আর্যগণ কোন দেবমূর্তির পূজা করিত না, প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিত। কিন্তু অনার্যগণ দেবতার মূর্তি গড়িয়া ফুলপাতা ও নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিত। আর্যগণ যজ্ঞের বদলে ক্রমশঃ অনার্যদের পূজা-পদ্ধতি গ্রহণ করিল। মহামায়া মহাদেবীর পূজা এবং শিবপূজাও অনার্যদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। আর্যদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের অনেক বিষয় অনার্যদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর্যগণ যবের পিষ্টক, মাংস ও মাখন খাইত। তাহার পরিবর্তে ডাল-ভাত, ঘৃত-দধি প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মাছ ও তেলের ব্যবহার অনার্যদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিবাহে যে সিন্দূর, নারিকেল, পান ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহৃত হয়, সেইসব আচারও অনার্যদের নিকট হইতে আসিয়াছে। আর্য ও অনার্য পরস্পরের সহিত বোঝাপড়া করিয়া যে উদার ও বিচিত্র সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা অহিংসা, করুণা ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। একে অপরের উপর জাতিগত, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণে উদার ও মহান ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

মহাকাব্যের যুগ ঃ

বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে অনেক কাহিনী, উপাখ্যান ও বীরগণের কীর্তিগাথা বর্ণিত আছে। এইসকল উপাখ্যান ও কীর্তিগাথা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া

মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইখানি হিন্দুদের প্রধান মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্য হইতে প্রাচীন যুগের বহু কথা আমরা জানিতে পারি।

মহাকাব্যের যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। তখন আর্যাবর্তের প্রায় সর্বত্র আর্যগণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; কেবল দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি অনার্যজাতি স্বাধীনভাবে বাস করিত। ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণ যৎকিঞ্চিৎ চাষ-আবাদ করিত, পশুপালনই ছিল তাহাদের প্রধান কাজ। কিন্তু এক্ষণে পশুপালন অপেক্ষা কৃষিকার্যই আর্যদের প্রধান উপজীবিকা হইয়াছে। যব ছাড়া গম, ধান, জনার প্রভৃতি অন্যান্য শস্যের চাষও আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক যুগে নগর ছিল না, লোকে গ্রামে বাস করিত। কিন্তু মহাকাব্যের যুগে আর্য-গণ গ্রামের পরিবর্তে সুন্দর সুগঠিত নগর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক এক উপজাতি এক-একটি ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসতি ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। রাজশক্তিও ক্রমশঃ বড়িয়া চলিয়াছে। তথাপি রাজগণ শাস্ত্রানুসারেই রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। কোন কোন পরাক্রান্ত রাজা পার্শ্ববর্তী রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞ করিতেন এবং সম্রাট, একরাট বা সর্বভৌম রাজা হইতেন। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হইলেও স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারের তখন উদ্ভব হয় নাই, কারণ রাজারা প্রজার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সতত সচেতন থাকিতেন এবং প্রজানুরঞ্জনই রাজধর্ম, ইহা মনে করিয়া প্রজাহিতে রাজশক্তি নিয়োজিত করিতেন। এই যুগে বহু শক্তিশালী নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং গান্ধার, মদ্র, কুরু বিরাট, কোশল, পাঞ্চাল, চেদী, বিদেহ, মগধ, বিদর্ভ, দণ্ডক, সুরাষ্ট্র, প্রভৃতি আর্যরাজ্যের এবং কিষ্কিন্ধ্যা, জনস্থান প্রভৃতি দক্ষিণাপথস্থিত অনার্য রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

মহাকাব্যের যুগে সমাজ ছিল জাতিভেদ প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জাতি-ভেদের কঠোরতা সম্বন্ধে দুই মহাকাব্যে দুই প্রকার চিত্র দেখিতে পাই। রামায়ণে দেখা যায় যে, এক শূদ্র তপস্যা করিতেছে বলিয়া রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে তাহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। মহাভারতে কিন্তু এতটা কঠোরতা নাই। বিদুর দাসীপুত্র হইয়াও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান বন্ধু ও উপদেষ্টা। ধীবর-কন্যার গর্ভজাত বেদব্যাস প্রধান ঋষি ও তত্ত্বদর্শী; শাল্য, সুশর্মা, ভগদত্ত প্রভৃতি অনার্যরাজগণ সম্মানিত ব্যক্তি। দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থমা ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া

সর্বজনপূজ্য হইয়াছেন। সুতরাং মহাভারতে দেখা যাইতেছে যে, জাতিভেদের কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছে এবং আর্য-অনার্যসংমিশ্রণ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে।

অনুশীলনী

1. Who were the Aryans and Non-Aryans ?

আর্য ও অনার্য বলিতে কি বুঝায় ?

2. Give an account of the Vedic civilisation.

বৈদিক সভ্যতার বিবরণ দাও।

3. Give an account of the interaction of Aryan and Non-Aryan culture.

আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত বর্ণনা কর।

4. What are the social and institutional changes, represented in the Great Epics ?

মহাকাব্যের যুগে কি সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

ভূমিকা ঃ বৈদিক যুগে আর্যদের ধর্মমত বেশ সরল ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণে যজ্ঞ ও পূজাপ্রণালী ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়িল। সমাজে পুরোহিতের প্রাধান্য এবং জাতিভেদের কঠোরতা ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল। তাহা ছাড়া যজ্ঞে এত প্রাণিবধ করিয়া ধর্ম হয় কি না, সে বিষয়ে লোকের মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। সকলে বৈদিক ধর্মে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনেকেই বিদ্রোহী হইয়া সহজ সরল ধর্ম প্রচার করিতে মন দিলেন। এই সময় পূর্ব-ভারতে একদল পরিব্রাজক বা ভ্রাম্যমাণ প্রচারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কর্মফল ও সংস্কার বা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন। যে যেমন কর্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হইবে—পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে এই জন্মের ফল নির্ধারিত হইবে, ইহাকে বলে কর্মফল। আর, সংস্কার বা জন্মান্তরবাদ দ্বারা এই বুঝায় যে, জীবের কর্মফল অনুসারে জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম হয়। হিন্দুধর্মের এই নূতন মতবাদ এই নূতন পরিব্রাজকগণ মানিতেন, কিন্তু তাঁহারা বেদের বা বৈদিক পুরোহিতের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা পশুবলিকে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া মানিতেন না; এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা বলিতেন যে, কর্মফল ও জন্মান্তর হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সৎ ও ভাল কাজ করিতে হইবে, এবং অহিংসা ও জীবে দয়া দেখানই প্রধান সৎকার্য। এই সব প্রচারকের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ক্ষত্রিয়-সন্তান। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এইরূপ দুইজন বিখ্যাত সংস্কারক জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। ইহারা উভয়েই প্রথম জীবনে ক্ষত্রিয় রাজকুমার ছিলেন।

জৈনধর্ম ঃ

যিনি জৈনধর্ম স্থাপন করেন তাঁহার আসল নাম বর্ধমান। কিন্তু তিনি মহাবীর নামেই পরিচিত। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ হইতে ৫২৭ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিদেহ বা উত্তর-বিহারের এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বংশে তাঁহার

জন্ম হয়। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হন এবং বার বৎসর কঠোর তপস্যার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তখন হইতে তাহার নাম হইল মহাবীর। সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম 'জিন'। এইজন্য তাঁহার শিষ্যগণকে জৈন বলা হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ করার পর মহাবীর বিদেহ, মগধ ও অঙ্গরাজ্যে তাঁহার নূতন ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রচার করিতেন যে, জীবনের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি পাইতে হইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। এইরূপে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীর পাবা নগরে দেহত্যাগ করেন।

জৈনধর্মের সার কথা এই যে, কোন জীবজন্তুর হিংসা করা চলিবে না, সত্য কথা বলিবে এবং সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করিতে হইবে।

জৈনদের মতে ধর্মরক্ষার জন্য চব্বিশ জন মহাপুরুষ বা তীর্থঙ্কর জন্মিয়াছিলেন। শেষ দুইজন তীর্থঙ্করের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। মহাবীরের ঠিক পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। অনেকের মতে তিনিই জৈনধর্ম স্থাপন করেন। তিনি শিষ্যগণকে চারিটি বিষয় পালন করিতে বলিতেন, যথা :—(১) মিথ্যা কথা বলিবে না, (২) জীবহিংসা করিবে না, (৩) চুরি করিবে না, (৪) বিষয়ে আসক্তি বা লোভ করিবে না। পরেশনাথ পাহাড়ে তিনি দেহত্যাগ করেন বলিয়া এই পাহাড় জৈনদের একটি তীর্থস্থান।

পার্শ্বনাথের চারিটি উপদেশের সহিত মহাবীর আর একটি উপদেশ যোগ করেন ; সেটি হইল 'ব্রহ্মচর্য' বা কৃচ্ছ্রসাধন বা অতি-কঠোর জীবন যাপন। পার্শ্বনাথ জৈনধর্মের মূল চারিটি নীতি প্রচার করেন, এ কথা স্বীকার করিয়াও প্রচারের দিক দিয়া মহাবীরকেই জৈনধর্মের স্থাপয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বৌদ্ধধর্ম :

বৌদ্ধধর্ম স্থাপয়িতার নাম সিদ্ধার্থ গৌতম। তিনি শাক্যমুনি এবং বুদ্ধ নামেও পরিচিত। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬০ হইতে ৪৮০ অব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে শাক্য নামে এক ক্ষত্রিয়

জাতি বাস করিত। এই শাক্যবংশে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। প্রবাদ আছে, একজন বৃদ্ধ, একটি রোগী ও একটি মৃতদেহ দেখিয়া সিদ্ধার্থ বেশ বুঝিলেন যে, মানুষের জীবন দুঃখময়। মানুষ বৃদ্ধ হয়, রোগ ভোগ করে এবং শেষে কষ্ট পাইয়া একদিন মরিয়া যায়। কেমন করিয়া মানুষকে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর ক্লেশ হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় ইহাই সিদ্ধার্থের একমাত্র চিন্তা হইল। এমন সময়ে এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, সন্ন্যাসী কেমন শান্তিতে আছেন। তাঁহার কোন দুঃখকষ্ট নাই। ইহা দেখিয়া সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা হইল।

বুদ্ধদেব

এই সময় সিদ্ধার্থের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সংসারের-বন্ধন ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া সিদ্ধার্থ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একদিন গভীর রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। গৌতমের এই সংসার ত্যাগের নাম 'মহাভিনিষ্ক্রমণ'। প্রথমে তিনি বৈশালীর মঠে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তারপর তিনি গয়ার নিকট নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিলেন, শরীরকে অশেষ ক্লেশ দিলেন, তথাপি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইখানেই তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইল। যে বৃক্ষ (দ্রুম)-মূলে বসিয়া তিনি এই জ্ঞান বা বোধ লাভ করিলেন, সেই বৃক্ষের নাম বোধিদ্রুম এবং সেই স্থানের নাম হইল বুদ্ধগয়া। আর সেই দিন হইতে সিদ্ধার্থের নাম হইল বুদ্ধ বা জ্ঞানী।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বুদ্ধদেব কাশীর নিকটে সারনাথ নামক স্থানে তাঁহার নূতন

ধর্মমত প্রথম প্রচার করিলেন। অতঃপর তিনি শিষ্যগনের সহিত মগধ ও অযোধ্যার গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া এই নূতন ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, সকলেই তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ প্রভৃতি নগর বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। মগধের রাজা বিম্বিসার, কোশলের ধনী বণিক অনাথপিণ্ডদ এবং রাজগৃহের সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলন প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য হইলেন। দরিদ্র আনন্দ ও নাপিত উপালি সংসার ছাড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এইরূপ দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে দেহত্যাগ করিয়া 'মহাপরিনির্বাণ' লাভ করিলেন।

বুদ্ধের দেহত্যাগের পর অল্পদিনের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে ভারতের বাহিরে তিব্বতে, চিন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করিল। এখন আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশী নয় বটে, কিন্তু তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এখনও বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত আছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলকথা ঃ

দিব্যজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধদেব বারাণসীতে আসিয়া পঞ্চশিষ্যের সহিত যে আলোচনা করেন তাহা হইলে আমরা বুদ্ধের আদি ও মূল ধর্মমত জানিতে পারি। বুদ্ধদেবের মতে মানুষ নিজের সুখের জন্য জীবনযাপন না করিয়া বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিবে। মানুষকে চারিটি মহান সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে' যথা—(১) জন্ম-মৃত্যু ও জরা-ব্যাধি হইতে যত দুঃখ-কষ্টের উৎপত্তি ; (২) এই দুঃখকষ্টের কারণ তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা ; (৩) সুতরাং তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে ; (৪) সদাষ্টমার্গ বা আটটি সৎ উপায়ে এই মূলোচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ জীবনের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে আটটি সৎ উপায়ের দ্বারা তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করিয়া নির্বাণলাভ করিতে হইবে। দৃষ্টি ও সঙ্কল্প, বাক্য ও কর্ম, জীবিকা ও চেষ্টা, স্মৃতি ও সমাধি —এই আটটি বিষয়ে সৎ বা ভাল হইলে নির্বাণ লাভ করা যায়। সংস্কারের দ্বারা চালিত না হইয়া প্রকৃত তথ্য জানিতে হইবে (সম্যক্ দৃষ্টি) ; ভাল কাজ করিবার সঙ্কল্প করিতে হইবে (সৎ সঙ্কল্প) ; সৎ বাক্য বলিতে হইবে ; সৎকর্ম

করিতে হইবে; সৎজীবন যাপন করিতে হইবে; সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য সৎচেষ্টা করিতে হইবে; সৎস্মৃতি (ভাল বিষয়ের চিন্তা) ও সম্যক্ সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে।' এই আটটি উপায় 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে পরিচিত। জৈনগণের ন্যায় বৌদ্ধগণও বেদের প্রাধান্য ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না। জৈনধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও আত্মা ও ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জৈনগণের ন্যায় বৌদ্ধগণও জটিল যাগযজ্ঞে ও জাতিভেদে বিশ্বাসী নহেন। হিন্দুদের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বৌদ্ধদের বিশ্বাস আছে এবং এই বিশ্বাসই বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। কামনাই মানুষকে নানা কর্মে প্ররোচিত করে এবং কর্মফল অনুযায়ী মানুষ এক জন্মের পর আবার জন্ম পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধগণের মতে এই কামনার বিনাশই মোক্ষ বা নির্বাণ।

শরীরকে কষ্ট দিয়া তপস্যা করিলেই পুণ্য হয় না। আবার ভোগবিলাসও ভাল নয়। এই দুই-এর মধ্যপথে থাকিয়া ধর্মাচরণ করিতে হইবে। অহিংসা ও ত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে, কাহাকেও হিংসা করা চলিবে না, সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। মানুষ সুখভোগ করিতে চায়, চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায় ও বিষয় সম্পত্তি করিতে চায়। এই তিন রকমের লোভই ছাড়িতে হইবে। এই প্রকার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্তি পাওয়ার নাম নির্বাণ। এই নির্বাণ লাভ করিলে জীবের সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান হয়।

বাস্তব বাদিতা: বুদ্ধদেব বাস্তববাদী ছিলেন; জনসাধারণের পক্ষে যেরূপ ধর্মাচরণ সম্ভব তাহাতেই তিনি জোর দিয়াছিলেন। গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে হইবে না, কঠোর তপস্যা করিতে হইবে না, মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া সৎপথে জীবনযাপন করিলেই এবং ভোগতৃষ্ণা পরিহার করিলেই মুক্তি পাওয়া যাইবে। এই ধর্ম গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব হইল। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সকলেই সাগ্রহে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল।

গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদের স্থান ছিল না, সকল জাতির সকল লোকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সমানঅধিকার লাভ করিত। বুদ্ধদেব রাজা, বণিক, নীচজাতির লোক, সকলকেই আদরে গ্রহণ করিতেন।

বৌদ্ধ সংঘ : বুদ্ধদেবের বাস্তববাদিতার আর একটি উদাহরণ বৌদ্ধসংঘ গঠন। বৌদ্ধসংঘও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংঘের কার্যাবলী গণতন্ত্রের নিয়মে পরিচালিত হইত। সংঘের অধিবেশনের আগে হইতে বিজ্ঞপ্তি দিতে হইত, অধিবেশনে আলোচনা ও ভোট লওয়া হইত এবং সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হইত।

বুদ্ধদেব বারাণসীর মৃগদাবে তাঁহার পঞ্চশিষ্যের নিকট প্রথম প্রচারকার্য আরম্ভ করেন এবং এই পাঁচজন শিষ্যকে লইয়া তিনি প্রথম বৌদ্ধসংঘ গঠন করেন। বৌদ্ধসংঘ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে এবং শেষে বিশাল আকার ধারণ করে।

ত্রিপিটক ও জাতক : বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মমত লিখিয়া যান নাই। তিনি মুখে মুখে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যগণ রাজগৃহে মিলিত হইয়া তাঁহার ধর্মমত তিনটি পুস্তকে সঙ্কলিত করেন। এই তিনটি পুস্তকের নাম ত্রিপিটক। (১) বুদ্ধদেব স্বয়ং যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সূত্রপিটক ; (২) বৌদ্ধমঠবাসীদিগের নিয়মাবলীর নাম বিনয়পিটক ; এবং (৩) বৌদ্ধ-ধর্মের দার্শনিক আলোচনাসমূহের নাম অভিধর্মপিটক। পরবর্তীকালে বুদ্ধের পূর্বজীবনের যে কাহিনীগুলি লেখা হইয়াছিল, ইহাকে বলে 'জাতক'।

বৌদ্ধ সংগীতি : বুদ্ধদেবের ধর্মমত সঙ্কলন ও আলোচনার জন্য যেসব সভা আহূত হইয়াছিল সেগুলিকে বৌদ্ধসঙ্গীতি বলে। বুদ্ধের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার প্রধান শিষ্য মহাকশ্যপ মগধের রাজগৃহে একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় বুদ্ধের বাণী সঙ্কলিত ও শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ইহার একশত বৎসর পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে বৌদ্ধধর্মপুস্তক সঙ্কলিত হয়। তারপর মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে পাঞ্জাবে চতুর্থ সম্মেলন আহূত হইয়াছিল।

ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব :

হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ—এই তিনটি ধর্মের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম জাতিভেদ মানে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ মানে না। হিন্দুধর্ম বলে যে,

ভগবান আছেন; জৈন ও বৌদ্ধরা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, এবং হিন্দুর মত ব্রাহ্মণের ও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। এইখানেই হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মৌলিক পার্থক্য। কঠোর তপস্যা দ্বারা পুণ্যার্জন হইতে পারে একথা জৈনগণ স্বীকার করেন, বৌদ্ধগণ এ বিষয়ে মধ্যপন্থী। ইন্দ্রিয় জয় করিয়া অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির বিকাশসাধন করাই জৈনের মতে জিনত্ব। 'সম্যক্ জ্ঞান' লাভের দ্বারা নির্বাণ লাভ করা বৌদ্ধধর্মের আদর্শ। আবার হিন্দুধর্মের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করেন।

জৈনগণ ধর্মকার্যে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করেন এবং প্রধান প্রধান হিন্দু দেবতাকে মানিয়া চলেন। সুতরাং হিন্দু ও জৈনধর্মে তেমন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া জৈনধর্ম এখনও ভারতে প্রচলিত আছে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মে সাদৃশ্য এত কম যে, উভয় ধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের কারণ ঃ যতদিন ভারতে বৌদ্ধধর্ম রাজগণের সহানুভূতি পাইয়াছে, ততদিন উহা অক্ষুণ্ণ মহিমায় এদেশে বিরাজমান ছিল। অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি পরাক্রান্ত নৃপতিগণের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বহির্বিশ্বে ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি স্থানে পূর্ণ উদ্যমে প্রচারিত হইয়াছিল। রাজানুগ্রহ হারাইয়া বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিলুপ্ত হইল। পক্ষান্তরে গুপ্তসম্রাটগণের সময়ে হিন্দুধর্ম রাজানুকূল্য পাইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, কুষাণ যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হওয়ায়, বৌদ্ধসমাজে দেববিগ্রহের ন্যায় বুদ্ধমূর্তির পূজা ও নানা অনুষ্ঠান প্রচলিত হইল এবং হিন্দুধর্মের পক্ষে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করা সম্ভব হইল। বৌদ্ধধর্ম নিজের বিশেষত্ব হারাইয়া পরিম্লান মহিমায় কোনরূপে টিকিয়া রহিল। তৃতীয়তঃ বৌদ্ধধর্মের সহিত তান্ত্রিক ধর্মাচারের সংযোগ হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম দ্রুত অবনতির পথে ধাবিত হইল। ঠিক এই সময়ে শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি শক্তিশালী ধর্মপ্রচারকগণের চেষ্টায় হিন্দুধর্ম বিলক্ষণ উন্নতি ও শক্তিলাভ করিয়া বৌদ্ধ সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ সমাজ ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়িল।

প্রাচীন ভারতের রাজ্য ও সাম্রাজ্য :

ষোড়শ মহাজনপদ : রামায়ণ ও মহাভারতে কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্যের বর্ণনা আছে। জৈন ও বৌদ্ধ পুস্তক হইতেও ষোলটি বড় বড় রাজ্য (মহাজনপদ) ও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের কথা জানা যায়। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি রাজ্য রাজারা শাসন করিতেন এবং অপর কয়েকটি প্রজা-সাধারণের মতে শাসিত হইত। যে সকল রাজ্য প্রজাদের প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত, সেগুলিকে গণতন্ত্র বা গণরাজ্য বলিত। প্রাচীনকালে গণরাজ্যের মধ্যে বৈশালীর লিচ্ছবিদের রাজ্যই সমধিক বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কপিলবস্তুর শাক্যরাজ্যও একটি গণরাজ্য ছিল। কিন্তু গণরাজ্যগুলি খুব বেশী দিন টিকে নাই। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজারা শক্তিশালী হইয়া এগুলি ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া লইয়াছিলেন।

সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা : কোন রাজা শক্তিশালী হইয়া উঠিলেই পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ এই চারিটি রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল।

এলাহাবাদের নিকটে বৎসরাজ্য অবস্থিত ছিল, ইহার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। বৎসরাজ্যের দক্ষিণে, বর্তমান মালবের পশ্চিম ভাগে ছিল অবন্তী রাজ্য। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৎসরাজ্যে উদয়ন এবং অবন্তীরাজ্যে প্রদ্যোৎ নামে দুইজন রাজা রাজত্ব করিতেন। বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরভাগে ছিল কোশল রাজ্য। ইহার রাজধানী শ্রাবস্তী। তখন কোশল রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। কাশী-রাজ্য ও কপিলবস্তুর শাক্যরাজ্য কোশল রাজ্যের অধিকারে আসায় কোশলরাজ্য বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই শক্তিশালী মগধরাজ্য ইহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

বর্তমান বিহার প্রদেশের দক্ষিণ-ভাগে মগধরাজ্য অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিম্বিসার নামক এক পরাক্রান্ত রাজা মগধে রাজত্ব করিতেন। বিম্বিসারের সময় হইতেই মগধের উন্নতি আরম্ভ হয়। পুরাতন রাজগৃহ বা গিরিব্রজ মগধের রাজধানী ছিল। বিম্বিসার গিরিব্রজ হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া নব-রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিম্বিসার কোশলনৃপতি প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবীকে বিবাহ করিয়া কাশীর কতকাংশ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি বৈশালীর লিচ্ছবি রাজার কন্যাকেও বিবাহ করেন। এইরূপে দুই পরাক্রান্ত রাজাকে সহায়রূপে পাইয়া তিনি মগধরাজ্য বিস্তার করিবার সুবিধা করিয়া লইলেন এবং অঙ্গদেশ (বিহারের পূর্বভাগ) জয় করিলেন। নৃপতি বিম্বিসার বহুবার বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশবাণী শুনিয়া তিনি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বেণুবন নামক এক সুরম্য উদ্যান তিনি বৌদ্ধ সমাজকে দান করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, বিম্বিসারের শেষ বয়সে তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু তাঁহাকে হত্যা করিরা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজাতশত্রুও বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি বৈশালীর গণতন্ত্র রাজ্য অধিকার করেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে অজাতশত্রুর মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার দুই পুত্র দর্শক ও উদয়ী পর পর রাজা হন। রাজ্য বড় হইল দেখিয়া উদয়ী গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে কুসুমপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই কুসুমপুর পরে পাটলিপুত্র নামে বিখ্যাত হয়। বিম্বিসারের বংশ আরও কয়েক বৎসর রাজত্ব করার পর ইহার বিরুদ্ধে জনসাধারণ এরূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠে যে, এই বংশের শেষ রাজা সিংহাসনচ্যুত হন।

শিশুনাগ নামে এক মন্ত্রী মগধ সাম্রাজ্যের এক প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। পুরাতন রাজবংশ পাটলিপুত্রে অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া নূতন রাজা গিরিব্রজে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। শিশুনাগ প্রতিদ্বন্দ্বী অবন্তীরাজকে পরাস্ত করেন এবং চম্বল নদীতীর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নন্দ বা উগ্রসেন শিশুনাগ বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া মগধ সিংহাসন লাভ করেন। মহাপদ্ম জাতিতে শূদ্র ছিলেন। তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজার উচ্ছেদ সাধন করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি সম্ভবতঃ আটাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার আট পুত্র ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখন নন্দ বংশের শেষ রাজা ধননন্দ মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন।

অনুশীলনী

1. What are the main teachings of Jainism and Buddhism and their importance in Indian history ?

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মূল ও প্রধান শিক্ষা কি ? ভারতের ইতিহাসে উহাদের গুরুত্ব কি ?

2. Describe the evolution of Buddhism and its advance into foreign lands.

বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশ ও বহির্দেশে উহার বিস্তার বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মৌর্য যুগ

বৈদেশিক আক্রমণ ঃ

উত্তর-ভারতে মগধরাজ্য যখন ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া এক বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত হইতেছিল, সেই সময়ে সিন্ধু-উপত্যকা অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। বৈদিক যুগের শেষের দিকে সিন্ধু-উপত্যকা উত্তর-ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গাঙ্গেয় সমভূমির আর্যগণ পঞ্জাবকে কতকটা অবজ্ঞার চোখে দেখিতে লাগিল। ফলে মগধ সাম্রাজ্য পঞ্জাবের দিকে বিস্তৃত হইল না। উত্তর-পশ্চিমের গিরিদ্বার দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে প্রথমেই যে ভূভাগ অবস্থিত তাহা একতাবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত থাকায় বিদেশীয়গণের পক্ষে ভারত-আক্রমণ মোটেই দুষ্কর ছিল না।

পঞ্জাবের পশ্চিমদিকে শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুপ্রসিদ্ধ পারস্য-সম্রাট কাইরাস (কুরুস) সাম্রাজ্য-বিস্তারকল্পে পারস্য হইতে পূর্বাভিমুখে যুদ্ধাভিযান করিয়া হিন্দুকুশের উত্তরস্থিত ব্যাকট্রিয়া রাজ্য জয় করেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পরে আনুমানিক ৫২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্য-সম্রাট প্রথম দারায়স সিন্ধু-উপত্যকার কিয়দংশ জয় করিয়া তাহা পারস্য-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দারায়সের পুত্র জার্কসীজ্ খ্রীষ্টপূর্ব ৮০ অব্দে গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী গঠন করিবার জন্য পারস্য-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সৈন্যদল সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং ভারতীয় সৈন্যদলও ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। ইহার দেড়শত বৎসর পরে মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন পারসীক বাহিনীকে পরাস্ত করেন তখনও ভারতীয় সৈন্য ও ভারতীয় হস্তী পারস্য সম্রাটকে সাহায্য করিয়াছিল। পারসীকগণ কিভাবে ভারতীয় রাজ্য শাসন করিতেন তাহা ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ রাজকর ও সৈন্য সাহায্য লইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই পারসীক আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে স্থলপথে ও জলপথে যাতায়াতের পথ বাহির হইয়াছিল, পশ্চিমের সহিত বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল এবং পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান

ঘটিয়াছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা, ক্ষত্রপ উপাধির ব্যবহার, অশোকের শিলালিপির ধরণ এবং খরোষ্ঠী অক্ষর—এইগুলির জন্য ভারতবর্ষ পারস্যের নিকট ঋণী।

পারসীকদের পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ (৩২৭-৩২৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)। মহাবীর আলেকজাণ্ডার গ্রীস দেশের অন্তর্গত ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন। হিন্দুকুশের ভিতর দিয়া তিনি ভারতে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে সসৈন্যে সিন্ধুনদ পার হইয়া আসেন। এক প্রকার বিনা বাধায় তিনি পঞ্জাবের বিপাশার তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হইবেন, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই ইহার দুইটি কারণ ছিল; প্রথম—দীর্ঘ দিনের অভিযানের ফলে তাঁহার সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দ্বিতীয়—পূর্ব-ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ্য।

মৌর্যবংশ ঃ অশোক ঃ

আলেকজাণ্ডারের ভারত-ত্যাগের কিছুদিন পরে চন্দ্রগুপ্ত নামে মৌর্যবংশীয় এক বীর নন্দবংশের শেষ সম্রাটকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসনে উপবেশন করেন (৩২১ খ্রীঃ পূঃ) চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কেবল বিজেতা হিসাবেই কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই, শাসক হিসাবেও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত। আনুমানিক ২৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পর অশোক কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। কলিঙ্গ-বিজয় কেবল অশোকের জীবনে নহে, ভারতের এবং সমগ্র প্রাচ্য জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় এবং অতঃপর তিনি অস্ত্রবলের পরিবর্তে ধর্মবল দ্বারা দেশজয়ের পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তামিলদেশ ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্বত্র এবং আফগানিস্তানের বহুলাংশে অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

কলিঙ্গ-বিজয়ের পর অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন হইতে তিনি 'দেবানাম্ প্রিয়' ও 'প্রিয়দর্শী' আখ্যা গ্রহণ করেন। সকল ধর্মের যাহা সার, তাহাই

তিনি সকলকে পালন করিতে উপদেশ দিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গুরুজনে ভক্তি, জীবে দয়া, সত্যকথন প্রভৃতি সদাচরণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্মকে অশোক রাজধর্মে পরিণত করেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। নানাস্থানে পর্বতগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে তিনি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ধর্মোপদেশগুলি খোদিত করিয়াছিলেন। এই শিলালিপিগুলি 'ধর্মলিপি' নামে খ্যাত। সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত বিগ্রহ গৌতম বুদ্ধের ধর্মাদর্শ সম্রাট অশোকের মনে যে পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল উহা মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

রাজতন্ত্রের ইতিহাসে সম্রাট অশোক এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, "সকল প্রজাই আমার সন্তান। আমি যাহা কিছু করিতেছি উহার একমাত্র লক্ষ্য হইল তাহাদিগকে ইহসংসারে ও পরলোকে সুখী করা। এই কর্তব্য পালন করিয়া জীবজগতের প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পালন করিতে চাই।" অশোকের এই বাণী পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। শাসন-ব্যবস্থার নানা ভাগে তিনি সংস্কার সাধন করিয়া তাঁহার প্রজাগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত সদ্ভাব রাখিবার আদর্শ পৃথিবীতে প্রথম প্রবর্তন করিয়া পররাষ্ট্রক্ষেত্রে অশোক এক নূতন নীতির প্রবর্তন করেন। যুদ্ধ দ্বারা পররাজ্য অধিকারের প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে অশোক প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। সকলের সহিত মিত্রতাপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিবার ফলে সম্রাট অশোক দক্ষিণ-ভারতের চোল, পাণ্ড্য, কেরল, প্রভৃতি রাজ্য, মিশর, ম্যাসিডন, সিরিয়া, ইপাইরাস প্রভৃতি গ্রীক রাজ্য ও সিংহলের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল রাজ্যেও অশোকের ধর্মদূত প্রেরিত হইয়াছিল।

অশোকের দিগ্বিজয়ের মহিমা অপেক্ষা অশোকের ধর্মবিজয়ের মহিমাই অধিকতর বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। সৌহার্দ্য, মানবতা এবং ভ্রাতৃত্ব—ইহারই মাধ্যমে অপরের

প্রীতি ও আনুগত্য অর্জন করাকেই অশোক ধর্মবিজয় বলিয়া মনে করিতেন। ইহার মূল প্রেরণা ছিল উদার বৌদ্ধধর্ম। এই বৌদ্ধধর্মকে সর্বজনগ্রাহ্য করাই ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্মকীর্তি। বিশ্বজনীন এই ধর্মমতকে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়া অশোক অম্লান খ্যাতি ও কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। পরমত-সহিষ্ণুতা অশোকের ধর্মনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের উপর এই কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন নিজেদের ধর্মের মাহাত্ম্যকে বড় করিতে গিয়া অপরের ধর্মের মাহাত্ম্যকে ক্ষুণ্ণ বা খর্ব না করে। এইসব আদেশ তিনি পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইতিহাসে অশোকের স্থান ঃ

ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্দেশ করিতে গিয়া সকল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকই বলিয়াছেন যে, তিনি একজন খ্যাতনামা ও সদাশয় সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। পৃথিবীর একজন প্রধান কর্মবীর ও মানব-হিতৈষী বলিয়াই তিনি শ্রেষ্ঠ। প্রজাদের নৈতিক জীবনকে বড় করিবার ভার পৃথিবীতে খুব কম রাজাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অশোক সেই মুষ্টিমেয়দের একজন। ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ-লেখক এইচ. জি. ওয়েলস বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের মধ্যে অশোকই শ্রেষ্ঠ। অশোক সত্যই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহার উদার নীতি ও মানবতার আদর্শ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। শান্তি, মৈত্রী ও অহিংসার মধ্যেই পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ নিহিত—এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া এবং তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াই পৃথিবীর রাজাদিগের মধ্যে অশোক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন। অশোক-সাম্রাজ্য আজ নাই, কিন্তু জনসেবা, মানবতা, আত্মত্যাগ, মৈত্রী ও সহিষ্ণুতার যে মহান আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিনাশ নাই। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের দ্বারা তিনি মানবসমাজের এক বিশাল অংশের উপর যে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইতিহাসে চিরকালের মত সম্রাট অশোককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিবে।

মৌর্যযুগে সমাজ, সংস্কৃতি ও শাসনপদ্ধতি ঃ

মৌর্যযুগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয় এইবার আমরা আলোচনা করিব। প্রধানতঃ গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশোকের শিলালিপি হইতেই ঐতিহাসিকগণ এই সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের সময়কার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে বাস করিতেন। তাঁহার বিবরণকে আমরা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারত-ইতিহাসে প্রথম বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। প্রজার কল্যাণসাধনে, সামরিক নিরাপত্তা-বিধানে এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব-প্রদানে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত অসামান্য কার্যদক্ষতা ও দূরদৃষ্টি দেখাইয়াছেন।

শাসনব্যবস্থা ঃ মৌর্যযুগের প্রশাসনিক-ব্যবস্থা রাজধানী পাটলিপুত্রে কেন্দ্রীভূত ছিল। মৌর্যশাসন ছিল রাজতন্ত্র। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। মেগাস্থিনিস বর্ণনা করিয়াছেন, রাজা কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন আর অশোক তাঁহার শিলালিপিতে রাজার কর্তব্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। সকল রাষ্ট্রিক কার্যে রাজা সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন, উৎসাহের সহিত তিনি রাজকর্ম পালন করিবেন, রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব তিনিই রাখিবেন, সর্বত্র রক্ষী নিযুক্ত করিবেন এবং মন্ত্রী-অধ্যক্ষাদি বড় বড় রাজকর্মচারীদের নিয়োগ তাঁহার হাতে থাকিবে। রাজাই ছিলেন আইন-প্রণেতা এবং তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও বিচারক। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া তিনি প্রজার দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা শুনিবেন ও তাহার প্রতিবিধান করিবেন। মৌর্যরাজা স্বৈরাচারী ছিলেন, কিন্তু তিনি অপত্যস্নেহে প্রজাপালন করিতেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহাও উল্লিখিত আছে। সম্রাট অশোক এই আদর্শকে সবচেয়ে বেশি রূপায়িত করিয়াছিলেন।

শাসনকার্য-পরিচালনায় রাজার দায়িত্ব ছিল খুব বেশি। 'মন্ত্রিণ্' ও 'অমাত্য' নামে দুই শ্রেণীর রাজপুরুষ তাঁহাকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করিতেন। অমাত্যগণ শাসন ও বিচার উভয়বিধ কার্যই পরিচালনা করিতেন। ইহা ব্যতীত একটি 'মন্ত্রিপরিষদ' ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে রাজা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

অশোকের অনুশাসনেও মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখ আছে। নগরশাসনের ভার 'নগরাধ্যক্ষ' আর সামরিক শাসনের ভার 'বলাধ্যক্ষ' নামে কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। রাজার বিচারালয়ই সর্বোচ্চ বিচারালয় ছিল। ইহা ব্যতীত অন্য বিচারালয়ও ছিল। গ্রামিক-গণ এবং গ্রামের প্রবীণগণ গ্রামে সামান্য সামান্য বিষয়ের বিচার করিতেন। সে-সময় দণ্ডবিধি অতিশয় কঠোর ছিল। গুরুতর অপরাধে অঙ্গচ্ছেদেরও ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য বহু সংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত হইত। মৌর্যযুগের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় হইলেও, প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল।

রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য নানা শ্রেণীর বহু রাজকর্মচারী ছিলেন। সর্বোপরি ছিলেন মন্ত্রী। ইহাদিগকে বলা হইত মহাপাত্র বা মহামাত্য। অমাত্যগণ ছিলেন শাসন ও বিচারবিভাগের শীর্ষে। ইহা ছাড়া ছিল মন্ত্রিপরিষদ। মৌর্যশাসনে মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। শাসনের নানা বিভাগ ছিল। কৌটিল্য বত্রিশজন অধ্যক্ষের নাম দিয়াছেন, যাঁহারা শাসনের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অশোকের আমলে ধর্মমহাপাত্র নামে একদল বিশিষ্ট রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'ধর্ম' ও 'মৈত্রী' প্রচারে ইঁহারা ছিলেন অশোকের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। বিরাট মৌর্য সাম্রাজ্য স্বভাবতই কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। অশোকের সময় যে পাঁচটি বড় প্রদেশের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি, তক্ষশিলা এবং তোশালি। বড় বড় প্রদেশ এবং প্রত্যন্ত রাজ্যে রাজকুমার-গণ শাসনকর্তা ছিলেন। মৌর্যযুগে ফৌজদারী শাসন অত্যন্ত কঠোর ছিল। অর্থশাস্ত্রে শাসনের যে ছবি আছে তাহা পুলিসী শাসন। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকের সময়ে অবশ্য এই পুলিসী-রাষ্ট্র কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

জনসাধারণের অবস্থা : মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মৌর্য যুগে লোকে এক সরল ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিত। দেশে প্রচুর শস্য জন্মিত। লোকের মনও ছিল সুস্থ ও সবল। কৃষিকার্য ছিল মৌর্য আমলে জনসাধারণের প্রধান বৃত্তি। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করিলেও সেই সময়ে বহু লোক নগরে ও শহরে বাস করিত। তখন ভারতবর্ষে নগর ও শহরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। কৃষি ভিন্ন খনিজ ও অরণ্য সম্পদেরও প্রাচুর্য তখন ছিল এবং ইহার

অধিকার ছিল রাষ্ট্রের হস্তে। মোট কথা, মৌর্যযুগে জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে নিশ্চয়তা ছিল বলিয়া তাহারা উন্নত ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিত। তাহারা অলংকার ও পোষাকের জন্য বেশ খরচ করিত, ফুলতোলা কাপড়, জুতা ও ছাতা ব্যবহার করিত।

মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণে মৌর্য যুগে সাতটি জাতির উল্লেখ করিয়াছেন—দার্শনিক, কৃষক, শিকারী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, পরিদর্শক (পরিবেদক) ও অমাত্য। সমাজে একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল; স্বয়ং সম্রাট অশোকেরও একাধিক মহিষী ছিলেন। ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু য়ুরোপের ক্রীতদাসগণের তুলনায় ভারতের ক্রীতদাসগণ সদয় ব্যবহার পাইত। স্বাধীন নাগরিকদের যাবতীয় অধিকারই তাহারা ভোগ করিত। ভারতবর্ষ সত্যই ধন-ধান্যে সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। দুর্ভিক্ষ প্রায় অপরিচিত ছিল। ভারতবাসীরা সুন্দর পরিচ্ছদ ও অলংকার ব্যবহার করিত। তাহাদের জীবন ছিল সরল, অনাড়ম্বর ও ন্যায়পরায়ণ। সমাজে কৃষকদের স্থান ছিল উচ্চে। ভারতবাসীর সত্যবাদিতা ও পরস্বাপহরণ-বিমুখতা মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। চুরি-ডাকাতির অভাব, সমাজে সমৃদ্ধি ও আনন্দোৎসব ভারতীয় জনসমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। কৃষিকার্য ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভারতের জনগণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। সমাজ অচলায়তন ছিল না; বিদেশ ও বিদেশীদের সহিত ভারতের নিবিড় পরিচয় ছিল। অশোকের লিপিমালা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, উন্নতচরিত্র প্রজাপুঞ্জ তাঁহার অপূর্ব আদর্শের রূপায়ণে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত।

সামরিক বিভাগ: মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বিভাগের বিরাটত্ব ও যোগ্যতা সবিস্তারে লিখিয়াছেন। সেনাপতি ছিলেন সকলের শীর্ষে। তাঁহার অধীনে ছয়টি সমিতির সাহায্যে সামরিক বিভাগ শাসিত হইত। প্রত্যেক সমিতিতে ছিলেন পাঁচজন সদস্য। বলাধ্যক্ষগণই ছিলেন এই বিভাগের উচ্চকর্মচারী। অশ্বারোহী, পদাতিক, নৌসৈন্য, সামরিক দপ্তর, যানবাহন, সামরিক হস্তী ও রথ—এই ছয়টি ভাগে সামরিক শাসন চলিত উপরোক্ত ছয়টি সমিতির দ্বারা। চন্দ্রগুপ্তের স্থায়ী সৈন্যবাহিনীতে ছিল ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং নয় হাজার হাতী। এই সামরিক সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে বিন্দুসার ও অশোক পাইয়াছিলেন। অশোক অবশ্য কলিঙ্গ

যুদ্ধের পর পররাজ্য-গ্রাসের নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনী সীমান্তরক্ষা ও শান্তি-স্থাপনের কাজে নিযুক্ত ছিল।
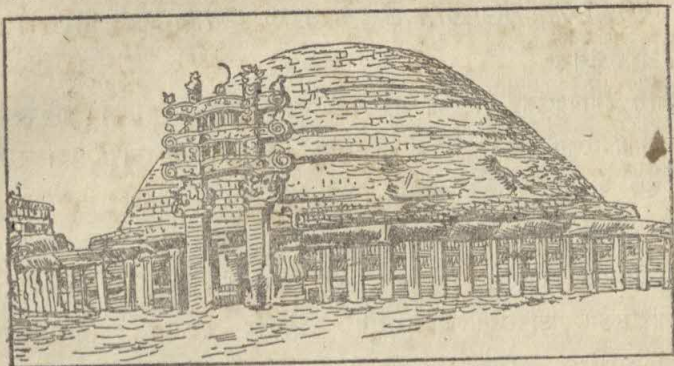
সাঁচি স্তূপ

শিল্প ও স্থাপত্যের উৎকর্ষতার জন্য মৌর্যযুগ প্রসিদ্ধ। পাটলিপুত্রের দারুময় রাজপ্রাসাদ সেদিনও বিদেশীদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। অশোকের রাজত্বকালেই ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সারনাথের স্তম্ভ, সাঁচির স্তূপ ও বুদ্ধগয়ার সিংহাসন উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

1. Describe the greatness of Asoka in history.

   ইতিহাসে অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর।

2. Give an account of the society, culture and administration of the Maurya Age.

   মৌর্যযুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও শাসন-পদ্ধতি বর্ণনা কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক ও পারসিক প্রভাব

কুষাণ রাজগণ ঃ

বিশাল মৌর্যবংশের পতনের পর ভারতের ইতিহাসে আবার পরিবর্তন দেখা দিল। মৌর্যবংশের শেষের দিকে সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্য সিংহাসন অধিকার করিয়া শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শুঙ্গ বংশের সময়েই ঐক্যবদ্ধ ভারত বাহিরের শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। শুঙ্গ বংশের রাজত্বকাল হইতে ভারতে গ্রীকদের আক্রমণ শুরু হয়। এই গ্রীকগণ বাহ্লিক বা ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক নামে পরিচিত। ভারতের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে ইহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতকাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। পরবর্তী কালে ভারতের এই অংশ গ্রীকগণের অধিকার হইতে শকদিগের অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। মৌর্য-যুগের অবসানে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে অন্ধকার দেখা দিয়াছিল তাহা দূর হইল কুষাণ জাতির ভারত আক্রমণের পর। কুষাণগণ ছিল ইউচি জাতির একটি শাখা। এই ইউচি জাতি চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করিত। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর আচার-ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। উত্তরকালে ইহারা ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল এবং কুষাণবংশের অন্যতম রাজা কণিষ্কের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছে।

কণিষ্ক ঃ অনেকের মতে কণিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ঐ বৎসর হইতে শকাব্দের প্রবর্তন করেন। কুষাণ রাজগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি একজন পরাক্রান্ত যোদ্ধা ও বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি কাশ্মীর জয় করিয়া সেখানে কণিষ্কপুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরাপথে তিনি মগধ পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। এইরূপে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া কণিষ্ক-কুষাণ সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরুষপুর বা পেশোয়ার তাঁহার রাজধানী ছিল।

বিজয়ী যোদ্ধা হইলেও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কণিষ্কের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বিরোধ দূর করিবার জন্য তিনি বৌদ্ধাচার্যগণের এক মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাই বৌদ্ধধর্মের শেষ মহাসঙ্গীতি। এই সভায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নানপ্রকার ভাষ্য প্রণয়ন করা হইয়াছিল। এই সময় হইতে মহাযান ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও কণিষ্কের ধর্মমত উদার ছিল। তাঁহার মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি ব্যতীত বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবীর মূর্তি দৃষ্ট হয়। কণিষ্ক তাঁহার রাজধানী পুরুষপুরে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর এক বিরাট চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কণিষ্ক সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি বহু স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, চিকিৎসক চরক প্রভৃতি বহু মনীষী তাঁহার রাজত্বকালকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

কুষাণযুগের গুরুত্ব ঃ কুষাণদিগের রাজত্বকাল প্রাচীন ভারতের এক গৌরবময় যুগ। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহাদের দান নিতান্ত অল্প নহে। এই যুগে সাহিত্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই যুগেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক নূতন শিল্পপদ্ধতির উদ্ভব হয়। ইহা 'গান্ধার শিল্প' নামে বিখ্যাত। গান্ধার অঞ্চলে এবং তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গান্ধার শিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই শিল্পে ভারতীয় ও গ্রীক-শিল্পরীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। কণিষ্কযুগের ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের একটি বিখ্যাত নিদর্শন হইল সাঁচীস্তূপের তোরণ। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেও এই যুগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধগণ হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। নাগার্জুনের প্রভাবে মহাযান মতের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা আরম্ভ হয়। ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রচারে কুষাণদিগের অবদান অল্প নহে।

বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ঃ

মৌর্যযুগের পতন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান—এই দুইটি ঘটনার মধ্যবর্তী যে সময় সেই পাঁচশত বৎসরকালে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাহিরের একাধিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি যে মৌর্যযুগের পূর্বেই

পারস্য ও গ্রীসের সহিত ভারতের যোগাযোগ সাধিত হইয়াছিল। তাহার পরে বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেশে যখন রাজনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিল সেই সময় বহু বিদেশী জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং স্ব স্ব অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। স্থলপথে ভারতে প্রবেশ করিবার ইহাই তখন ছিল প্রধান পথ। ভারতে সমাগত বৈদেশিক জাতিগণের মধ্যে বাহ্লিক বা ব্যাকট্রিয়, গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একমাত্র কুষাণগণই এই দেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সব বিদেশী জাতিগণের কেহই পরবর্তী কালে আর বিদেশী ছিল না। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা ক্রমে ভারতবাসীতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিশ্রণের ইহাই ছিল কারণ। পরবর্তী কালে এই সংমিশ্রণের ফল রাজনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সমাজ-জীবনে প্রকাশ পাইয়াছিল। সমসাময়িক গ্রীক বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গ্রীক, শক, পহ্লব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সামাজিক রীতি-নীতির সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতীয় সমাজ-জীবন অনেকাংশে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম। মানুষের সমাজ এইরূপ ভাবেই দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমেও সমাজ-জীবনের যথেষ্ট প্রসারতা ঘটিয়া থাকে। মৌর্য-পরবর্তী যুগে শুধু মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সংযোগ সাধিত হয় নাই, জলপথ ও স্থলপথে রোমের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। ভারতের বণিকগণ বিদেশের বন্দরে বাণিজ্যপোত পাঠাইতেন এবং ভারতের দ্রব্যসম্ভারের বিনিময়ে তাঁহারা বিদেশী পণ্যসম্ভার আনয়ন করিতেন। ঐতিহাসিক-গণ বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের পরবতী দুইশত বৎসরে রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছিল যে, একমাত্র সৌখীন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়াই ভারতবর্ষ সেই সময়ে প্রতি বৎসর প্রচুর লাভ করিত। রোমান-ঐতিহাসিক প্লিনি বলিয়াছেন যে, ভারত হইতে বৎসরে প্রচুর পরিমাণে বিলাসদ্রব্য রপ্তানি করা হইত এবং ইহার ফলে রোমের যাবতীয় সম্পদ ভারতে চলিয়া যাইত।[১]

আবার এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই সেদিন ভারতের সহিত

গ্রীক এবং রোমের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আদান-প্রদানের ফলে গ্রীস এবং রোমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে গান্ধার-রীতিতে আমরা এই গ্রীকো-রোমান প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতবর্ষে বসবাসকারী বহু গ্রীক ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এইভাবে সেদিন ভারতীয় এবং বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিপুল সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বহির্জগতের সহিত ভারতের এই যোগাযোগ পরবর্তী কালের ইতিহাসের গতিকে অনেকখানি প্রভাবিত করিয়াছিল। কুষাণ-যুগে ভারতের বাহিরে বিশেষ করিয়া মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে এবং চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের ফলেই পরবর্তী কালে এইসব অঞ্চলে বহু ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। চীনদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ অবশ্য সুদূর অতীত হইতেই বিদ্যমান ছিল, তবে এই সময়ে উহা আরও সুদৃঢ় এবং ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল।

অনুশীলনী

1. Describe the importance of Kanishka and of the Kushan Age in Indian history.

ভারতীয় ইতিহাসে কণিষ্ক ও কুষাণ যুগের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

2. Discuss the question of foreign influence on India and Indian influence on foreign lands in the five centuries after Asoka.

অশোকের পরে পাঁচ শতাব্দী কাল ভারতীয় সভ্যতার উপর বৈদেশিক প্রভাব ও বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বর্ণনা কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুপ্তযুগ ঃ ভারতের সুবর্ণযুগ

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটি চিরন্তন নিয়ম এই যে, নূতন আদর্শ, নূতন চিন্তাই ইহার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিয়াছে। এক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত অন্যদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যখনই সংঘর্ষ ও সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তখনই ঐ দুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু রূপান্তরই সাধিত হয় নাই, যুগান্তরও আসিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ ইহার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। বহির্জগতের সহিত যদি কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে কোন দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতিতে কোন পরিবর্তন বা উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাহিরের পৃথিবীর সহিত সংস্পর্শ বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। মৌর্যোত্তর যুগে সেই সংস্পর্শ ও সংযোগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুপ্তযুগে তাহাই যেন আরো নিবিড় ও ব্যাপক হইয়া উঠিল।

গুপ্ত রাজবংশ

মৌর্যবংশ যেমন গ্রীকদের হাত হইতে ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিল, গুপ্তবংশ সেইরূপ শকাধিপত্য ধ্বংস করিয়া ভারতে জাতীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া ভারতে কোন পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। এই সময়ে বহু বৈদেশিক শক্তি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্ত রাজবংশের অধীনে মগধ পুনরায় প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য পত্তন করেন চন্দ্রগুপ্ত (১ম)। চন্দ্রগুপ্ত বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ক্রমে অযোধ্যা ও প্রয়াগ পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৩২০ খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বৎসর হইতে ভারতে যে নূতন অব্দের প্রচলন হয় উহাই গুপ্তাব্দ বা গুপ্ত

সংবৎ নামে পরিচিত। পাটলিপুত্র গুপ্ত সম্রাটদের রাজধানী ছিল। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত সমধিক প্রসিদ্ধ। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে হূণদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। গুপ্তরাজগণ শাসন, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সকল দিক দিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ সমুদ্র-গুপ্তকেই গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী সম্রাট হিসাবে খ্যাতিলাভ করিলেও সমুদ্রগুপ্ত বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সম্রাট প্রাচীন ভারতে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতে কোন বৈদেশিক আক্রমণ হয় নাই। ইহা নিঃসন্দেহে সমুদ্রগুপ্তের পরাক্রমের পরিচায়ক।

প্রথমে আমরা গুপ্তশাসনপ্রণালী আলোচনা করিব। প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতে গুপ্তদের দান অসামান্য। মৌর্যদের পতনের পর পাঁচশত বৎসর-কাল ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও অনিশ্চয়তার যুগ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গুপ্ত সম্রাটগণ পুনরায় ভারতকে এক রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেন। রাজত্বের সূচনা হইতে প্রায় দেড়শত বৎসরকাল এই ঐক্য সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত গুপ্তযুগের গৌরবময় ইতিহাসের ধারা চলিয়াছে। গুপ্ত-শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন দিনই সমগ্র ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত-শাসনাধীনে ছিল না। প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল আর্যাবর্তের বহুলাংশ। অবশিষ্ট ভারতের বিভিন্ন রাজগণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেন এবং তাঁহারা পাটলি-পুত্রের গুপ্ত-সম্রাটদের সার্বভৌম নরপতির সম্মান দিতেন। সমুদ্রগুপ্তের ঔদার্য ও দূরদৃষ্টির জন্যই গুপ্ত-সাম্রাজ্য এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

শাসন-ব্যবস্থা :

রাজা হিসাবে গুপ্ত সম্রাটগণ ছিলেন সর্বেসর্বা। সেই যুগই স্বেচ্ছাতন্ত্রের যুগ, রাজার ক্ষমতা মৌর্যোত্তর যুগে সীমাহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; গুপ্তদের রাজকীয় পদবীতে তাঁহারা যে প্রকৃতিপুঞ্জের উপাস্য দেবতা তাহার পরিচয়ও রহিয়াছে। বিধি-দত্ত রাজক্ষমতার চরম প্রকাশ ভারতবর্ষে গুপ্তযুগেই হইয়াছিল। রাজা ছিলেন

বংশানুক্রমিক, কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা তাঁহার পুত্রদের মধ্যে একজনকে রাজা মনোনীত করিয়া যাইতেন। রাজার স্বেচ্ছাচার কিন্তু অত্যাচারে পরিণত হইতে পারিত না; কারণ তখনকার রাজারাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধন এবং তাহাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি-সাধন করিবার জন্যই রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হইবে। প্রজার নিকট রাজার ঋণ পুরুষানুক্রমে, সে ঋণ সুশাসন দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে—ইহাই ছিল গুপ্ত স্বেচ্ছাতন্ত্রের আদর্শ।

চৈনিক পরিব্রাজক **ফা-হিয়েনের বিবরণ** হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গুপ্ত সম্রাটগণ মন্ত্রিবর্গের সাহায্য লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ফা-হিয়েন গুপ্তরাজাদের শাসন-দক্ষতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। গুপ্তসম্রাট ছিলেন শাসন-যন্ত্রের মধ্যমণি। তিনিই ছিলেন প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারক, প্রধান শাসনকর্তা এবং আইন-প্রণেতা। গুপ্তদের শাসনকার্য বহু দক্ষ রাজকর্মচারীর সহায়তায় পরিচালিত হইত। গুপ্ত-রাজাদের কয়েকজন দায়িত্বশীল রাজকর্মচারীদের নাম ও পরিচয় এইরূপ: (১) মন্ত্রী (ইনি রাজার একান্ত সচিব); (২) সন্ধি-বিগ্রহিক (ইনি সংগ্রাম ও শান্তির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী); (৩) অক্ষ পটলাধিকৃত (ইনি সহকারী দলিল-দস্তাবেজ রক্ষক) এবং (৪) মহাবলাধিকৃত ও মহাদণ্ডনায়ক (ইহারা উর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারী)। সামরিক ও অ-সামরিক (military and civil) কর্মচারীদের মধ্যে ব্যবধানের উচ্চ প্রাচীর ছিল না। গুপ্ত-সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রাদেশিক শাসন স্বায়ত্ত-শাসনেরই নামান্তর ছিল। মোটকথা, গুপ্তযুগে স্বৈরতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল।

সুশাসিত কোন রাজ্যের মাপকাঠি হইল জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গুপ্তযুগে ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রা ছিল নিরুদ্বেগ ও শান্তিপূর্ণ। দণ্ডবিধি আদৌ কঠোর ছিল না, অথচ জনসাধারণের নৈতিক জ্ঞান ছিল যথেষ্ট প্রবল। চুরি-ডাকাতি তখন একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে; বিচারালয়ে ক্বচিৎ কেহ বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিত। জন-সাধারণের অর্থ-নৈতিক অবস্থা উন্নত ছিল এবং তাহাদের মধ্যে সৎকর্ম করিবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল। দেশের সর্বত্র যাতায়াতের জন্য রাজপথ ছিল। পথের

স্থানে স্থানে ছিল সরকারী বিশ্রামাগার এবং সরকারী ব্যয়ে রাজ্যের বহুস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইত। সমাজ-জীবনে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত। গুপ্ত-সম্রাটগণ নিজেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পরধর্ম-সহিষ্ণুতাও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ

এইবার আমরা গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা বলিব। সকল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। সুশাসন, রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির ফলেই গুপ্তযুগ ভারতবর্ষে ধর্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে এবং বাণিজ্যে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিশালতায় গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর না হইলেও সংস্কৃতির দিক দিয়া ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী। গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে কেন আমরা স্বর্ণযুগ বলি ? কারণ গুপ্তযুগের সার্থকতা কেবলমাত্র রাজনীতি বা সুশাসনে নয়, সমাজ, অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানে এক অপূর্ব বিকাশের যুগ এই গুপ্ত যুগ। কিন্তু ইহা একদিনে বা একপুরুষে সম্ভবপর হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে গুপ্তযুগের পটভূমিকায় রহিয়াছে পাঁচশত বৎসরের এক অন্ধকারময় যুগ। ভারতীয় সমাজ তখন জটিল হইয়া উঠিয়াছে। জাতিভেদ কঠোরতর ছিল, কিন্তু বহিরাগতকে আপন করিবার ঔদার্য ভারতের ছিল। কত বিদেশী ভারতীয় হইয়াছিল এবং গুণানুসারে ক্ষত্রিয় ও নিম্নতর জাতিতে মিশিয়া গিয়াছিল।

গুপ্তযুগ শুধু বিকাশের যুগ নয়, ইহা বিস্তারের যুগ। এই যুগে ভারত পূর্ব ও পশ্চিম দেশগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুক্ত ছিল। বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির কথা ফা-হিয়েন লিখিয়া গিয়াছেন। সমৃদ্ধ ভারতের বণিকগণ জাহাজ-বোঝাই পণ্যদ্রব্য লইয়া মালয় উপদ্বীপে এবং তৎসংলগ্ন দ্বীপসমূহে যাইত। এইভাবে জাভা, সুমাত্রা, বলী প্রভৃতি অঞ্চলে সেদিন বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শিক্ষা,, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই গুপ্তযুগের অনন্যসাধারণ বিকাশ—প্রধানতঃ এই কারণেই ইহা সুবর্ণযুগ। এই সুবর্ণযুগেই সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। মহাকবি কালিদাস সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগেরই কবি। একা কালিদাসই এই যুগকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার রচিত রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ প্রমুখ কাব্য ও নাটক কালিদাসকে সমগ্র মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে শাশ্বত গৌরবের উর্ধ্বতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর যেসব দার্শনিক, কবি ও নাট্যকার গুপ্তযুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শূদ্রক, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু, অসঙ্গ, দিগ্‌নাগ, কুমারজীব, হরিষেণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই যুগেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে পুনরায় লিখিত হইয়াছিল। পুরাণগুলি বহুপূর্বে রচিত হইলেও এই সময়েই উহারা বর্তমান আকার ধারণ করে। নূতন যুগের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক প্রয়োজন অনুসারে এগুলি নূতন আকারে সরল ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। স্মৃতিশাস্ত্রগুলিও সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী করিয়া নূতন-ভাবে লিখিত হইয়াছিল। এই সময়ে জ্যোতির্বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্ত এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহারা গ্রীসদেশীয় জ্যোতির্বিদ্যার সহিত সম্যকরূপে পরিচিত ছিলেন। আর্যভট্ট প্রাচীনযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর 'আহ্নিক-গতি' ও 'বার্ষিকগতি' আবিষ্কার করেন।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের **ত্রিধারাই** গুপ্তযুগে অপূর্ব বেগবতী। সঙ্গীতেও এ যুগের দান আছে। গুপ্ত শিল্পরীতি নিজস্ব ধারায় দেদীপ্যমান। ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ইহা এক সুষ্ঠু প্রকাশ। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যুগের বহু শিল্পকীর্তিই মুসলমান আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু যাহা আছে তাহার মূল্যও কম নয়। সারনাথ গুপ্তশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ বৌদ্ধসাহিত্য হইতে গৃহীত। এই যুগের শিল্পীরা বহু পৌরাণিক কাহিনীও প্রস্তরে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। শিল্পজগতের শাশ্বত গৌরব অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্রাবলী প্রধানতঃ এই যুগেই অঙ্কিত হইয়াছিল। ধাতুবিদ্যায় ভারত যে কত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে দিল্লীর মেহেরৌলি প্রস্তরস্তম্ভে। দেড়শত শতাব্দীরও অধিককাল এই স্তম্ভটি রৌদ্র ও জলে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া

আছে ; কিন্তু আজিও তাহাতে এতটুকু মরিচা ধরে নাই। গুপ্তশিল্প ও স্থাপত্য হিন্দু-বৌদ্ধ সহযোগিতার ফল। গুপ্তসম্রাটগণের স্বর্ণমুদ্রাগুলির সৌন্দর্যও আকর্ষণীয়। ইহাও সে-যুগের ধাতুশিল্পের উন্নতির অভ্রান্ত নিদর্শন।

ধর্ম ঃ

গুপ্তসম্রাটগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন। অশোক এবং কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করিলেও ভারতে ব্রাহ্মণ্য ও জৈনধর্মের প্রভাব একেবারে লোপ পায় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা হিন্দুধর্মের নবজাগরণ এই গুপ্তযুগেই লক্ষ্য করি। গুপ্তসম্রাটগণের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু। শুঙ্গগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। উজ্জয়িনীর শক-ক্ষত্রপগণও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন কুষাণরাজও হিন্দুদেবতার উপাসনা করিতেন। হিন্দুধর্মের নবজাগরণ না বলিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবের বৃদ্ধিই গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্য—ইহাই বলা সঙ্গত। ইহার একটি বিশেষ কারণও ছিল। ভারতে যখন মহাযানী বৌদ্ধধর্মমত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বুদ্ধমূর্তির পূজা প্রচলিত হইতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হইল। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মে কিন্তু উগ্রতা ছিল না। ইহার কারণ পরধর্ম-সহিষ্ণুতা গুপ্তযুগের ধর্মজীবনের মূলমন্ত্র ছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গুপ্ত-সম্রাটগণ প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও বৌদ্ধদের উপর কোনরূপ নির্যাতন করেন নাই ; বরং তাঁহারা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য দান করিতেন। এমন কি, অন্য ধর্মাবলম্বী-দিগকেও তাঁহারা উচ্চ রাজপদ প্রদান করিতেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সহিত হিন্দু-ধর্মের বিন্দুমাত্র অসদ্ভাব ছিল না।

বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ঃ

গুপ্তযুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য বহির্ভারতের সহিত সংযোগ স্থাপন। এই যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বৈদেশিক রাজ্যগুলির সহিত ভারতের যোগাযোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে কয়েকটি প্রচারকদল চীনদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। আবার কয়েকজন বৌদ্ধতীর্থযাত্রী চীনদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। ইহার

ফলে চীনের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে মালয় উপদ্বীপ ও তাহার সন্নিহিত দ্বীপগুলির সহিত ভারতের সংযোগও স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে বণিকগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে এই সকল স্থানে গমনাগমন করিতেন। তাম্রলিপ্তের অভ্যুদয় গুপ্ত রাজত্বকালের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা তখন একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সুদূর দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপনে এই তাম্রলিপ্ত বন্দর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। আবার বণিকদের সূত্র ধরিয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া এবং অন্যান্য দ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত চীন, পূর্ব-এশিয়া, পশ্চিম-এশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। এইভাবে গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

অজন্তা-গুহা-প্রাচীরের চিত্রগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ও পারস্যের মধ্যে দূত বিনিময় হইত। রোম-সাম্রাজ্যের সহিতও গুপ্ত-রাজগণের যোগাযোগ ছিল। সেইজন্য গুপ্তযুগের মুদ্রাগুলিতে রোমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, গুপ্তযুগে দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের যুগে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের ফলে যেমন এক উন্নত ধরণের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল ঠিক সেইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের ফলে ভারতবাসীর মনে যে প্রসার ঘটিয়াছিল তাহাই গুপ্তযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যখন পূর্ণতা ঘটে, তখনই উহা নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অপরাপর অঞ্চলকেও প্রভাবিত করিয়া থাকে। গুপ্তযুগে আমরা ইতিহাসের এই সত্যেরই পরিচয় প্রত্যক্ষ করি। সমগ্র মালয়, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশসমূহের অভ্যুদয়ে এবং পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃতির কথা স্মরণ করিলে গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক মহিমা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন : এইবার আমরা গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কথা আলোচনা করিব। প্রকৃতপক্ষে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিকগণ এই পতনের তিনটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন ; যথা (১) আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও দুর্বলতা ; (২) বহিরাগত আক্রমণ এবং (৩) পুষ্যমিত্র-জাতির বিদ্রোহ। দুর্ধর্ষ হূণজাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি দুর্বল গুপ্তরাজগণের ছিল না। স্কন্দগুপ্তের সময় হইতেই গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার মূলে ছিল বৌদ্ধদের চক্রান্ত। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি যখন দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন হইতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি ক্ষুদ্র শক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সকল রাজ্যের মধ্যে পুষ্যভূতি বংশ ক্রমেই প্রতিপত্তি অর্জন করিতে থাকে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন।

হর্ষবর্ধন :

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ স্থাপিত হয়। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা প্রভাকরবর্ধন। হর্ষবর্ধন ইঁহারই অন্যতম পুত্র। হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীঃ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। সেই সময়ে কনৌজ এবং থানেশ্বর একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মধ্যদেশে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। হর্ষ তাঁহার রাজধানী থানেশ্বর হইতে কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। এই সময় হইতে কনৌজ উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক **হিউয়েন-সাঙ** ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি হর্ষের শাসনকালের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন।

হিউয়েন-সাঙ্ হর্ষের সময়ের ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম এবং সাহিত্য বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রথম জীবনে শৈবধর্মী হর্ষবর্ধন পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন। হর্ষ দয়ালু শাসক ছিলেন। তিনি নিজেই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রাজপ্রতিনিধিগণ প্রদেশের শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। করভার লঘু ছিল, কিন্তু দণ্ডবিধি ছিল খুবই কঠোর। সর্বধর্মে সমশ্রদ্ধা হর্ষবর্ধনের শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি ছিল।

হর্ষবর্ধন কেবল সুদক্ষ সেনাপতি ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই ছিলেন না, প্রবল ধর্মানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যও তিনি ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। 'রত্নাবলী' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া হর্ষ তাঁহার বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত'-রচয়িতা বাণভট্ট হর্ষের অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। তিনি স্বয়ং কয়েক বৎসর এইখানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। এসিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে হাজার হাজার ছাত্র আসিয়া নালন্দায় অধ্যয়ন করিতেন। হিউয়েন সাঙ-এর সময়ে এখানে দশ হাজার ছাত্র ও বহু অধ্যাপক বাস করিতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষালাভ করিতেন।

মেগাস্থিনিসের ন্যায় হিউয়েন-সাঙ্ও ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবাসিগণ সৎ, সত্যবাদী ও ধার্মিক ছিলেন। প্রজাবর্গ সুখে, শান্তিতে ও সরলভাবে জীবনযাপন করিতেন। বিদ্যাচর্চা ও শিল্পকলার প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ ছিল। হর্ষবর্ধন স্বয়ং একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ছিলেন। রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ তিনি পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণকে পুরস্কারস্বরূপ দান করিতেন। হর্ষবর্ধনের সময়ে কনৌজ উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালেও বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি, এই সময়ে সমুদ্রপথে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অনুশীলনী

1. Give a brief account of society and religion, art and literature, economic condition and administration of the Gupta Age.

গুপ্তযুগের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনৈতিক অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

2. Give in brief the accounts of India left by Fa-hien and Hiuen Tsang.

ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ ভারতের যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখ।

নবম পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলার ইতিহাস

প্রাচীন যুগে বাংলা ঃ প্রাচীন হিন্দু যুগে বঙ্গ নামে কোন পৃথক একটি দেশ ছিল না। উহার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন বাংলার এই কয়টি জনপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—(১) বঙ্গ, (২) পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্র, (৩) রাঢ় ও (৪) গৌড়। ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের সমকালীন ইতিহাসে বঙ্গ ও গৌড়ের প্রসিদ্ধিই অধিক। গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন পতনের মুখে তখনই বাংলা দেশে এই দুইটি স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল। 'বঙ্গ' রাজ্যটি বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল আর পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ও উত্তরবঙ্গ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল 'গৌড়' রাজ্য। উত্তর-বঙ্গকে বরেন্দ্রদেশ ও ভাগীরথীর পশ্চিম ভাগকে রাঢ়দেশ বলিত।

প্রথমে আমরা **'বঙ্গ'** রাজ্যের কথা আলোচনা করিব। গুপ্ত আমলে বাংলা দেশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল আপনাদের স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করে এবং এইভাবে বাংলায় কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত কয়েকটি তাম্র-শাসন হইতে এই সময়কার তিনজন বাঙালী রাজার নাম জানিতে পারা যায়; যথা—গোপচন্দ্র, সমাচারদেব ও ধর্মাদিত্য। ইঁহারা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ইঁহারা ৫২৫ খৃঃ হইতে ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে রাজত্ব করেন। এই রাজাদের আমলে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য যথেষ্ট প্রভাব-শালী ও সমৃদ্ধ ছিল। গোপচন্দ্রের রাজ্য পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। গৌড়ে প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটিবার পরে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের অবসান হয়।

শশাঙ্ক ঃ এইবার **গৌড়ের** কথা। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিমবঙ্গে গৌড় নামে এক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমে শশাঙ্ক নামে এক রাজা এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন,

পরে ইনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গৌড় রাজ্যকে গুপ্ত-অধিকার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন।

শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটির কিছু দূরে কানসোনা নামক স্থানটিকেই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। এখানে সে-যুগের বহু ঐতিহাসিক চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা শশাঙ্ক মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার উত্তর ও দক্ষিণাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-উড়িষ্যা সেই সময়ে কঙ্গোদ নামে পরিচিত ছিল। মোট কথা, শশাঙ্ক সমগ্র বাংলা দেশ গৌড়রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ বঙ্গরাজ্য গঠন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ, কনৌজে মৌখরী বংশ, মালবে গুপ্তবংশ এবং আসামে বা কামরূপে বর্মণ বংশ রাজত্ব করিতেছিলেন। শশাঙ্কের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব হইতেই গৌড়ের সহিত মৌখরীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। গুপ্ত এবং মৌখরীদিগের মধ্যে বিবাদের ফলে শশাঙ্ক পশ্চিমদিকে রাজ্য-বৃদ্ধির সুবর্ণসুযোগ পাইলেন। তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং উভয়ে একযোগে মৌখরী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণ নিহত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দী হইলেন। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজ্যবর্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হন। এই সময় শশাঙ্ক কিছুদিনের জন্য কনৌজ অধিকার করিয়াছিলেন।

রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন কামরূপের (প্রাচীন আসাম) রাজা ভাস্করবর্মার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হর্ষের সহিত শশাঙ্কের সংঘর্ষ ও তাহার ফলাফল সম্পর্কে কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা প্রায় সুনিশ্চিত যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছিল। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়াধিপ শশাঙ্কের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মা সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন এবং শশাঙ্কের সাম্রাজ্য হর্ষবর্ধনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

শশাঙ্কের রাজত্বকালের বিশদ বিবরণ কোনও ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যে প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রথম শক্তিশালী স্বাধীন রাজা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁহার বিবরণীতে শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, অথচ তাঁহার বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, শশাঙ্কের রাজ্যে সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার ছিল। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের স্থান অতি উর্ধ্বে। বাঙালী রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রথম সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা। প্রবল শক্তিশালী মৌখরীরাজ এবং থানেশ্বররাজের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াও মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসৃত নীতি অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে বাংলার পালরাজগণ বাংলা দেশকে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন।

পালবংশ ঃ এইবার আমরা **পালবংশের** কথা বলিব। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলা দেশে চরম রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। আত্মকলহ ও বিদ্রোহের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী রাজগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবন বিপন্ন হইল। বাহুবলই তখন একমাত্র বল হইল এবং দেশে ঘোর অরাজকতা দেখা দিল। সমগ্র দেশে আর কোন রাজারই একাধিপত্য রহিল না। দুর্বলেরা প্রবলের অত্যাচারে জর্জরিত হইতে লাগিল। সমগ্র বাংলাদেশ যেন মাৎস্যন্যায়ে পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। (পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে খাইয়া জীবনধারণ করে; তেমনি দেশে অরাজকতার সময় প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে—ইহাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে)। বঙ্গদেশে প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এইরূপ মাৎস্যন্যায় চলিয়াছিল।

এই অত্যাচারের অবসান ঘটাইবার জন্য দেশের প্রধানগণ স্থির করিলেন যে, তাঁহারা একজনকে রাজপদে বরণ করিবেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন। দেশের জনসাধারণও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ইহার ফলে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপাল নামক এক মহাগুণবান্ ব্যক্তি বঙ্গদেশের রাজপদে নির্বাচিত হইলেন। গোপালের পৈতৃক নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রভূমি। সুতরাং তাঁহার প্রবর্তিত রাজবংশ বাংলার নিজস্ব রাজবংশ। এইরূপে গণতান্ত্রিক

উপায়ে দেশের কল্যাণসাধনের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে স্বেচ্ছায় শাসনভার অর্পণ করিয়া সে-যুগের বাঙালী নেতাগণ বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়াছিলেন।

গোপাল মাত্র পাঁচ বৎসর (৭৬৫-৭৬৯ খ্রীঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ধর্মচর্চার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। গোপালের সুশাসনের ফলে বহুদিন পরে বাংলা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছিল। পরবর্তী পালরাজগণের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল ও মহীপালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিক্ষেত্রে পালবংশের শাসনকাল ভারত ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

পালরাজগণের মধ্যে যেমন, তেমনি বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে ধর্মপাল অন্যতম। ইঁহার রাজত্বকাল ৭৭০ খ্রীঃ হইতে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ। এই চল্লিশ বৎসরের রাজত্ব বাংলা দেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছিল। সমগ্র আর্যাবর্তে ধর্মপাল এক রকম অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও রাজনীতি-কুশলতা বাংলা দেশকে বিপুল শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল এবং আর্যাবর্তে সেদিন বাঙালীর প্রভুত্ব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও ধর্মপাল হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ খারবেলের কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মগধে বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্মপাল অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যান। নালন্দার ন্যায় এই মহাবিদ্যালয়টিও ভারতে ও ভারতের বাহিরে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

পরবর্তী রাজা দেবপালও চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (৮১০—৮৫০ খ্রীঃ)। তাঁহার সময়েই পাল সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত তাঁহাকে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার খ্যাতি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপে প্রায় চারিশত বৎসরের রাজত্বের পর পালরাজাদের শাসনের অবসান ঘটে। বাংলার সমাজ-জীবনে ইঁহারা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া যান। কোন এক সময়ে যজ্ঞকর্মাদি করাইবার জন্য তাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। পরে ইঁহাদের বংশ হইতেই বাংলা দেশে বর্তমান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে।

সেনবংশঃ ইহার পর বাংলার ইতিহাসে **সেনরাজবংশ** উল্লেখযোগ্য। পালবংশের শাসনের পর বাংলাদেশে সেনবংশের অধিকার স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে বিজয়সেন পালরাজ রামপালকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইনিই সেনবংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে এক অখণ্ড রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বের সীমা উত্তর-বিহার, উড়িষ্যা ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিজয়পুর ছিল সেনবংশের রাজধানী। পাল-রাজগণের আমলে বাংলায় যে সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সেনরাজগণের সময়েও সেই ধারা অব্যাহত ছিল।

সেনবংশের পরবর্তী রাজগণের মধ্যে দুইজন সমধিক প্রসিদ্ধ; যথা—বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন। বল্লালসেন বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন সেনবংশের শেষ প্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি সম্ভবতঃ ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে সেনবংশের শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। সেনবংশধরগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন যেমন বীর ছিলেন, তেমনই শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায় অনুরক্ত ছিলেন। যে সকল পণ্ডিত ও কবি তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন ও জয়দেব সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সামাজিক অবস্থা ঃ পাল ও সেনযুগে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, পাল-শাসনাধীনে বাংলা দেশ সকল দিক দিয়াই উন্নত হইয়াছিল। রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সময় বাঙালীর প্রতিভা এক বিস্ময়কর উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিল। পালযুগে বাংলাদেশে সামাজিক জাতিবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগ ছিল। বৃত্তি-অনুযায়ী লোক উচ্চশ্রেণীর বা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণগণ সমাজে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করিতেন। জাতি-বিভাগ থাকিলেও এক জাতির সহিত অপর জাতির

বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল না। কৃষি, বাণিজ্য ও নানারূপ শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রচুর ধনাগম হইত।

বাংলার সমাজ-জীবনে বল্লালীবিধান অর্থাৎ কৌলীন্যপ্রথা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমাজে জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখিবার জন্যই তিনি এই প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেনযুগে বাংলার সমাজ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; যথা—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্র। এখানে মনে রাখা দরকার যে, সেনরাজগণ বাঙালী ছিলেন না; তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সেনযুগে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ প্রাধান্য লাভ করেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রজাগণের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইত। বাঙালী জাতিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সেনরাজগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পাল ও সেনরাজাদের আমলে সমাজে নারীজাতীর স্থান খুব উচ্চে ছিল। এই দুই যুগের সমসাময়িক গ্রন্থাদি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই সময়ে নারীকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইত এবং লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তখন পর্দা-প্রথার প্রচলন ছিল না। সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল এবং বাঙালীর পূজাপার্বণের রীতিমত প্রাচুর্য ছিল। এই দুই যুগে কৃষি ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মূলভিত্তি। শিল্প ও বাণিজ্যও সেই যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম, কিন্তু তাই বলিয়া সমৃদ্ধ শহরের অভাব ছিল না।

বাণিজ্য: কৃষি ব্যতীত পাল ও সেনযুগে বাংলাদেশ শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তখন বাংলায় নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠশিল্প ইত্যাদি শিল্প হইতে বহুলোকের জীবিকা নির্বাহ হইত এবং সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি হইতে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে বাংলার বণিকগোষ্ঠী সমুদ্রপথে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, প্রভৃতি দূর-দূরান্ত দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। স্থলপথে বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যেমন দেশের মধ্যে বহু নূতন হাট, গঞ্জ ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তেমনি জলপথে বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দূর-দূরান্ত দেশের অধিবাসীদের সহিত বাঙালীর একটি সাংস্কৃতিক সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল। সে-যুগে

বাঙালী বাংলার বাহিরে বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। স্থলপথে বাঙালী সেদিন তিব্বত, নেপাল ও মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। বাংলায় সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে রপ্তানি হইত। মোট কথা, পাল ও সেনযুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকর্ষ বিশেষ-ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-চর্চা ঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই দুই যুগের দান বড় কম নয়। বস্তুতঃ পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বাংলা দেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক বিস্ময়কর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই দিক দিয়া পাল ও সেনবংশের রাজাদের কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ভিন্ন ইহা আদৌ সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক-গণের মতে, এই দুই যুগে বাঙালী-মনীষার এক আশ্চর্য প্রকাশ দেখা যায় বাংলার সাহিত্যে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ পাল ও সেনরাজগণের আনুকূল্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই যুগের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই জ্ঞানানুশীলন করিতেন। বাংলা ভাষার আদিরূপ চর্যাপদের সৃষ্টি পালযুগেই হইয়াছিল। চর্যাপদে বৌদ্ধ সাধক কবিগণ সাধনার কথা লিখিয়াছেন। গোপীচন্দ্র নামক এক রাজকুমারের কাহিনী লইয়া ময়নামতীর গান লেখা হইয়াছিল। ময়নামতী গোপীচন্দ্রের মাতা। পাল-রাজগণের সময়ে সন্ধ্যাকর নন্দী ও চক্রপাণি দত্ত ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি আর শ্রীকর ছিলেন এই যুগের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত। সেনরাজ বল্লালসেন স্বয়ং ছিলেন সুপণ্ডিত ও কবি; তাঁহার রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব 'গীত-গোবিন্দ' নামে একখানি সুললিত কাব্য রচনা করেন। শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞানচর্চার জন্য এই দুই যুগই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পালযুগে শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষার জন্য কোন ব্যয় বহন করিতে হইত না। পালযুগেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার লুপ্তগৌরব পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছিল।

ধর্ম ঃ পালরাজগণের আমলে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। ইহার কারণ পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ধর্মপাল উত্তরবঙ্গে সোমপুরী (পাহাড়পুর) এবং গঙ্গাতীরে বিক্রমশীলা (ভাগলপুর) এই দুটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই যুগে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' বা 'অতীশ দীপঙ্কর' নামে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন। তিনি বিক্রমশীলা বিহারের মহাচার্য ছিলেন।

এই সময় জৈনধর্মেরও কিছু প্রভাব ছিল। বাঁকুড়া, বীরভূম, দিনাজপুর জেলায় জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু পালবংশের পরে সেনবংশের আমলে বাংলাদেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। সেন রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তাঁহাদের প্রভাবে পৌরাণিকমতে পূজা, আচার ইত্যাদি প্রচলিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের কুলদেবতা ছিলেন। সেন রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। ফলে এইযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল।

শিল্প ও ভাস্কর্য : ধর্ম, সাহিত্য ও শিক্ষায় যেমন, তেমন চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পাল এবং সেন যুগ প্রসিদ্ধ। এই দুই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে—অধিকাংশই মুসলমান আক্রমণের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতেই এই দুই যুগের শিল্পীদের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় মেলে। রাজা গোপাল-নির্মিত ওদন্তপুরী বৌদ্ধবিহার স্থাপত্য-শিল্পের এক অতি সুন্দর নিদর্শন। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে পালযুগের প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান
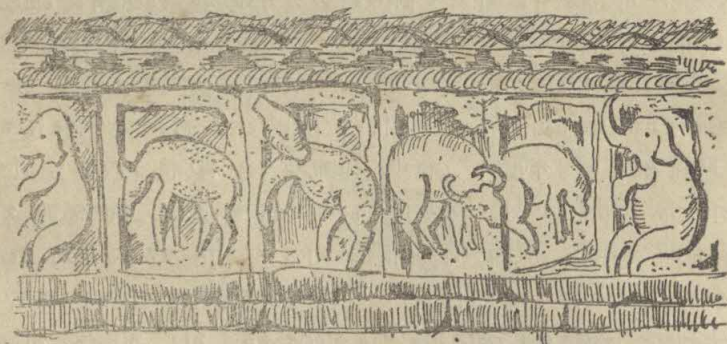
পাহাড়পুরের ভাস্কর্যের নিদর্শন

ও তাঁহার পুত্র বীতপাল চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। বৃহৎ জলাশয় নির্মাণ পালরাজগণের অন্যতম কৃতিত্ব। পাহাড়পুর বিহারের ধ্বংসাবশেষে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বরাকরের মন্দির, বাঁকুড়ার সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, বর্ধমানের দেউলিয়ার মন্দির, পাহাড়পুরের ভাস্কর্য—এ-সবই প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যের অপূর্ব কীর্তি। সেনযুগের শূলপানি বাঙালী ভাস্করদের মধ্যে বিশেষ খ্যাত ছিলেন।

মোট কথা, পাল ও সেনযুগে বাংলাদেশ ও বাঙালী রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি—সকল ক্ষেত্রেই এক অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া বহির্ভারতের সহিত বাংলার সংযোগ এই দুই যুগেই সম্ভব হইয়াছিল।

অনুশীলনী

1. Give an account of the early history of Bengal.

প্রাচীনযুগের বাংলার ইতিহাস বর্ণনা কর।

2. Give an account of the social, economic and cultural life of Bengal in the Pala and Sena periods.

পাল ও সেন যুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিবরণ দাও।

দশম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস

আর্যাবর্তের ইতিহাস যেমন আছে তেমনি দক্ষিণ-ভারত বা দাক্ষিণাত্যেরও ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস না জানিলে ভারত-ইতিহাসের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। অশোকের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুদূর অতীতকালে দক্ষিণ-ভারতে কেরল (চের), চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য ছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

সাতবাহন বংশ : মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন (অন্ধ্র) রাজ্য এবং কলিঙ্গে চেতরাজ্য ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। **সাতবাহনগণ** প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরকাল প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যভাগে পৃথক ভাষাভাষী তেলেগু দেশ। এখানকার অধিবাসীরা অন্ধ্র নামে পরিচিত। সমসাময়িক খোদিত লিপিতে এই অন্ধ্রগণই সাতবাহন নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় বা প্রথম শতকে মহারাষ্ট্রে এই বংশের অভ্যুদয় হয়। সাতবাহনরাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের বাহুবলে দাক্ষিণাত্যে কোনও বৈদেশিক জাতি স্থায়ীভাবে আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাতবাহন রাজ্যের পতন হয় এবং ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত হয়।

কলিঙ্গের চেতবংশ : অশোকের মৃত্যুর পরে কলিঙ্গরাজ্য মগধের বশ্যতা ত্যাগ করিয়াছিল। কলিঙ্গরাজ্য সাতবাহন রাজ্যের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। এখানে চেতবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই বংশের তৃতীয় নৃপতি খারবেল প্রবল-পরাক্রান্ত ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। উড়িষ্যায় উদয়গিরি পর্বতে ইহার একটি শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ; উহা হাতিগুম্ফা শিলালিপি নামে খ্যাত। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খারবেল বহুবিধ কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়া কলিঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গনগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি সাতবাহনরাজ প্রথম সাতকর্ণিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের

অভিযানে সফলতা লাভ করিয়া খারবেল দুইবার উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া মগধ-রাজ্যের দর্প চূর্ণ করেন। মগধ ও অঙ্গ জয় করিবার পর তিনি পুনরায় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পাণ্ড্যরাজ্যের রাজাকে পরাজিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজত্বের দ্রুত পতন হইয়াছিল।

বাতাপির চালুক্যবংশ ঃ তারপর দাক্ষিণাত্যে পরবর্তী কালে যে কয়টি রাজ-বংশের উত্থান ঘটিয়াছিল চালুক্যবংশ তাহাদের মধ্যে একটি। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রদেশে চালুক্যগণের অভ্যুদয় হয়। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে চালুক্যগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। বাতাপি বা বাদামী নগর (বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত) তাঁহাদের রাজধানী ছিল। চালুক্যবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী এবং দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রদেশে তাঁহার ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন নাই, নর্মদা নদীর তীর হইতে কাবেরী নদীর দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য-অভিযান প্রতিহত করেন। তিনি কাঞ্চীর পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের রাজ্যের কতকাংশ দখল করেন। চোল, পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্যের রাজগণও তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করেন। এইরূপে দ্বিতীয় পুলকেশী প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় পুলকেশী বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। পারস্যের রাজার সহিত দ্বিতীয় পুলকেশীর দূত বিনিময় হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ সুখে অতিবাহিত হয় নাই। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মণ মহামল্ল দ্বিতীয় পুলকেশীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। পরে দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য কাঞ্চীর পল্লবদিগের নিকট হইতে হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন।

চালুক্যরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটিলেও ইহা লুপ্ত হয় নাই। চালুক্য রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় দাক্ষিণাত্যের দিগম্বর-জৈন-সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চালুক্যরাজদিগের সময়ে দাক্ষিণাত্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বড় বড় মন্দির নির্মিত হয়। গুহামন্দির নির্মাণের প্রথা এই সময় হইতেই প্রচলিত হয়। বাতাপির বিখ্যাত গুহামন্দির সেকালের ভাস্কর্যশিল্পের উন্নতির নিদর্শন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে অজন্তা গুহাপ্রাচীরের কতকগুলি বিখ্যাত চিত্র চালুক্যরাজাদের সময়ে অঙ্কিত হইয়াছিল। চালুক্যরাজগণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রবিকীর্তি দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরিয়া চালুক্যবংশের রাজগণ তাঁহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশ ঃ দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশের রাজগণের মধ্যে তৃতীয় গোবিন্দ ও অমোঘবর্ষ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গ নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট রাজ্য স্থাপন করেন। রাষ্ট্রকূটগণ জাতিতে রাজপুত ছিলেন। রাষ্ট্রকূটগণও সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দির রাষ্ট্রকূট স্থাপত্যের একটি অমর কীর্তি। দন্তিদুর্গের পর এই বংশের প্রসিদ্ধ নরপতি হইলেন প্রথম কৃষ্ণ। ইহার পুত্র ধ্রুবের সময় হইতে রাষ্ট্রকূটদের গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ এই বংশের প্রধান নরপতি। তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রকূটগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তিনি প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাস্ত করেন। পরবর্তী রাষ্ট্রকূটরাজগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা হইলেন অমোঘবর্ষ। ইনি জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার সময়ে বহু দার্শনিক গ্রন্থ এবং গণিত ও সাহিত্য-গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল।

কাঞ্চীর পল্লবগণ ঃ দক্ষিণ-ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য রাজবংশ হইল কাঞ্চীর পল্লববংশ। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ইহারা একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের রাজধানী ছিল কাঞ্চীপুরম (কাঞ্জীভরম্)। পল্লবরাজগণের রাজত্বকালে তাঁহাদের রাজধানী কাঞ্চী দাক্ষিণাত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ্ কিছুকাল পল্লবদের রাজধানীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, পল্লবরাজ্যের অধিবাসিগণ সাহসী,

বিদ্বান, সৎ ও শিল্পানুরাগী ছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে পল্লবগণ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহাবলিপুরমে আজও পল্লব-শিল্পরীতির নিদর্শন বিদ্যমান।

ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে দক্ষিণ-ভারতের প্রভুত্ব লইয়া চালুক্য ও পল্লবদিগের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হইত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সময়ে কাবেরী নদী পর্যন্ত পল্লবরাজ্য বিস্তার লাভ করে। ঐতিহাসিকগণের মতে সিংহবিষ্ণু তাঁহার প্রতিবেশী পাণ্ড্য, চোল ও চেররাজ্য এবং সিংহল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। নরসিংহবর্মণ পল্লববংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার সময়ে মহাবলিপুরম্ বন্দরটি অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণে এবং এই শতাব্দীর শেষ ভাগে চোলরাজ প্রথম আদিত্যের আক্রমণে পল্লব-শক্তি ধ্বংস হয়। কাঞ্চীর পল্লবগণ ভারতের রাজনীতি ও সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পল্লবদিগের সময় হিন্দুধর্মের প্রচার হয়। দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে পল্লবদিগের শাসন-কালেই আরম্ভ হয়। পাহাড় খুদিয়া মন্দির নির্মাণ করার প্রথা এই সময়েই প্রবর্তিত হইয়াছিল।

পল্লবরাজগণ সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের শিলালিপিগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতেই কাঞ্চী নগরী হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। মহাকবি ভারবি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন আর দণ্ডী ছিলেন নরসিংহবর্মণের সভাপণ্ডিত।

তাঞ্জোরের চোল বংশ : ইহার পর চোল বংশের কথা। সুদূর দক্ষিণের তামিল রাজ্যগুলির মধ্যে চোল রাজ্যই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতেই চোল বংশের অভ্যুত্থান সূচিত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ালয় চালুক্যরাজের একজন সামন্ত ছিলেন। তাঞ্জোর অধিকার করিয়া তিনি সেখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম আদিত্যই প্রকৃতপক্ষে চোল বংশের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার সময়ে চোল রাজ্য উত্তরে মাদ্রাজ হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পরবর্তী রাজা পরান্তক দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করেন। উত্তরে নেলোর হইতে (বর্তমানে অন্ধ্ররাজ্যের অন্তর্গত) দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার

রাজত্বের শেষভাগে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের আক্রমণে চোলরাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। পরবর্তী ত্রিশ বৎসরকাল এই বংশের কোন গৌরবময় পরিচয় নাই। পুনরায় ত্রিশ বৎসর কালের ব্যবধানে দশম শতাব্দীর শেষভাগে মহাবীর রাজরাজ যখন চোল সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন হইতেই চোল বংশের প্রকৃত গৌরবের যুগ আরম্ভ হয়।

রাজরাজ চোল দক্ষিণ-ভারতে পাণ্ড্য, চের, কেরল প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন এবং এই নৌ-শক্তির সাহায্যে তিনি সিংহল দ্বীপের উত্তরাংশ এবং
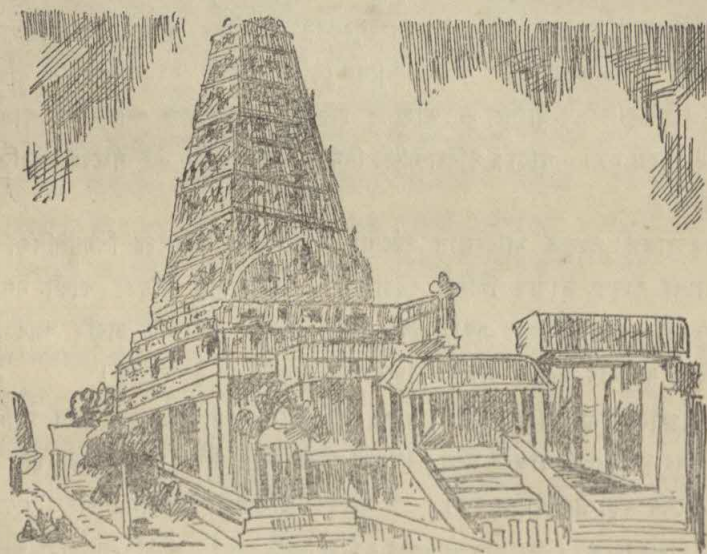
চোল স্থাপত্যের নিদর্শন—তাঞ্জোরের শিবমন্দির

মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঞ্জোরের সুবিখ্যাত বৃহদীশ্বর (শিব) মন্দির নির্মাণ করিয়া তিনি এক অসামান্য শিল্পকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেই চোল শিল্পিগণ তাঁহাদের অনন্যসাধারণ শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিশালতা ও সূক্ষ্মতার সমন্বয় হইল চোল শিল্পের

বৈশিষ্ট্য—ইহাই স্থপতিগণের অভিমত। রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্রচোলকেই চোলবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ভারতের রণকুশলী ও দিগ্বিজয়ী সম্রাটদিগের অন্যতম। কালক্রমে দক্ষিণ-ভারতের সার্বভৌম সম্রাট হইয়া রাজেন্দ্রচোল উত্তর-ভারতে রাজ্য-বিস্তার অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রচোলের বিজয়বাহিনী কলিঙ্গ, দক্ষিণকোশল ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ অধিকার করে। চোল সম্রাট পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট বঙ্গের পালরাজ মহীপালদেব ও রাঢ়ের (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের) শূররাজ রণশূর পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি 'গঙ্গাবিজয়ী' উপাধি ধারণ করিয়া ত্রিচিনপল্লীতে চোলপুরম্ নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজেন্দ্রচোল বিরাট নৌ-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার নৌ-বাহিনী সমুদ্র পার হইয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ ও সুমাত্রার কতকাংশ জয় করিয়াছিল। এইভাবে তিনি চোল সাম্রাজ্যকে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোলবংশের শক্তি হ্রাস পাইল এবং এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলেন। চের বা কেরল রাজ্যও এই সময়ে ক্ষমতা অর্জন করে। পূর্বে পাণ্ড্যরাজ্য কাঞ্চীর পল্লব-সম্রাটের একটি সামন্তরাজ্য ছিল। কেরলগণ ছিলেন চোলদের সামন্ত। প্রধানতঃ মাদুরা, তিরুনেলভেলী (তিন্নেভেলী) ও রামনাদ জেলা লইয়া পাণ্ড্যরাজ্য গঠিত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল মাদুরা। সুদূর দক্ষিণে এই সময়ে ইহাদের সমকক্ষ আর কোন শক্তি ছিল না। পাণ্ড্যরাজগণ শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহারা অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর চোল ও পাণ্ড্য এই উভয় রাজ্যেরই ধ্বংস সাধন করেন।

সমাজ ও ধর্ম : এইবার আমরা দক্ষিণ-ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করিব। রাজনৈতিক উৎকর্ষ যেমন অর্থনৈতিক উন্নতির সূচনা করে, তেমনি সেই সঙ্গে উহা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও গড়িয়া তুলিতে পরোক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। ইতিহাসের ইহাই নিয়ম যে, কোন দেশের রাজনৈতিক উন্নতি-অবনতির সহিত সেই দেশের ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি-

অবনতিও আবর্তিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে একটি বিষয় আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইহার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও হিন্দু সভ্যতার প্রাণশক্তিকে উহা কোনও দিন ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ধর্মচর্চায়, সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বাণিজ্যে এবং আরো অনেক বিষয়ে ভারতের বিশাল হিন্দুসমাজ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের যুগে প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিল।

প্রথমে ধর্মের কথা বলা যাউক। বৈদিক ধর্মের অবনতির যুগে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে নানা কারণে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটে। এই সময় হিন্দুধর্ম বলিতে বুঝাইত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম। ইহার ভিত্তি হইল 'পুরাণ' নামে অভিহিত হিন্দুদের কয়েকখানি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, যথা —বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি। হিন্দুর পুরাণ একাধারে শাস্ত্র ও ইতিহাস। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৈদিক যুগের দেবদেবীর পূজা ও প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহাদের স্থল গ্রহণ করিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি পুরাণ-বর্ণিত দেবদেবী। পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিপূজা যখন প্রচলিত হইল, তখনই দক্ষিণ-ভারতে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মিত হইতে লাগিল। দাক্ষিণাত্যে এই সময়ে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে অপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসিত মূর্তিপূজার প্রেরণা।

বৌদ্ধধর্মের যে অবস্থা হইয়াছিল, জৈনধর্মের অবশ্য সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা হয় নাই। গুপ্তযুগের পর দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত এই ধর্ম গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও কর্ণাট প্রদেশে বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যবংশ জৈনদিগের অনুকূল ছিলেন; অন্যদিকে চোল ও পাণ্ড্যরাজগণ ছিলেন শৈবধর্মের প্রতি অনুরক্ত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ-ভারতে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। ইহাদের প্রভাবে হিন্দু-সমাজে বিরাট ধর্ম-আন্দোলন দেখা দেয়। ইহাদের মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবকাল সপ্তম শতক।

তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী এবং মীমাংসা-দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তিনিই বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানকে এক নূতন গরিমা প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধধর্মকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিলেন। তারপর আসিলেন শঙ্করাচার্য (৭০৮ খৃঃ)।

শঙ্করাচার্য ঃ শঙ্করাচার্য ভারতের অদ্বিতীয় ধর্মসংস্কারক। ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত আলোয়াই নদীর তীরে কালাদিগ্রামে এক দরিদ্র নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হইবার পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আচার্য শঙ্কর মাত্র বত্রিশ বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। তাঁহার ধর্মমত অদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং এই দৃশ্যমান জগৎ শুধুই মায়া অর্থাৎ অসার—ইহাই সংক্ষেপে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ। তিনি বৌদ্ধ ও অন্যান্য সকল বিরুদ্ধ মতামত অকাট্য যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য শঙ্করাচার্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। এই মঠ চারিটির নাম ঃ (১) দ্বারকার সারদা মঠ; (২) মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠ; (৩) বদরিকাশ্রমের যোশীমঠ; এবং (৪) পুরীর গোবর্ধন মঠ। উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করের টিকা ও ভাষ্য তাঁহার মনীষার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। হিমালয়ের অন্তর্গত কেদারনাথতীর্থে এই মহাপুরুষের দেহত্যাগ ঘটে।

রামানুজ ও মাধবাচার্য ঃ দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বহু খ্যাতনামা ধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব হইয়াছিল। কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্যের পর একে একে আসিলেন নাথমুনি, যামুনাচার্য, রামানুজ ও মাধবাচার্য। ইঁহাদের মধ্যে রামানুজ ছিলেন ভক্তিবাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচারক। মাধবাচার্যও ছিলেন তাই। রামানুজ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্মমত শঙ্করের ধর্মমতের প্রতিকূল ছিল; জ্ঞানের পরিবর্তে তিনি ভক্তিকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন। মানুষ যদি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া ভক্তির সহিত ভগবানের আরাধনা করে তাহা হইলে সে সহজেই ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারে।

রামানুজ ও মাধবাচার্য দুইজনেই বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক। বৈষ্ণব ধারায় যেমন শৈব ধারাতেও তেমনি এই সময়ে কয়েকটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। শৈবধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে বসব সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

শিল্প ও স্থাপত্য ঃ সংস্কৃতি ও ধর্মের উৎকর্ষের বহিরঙ্গের প্রকাশ মন্দির। আলোচ্য যুগে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ পাহাড় কাটিয়া গুহাচৈত্য নির্মাণ করিতেন। অজন্তা ও ইলোরা ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জৈনগণও সেই ধারা অনুকরণ করিয়া মহীশূরে শ্রবণবেলগোলায় একটি গুহামন্দির নির্মাণ করে। বৌদ্ধ ও জৈনদের আদর্শে রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ পাহাড় কাটিয়া ইলোরার সুপ্রসিদ্ধ কৈলাস মন্দির নির্মাণ করেন। পাহাড় খুদিয়া
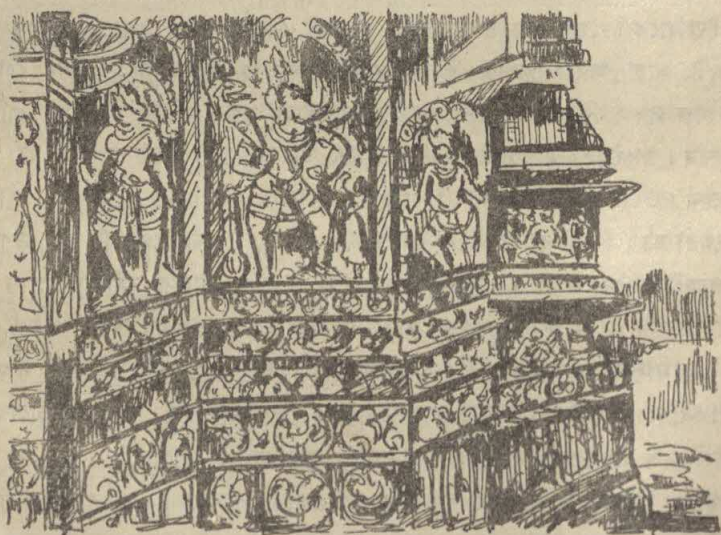
ইলোরার কৈলাস মন্দির

তৈয়ারী এত বড় মন্দির পৃথিবীতে আর নাই। চালুক্যগণ কর্তৃক নির্মিত বাতাপির গুহামন্দিরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্দির-নির্মাণে পল্লব ও চোল সম্রাটগণেরও কৃতিত্ব

ছিল অপরিসীম। পল্লব, চোল ও পাণ্ড্যদের মন্দিরগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উহাদের 'গোপুরম্' বা বৃহদাকার তোরণ। দাক্ষিণাত্যের কারুকার্যখচিত এই মন্দিরগুলি দ্রাবিড় স্থাপত্যের নির্দশন।

সাহিত্য ঃ ধর্মের সহিত সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও বিস্তারসাধন এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ এই সময়ে সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষিণ-ভারত যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই যুগে রচিত দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক সাহিত্যসৃষ্টি ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পুষ্ট করিয়াছে। রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, পল্লব ও চোল রাজগণ সকলেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। মহাকবি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্', দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ', বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা', ভর্তৃহরির 'ভট্টিকাব্য' প্রভৃতি হিন্দুমনীষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দাক্ষিণাত্যের রাজগণের মধ্যেও অনেকে সাহিত্য, দর্শন ও সঙ্গীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।

বাণিজ্য ঃ দাক্ষিণাত্যের এই যে সর্বব্যাপী বিকাশ—ইহা শুধু দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। সেই যুগে বহির্জগতেও ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই দাক্ষিণাত্যের দেশগুলি, বিশেষভাবে সুদূর-দক্ষিণের চোল, চের, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল দেশগুলি বহির্জগতের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। ভৌগোলিক পরিবেশের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়াই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সে যুগে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক প্রভাবই যে বিদেশে ছড়াইয়াছিল তাহা নহে, বহির্ভারতে উপনিবেশ-স্থাপন-ব্যাপারেও দক্ষিণ-ভারতীয়গণই অগ্রণী ছিল। ভারতমহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দাক্ষিণাত্যের প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে ইহা দক্ষিণ-ভারতীয় রাজগণের নৌ-শক্তির পরিচায়ক ছিল।

অনুশীলনী

1. Give an account of the social and religious life of South India under the Chalukyas and Cholas.

চালুক্য ও চোল রাজাদের শাসনকালে দক্ষিণ-ভারতের সমাজজীবন ও ধর্মজীবনের বিবরণ দাও।

2. Write notes on :— (a) Sankaracharya, (b) Rastrakutas, (c) Pallavas, (d) Ramanuja, and (e) Madhabacharya.

টীকা লিখ :— (ক) শঙ্করাচার্য, (খ) রাষ্ট্রকূট বংশ, (গ) পল্লববংশ, (ঘ) রামানুজ, ও (ঙ) মাধবাচার্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজপুত জাতির অভ্যুদয়—মুসলমান আক্রমণ

রাজপুত জাতির উদ্ভব ও পূর্ব-ইতিহাস ঃ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজপুত জাতির উদ্ভব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিকগণের মতে হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণেই ভারতে রাজপুত জাতির উদ্ভব। আমরা জানি যে, শক, কুষাণ প্রভৃতি বহু জাতি একদা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং পরবর্তী কালে উহারা হিন্দু জাতির সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। রাজপুতগণের পক্ষেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে বহু দেশে এইভাবে নূতন জাতির অভ্যুদয়ের দৃষ্টান্ত আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যখন হর্ষবর্ধনের রাজত্ব চলিতেছে, সেই সময় হইতে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে) আমরা প্রথম রাজপুত-দের পরিচয় জানিতে পারি এবং তাহার পর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইহারা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দিল্লী-আজমীরের চৌহান, মালবের পরমার, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল, বুন্দেলখণ্ডের গাহড়বাল, গুজরাটের চালুক্য, গুর্জর-প্রতিহার ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাজপুত রাজবংশগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হইল যোধপুরের রাঠোর ও মেবারের শিশোদীয় বংশ।

অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল এবং তাহারা যখন সিন্ধু, কচ্ছ, মালব প্রভৃতি অধিকার করিয়া আরও দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন গুজরাটের চালুক্যগণ ও দক্ষিণ-গুজরাটের গুর্জর-প্রতিহারগণ তাহাদের বাধা দিয়াছিলেন। সেদিন গুর্জর-প্রতিহারগণের নিকট বাধা না পাইলে আরবশক্তি হয়তো ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিত। তারপর দুই শতাব্দী কাটিয়া গেল। আবার নূতন করিয়া মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হইল দশম শতাব্দীতে। সেই সময়ে হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যাঁহারা অগ্রসর হইলেন তাঁহারাই রাজপুত। ইঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যদিও শেষ পর্যন্ত ইঁহারা দিল্লীর সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি এ-কথা অস্বীকার করিবার নয় যে, নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাজপুতগণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজপুত জাতির বীরত্ব ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায়। এই বীরত্ব এবং

সাহস রাজপুত পুরুষ ও নারী উভয়েই সমানভাবে প্রদর্শন করিয়াছে। আত্মসম্মান-রক্ষার জন্য রাজপুত নারীর 'জহরব্রত' ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। আলাউদ্দীন খিল্‌জীর চিতোর আক্রমণের কালে রাজপুত রমণী জহরব্রত পালন করিয়া যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই বা তুলনা কোথায় ?

রাজপুত জাতির বীরত্বঃ রাজপুত বীরত্বের প্রকৃত পরিচয় আমরা মোগল যুগেই বেশি করিয়া পাই। মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সহিত মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহের যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। দিল্লীর সুলতানী শাসনের দুর্বলতার সুযোগে তিনি ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। বাবর যখন ভারতে রাজ্যস্থাপনে উদ্যোগী হইলেন, সংগ্রামসিংহ তখন বাবরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার পশ্চিমে খানুয়া নামক স্থানে এক যুদ্ধ হইল। ইতিহাস তখন মোগল শক্তির অনুকূলে আর বাবরের ছিল শিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য, আগ্নেয়াস্ত্র এবং উন্নত সমরকৌশল। সংগ্রামসিংহ তাই পরাজিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। খানুয়ার যুদ্ধ সেইদিন ভারতের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল।

ইহার পর রাণা প্রতাপের বীরত্ব-কাহিনী সমগ্র রাজপুত জাতির ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়ের সূচনা করিল। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের একক সংগ্রাম দুর্ধর্ষ মোগল শক্তিকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল। প্রতাপসিংহ পরাজিত হইয়াও মাতৃভূমি চিতোরের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য যে আমরণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসেও বিরল। তাই প্রতাপসিংহের দেশপ্রেম ভারতবাসীকে যুগে যুগে প্রেরণা যোগাইয়াছে। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করাই ছিল মহাবীর রাণা প্রতাপের জীবনব্রত। ১৫৭২ খ্রীঃ মেবারের সিংহাসন লাভ করিবার মাত্র চারি বৎসর পরেই প্রতাপসিংহকে আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। একদিকে প্রতাপশালী ভারতসম্রাট আকবর আর অন্যদিকে রাণা প্রতাপ—যাঁহার সম্বল মাত্র একটি ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী। হলদিঘাট গিরিপথে মোগলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল অসীম দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া তিনি দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার এই চেষ্টা অনেকখানি ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহার পরেই রাজপুতের

জীবনে সন্ধ্যা নামিয়া আসে। রাণা সংগ্রামসিংহ বা রাণা প্রতাপের ন্যায় বীরের উদ্ভব আর ঘটে নাই।

মুসলমান শক্তির অভ্যুদয়ঃ ভারতে মুসলমান শক্তির অভ্যুদয় প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগ হইতে আরম্ভ হয়। আরব জাতির বিজয়াভিযান ইহার প্রাথমিক পর্ব। আমরা এইখান হইতেই বিষয়টি আলোচনা করিব। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রীঃ) আরবগণ ইসলামের বাণী ও শক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল ভারতবর্ষের উপর। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধুদেশ অধিকারপূর্বক ভারতের একাংশে সর্বপ্রথম মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

নানা কারণে আরব আধিপত্য ভারতে বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। ইহার পর দশম শতকের শেষভাগ হইতে ভারতে মুসলিম বিজয়ের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল। গজনীর রাজা সুলতান মামুদ সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। অবশ্য তাঁহার আক্রমণসমূহের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন ও হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরাদি ধ্বংস, দেশজয় নহে। এই ক্রমাগত আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ইহার অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারতে মুসলমানদের রাজ্যস্থাপনের পথ সুগম হয়।

ইহার পর মহম্মদ ঘোরীর ভারত-আক্রমণ প্রসিদ্ধ। ইনি আফগানিস্তানের ঘুর রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইনি ছিলেন জাতিতে তুর্কী। এই রাজ্য গজনীর অধীন ছিল। পরে গজনীর সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে ঘুর রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে ও গজনী জয় করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই রাজ্যের মহম্মদ ঘোরী কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি সুলতান মামুদের ন্যায় কেবল দেশ লুণ্ঠন করিতেই আসেন নাই, ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপনই ছিল তাঁহার ভারত অভিযানের লক্ষ্য। মহম্মদ ঘোরী ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব অধিকার করেন এবং ইহার ফলে ভারতে মুসলমান রাজ্যবিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি দিল্লীর সুলতানী শাসন প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালে সুলতান ইল্‌তুতমিস, বলবন ও আলাউদ্দীন মুসলমান রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে সুলতানি শাসন কায়েম করেন। অবশ্য এই রাজত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই।

আরব অভিযানের সময় হইতেই ভারতে মুসলমান আক্রমণ ভারতবাসীর মনে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঘৃণা ও ভীতির ভিতর দিয়া এই মনোভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। দাসত্ব গ্রহণ ও হিন্দুধর্ম ত্যাগে বাধ্য করার ফলে হিন্দু-দিগের মনে এই ভাব জাগিয়াছিল। মুসলমানদের ধর্মান্ধতা আরব অভিযানের প্রথম হইতেই উগ্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তা'ছাড়া পরাজিত দেশের উপর অত্যাচার, ধর্মমন্দিরগুলি ধূলিসাৎ করা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে এক তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিকগণ ভারতে মুসলমান আক্রমণের সাফল্যের বহু কারণের মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্য একটি প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। দেশ আক্রমণের ব্যাপারে মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণরীতি হিন্দু রাজাদের পক্ষে যুগপৎ বিস্ময় ও বিপর্যয়ের কারণস্বরূপ হইয়াছিল।

অল্‌বিরুণী ঃ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অল্‌বিরুণী সুলতান মামুদের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এখানে সংস্কৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি হিন্দুদের শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চা করেন এবং আরবী ভাষায় হিন্দুদর্শন ও হিন্দুবিজ্ঞান সম্পর্কে তহ্‌কিক-ই-তহ্‌শিল হিন্দ নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া অল্‌বিরুণী যশস্বী হইয়াছেন। ইহা হইতে তৎকালীন হিন্দুদিগের সামাজিক অবস্থা, ধর্ম এবং শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই আরব মনীষী ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া তৎকালীন হিন্দুসমাজের একটি সুন্দর পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অনুশীলনী

1. What do you know of the origin of the Rajputs and their activities in Indian History ?

রাজপুত জাতির উদ্ভব ও তাহাদের ভারত-ইতিহাসে কৃতিত্বের সম্বন্ধে কি জান ?

2. Describe the dynastic struggle, and disunion among the Rajputs.

রাজপুতদিগের বিভিন্ন বংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কলহ সম্বন্ধে কি জান ?

3. Describe the nature of the Muslim conquest of India.

ভারতে মুসলমান বিজয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কি জান ?

4. Who was Alberuni ? What account did he leave of India ?

অল্‌বিরুণী কে ছিলেন ? তিনি ভারতের কি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুলতানি আমলে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

সুলতানি আমল ঃ ভারতে মুসলমান শাসনের প্রথমভাগ সুলতানি আমল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। এই তিনশত বৎসরে পর পর পাঁচটি রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের নাম দাসবংশ, খিলজী বংশ, তুঘ্‌লক বংশ, সৈয়দ বংশ ও লোদীবংশ। এই সকল বিভিন্ন রাজবংশের সুলতানগণের মধ্যে দাসবংশের ইলতুত্‌মিস ও বলবন, খিল্‌জী বংশের আলাউদ্দীন খিলজী, তুঘ্‌লক বংশের মোহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লক প্রভৃতি সুলতানগণই ভারত-ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আলাউদ্দীন খিল্‌জীর শাসনকালে প্রায় সমগ্র ভারতে সুলতানি রাজ্য সমধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য-বিজয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তারপর মহম্মদ-বিন্ তুঘ্‌লকের আমলে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার কারণ তাঁহার শাসনের অব্যবস্থা এবং খাম-খেয়ালী প্রকৃতি। তাঁহার সময় হইতেই দিল্লীর সুলতানিতে অনৈক্য ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখা দেয়। ইহারই সুযোগে বাবর লোদীবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) পরাজিত করিয়া ভারতে মোগল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকগণ সুলতানি আমলকে তুর্কী-আফগান আমল বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন, কারণ প্রধানতঃ তুর্কী ও আফগান জাতি হইতেই এই বংশের উদ্ভব হইয়াছিল।

সুলতানি আমলে সমাজ ও ধর্ম ঃ এইবার আমরা সুলতানি আমলে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতে বহিরাগতের আক্রমণ ইতিপূর্বেও অনেকবার ঘটিয়াছিল এবং তখন গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি যে সব বৈদেশিক জাতি ধন-সম্পদপূর্ণ এই দেশ আক্রমণ করিবার জন্য আসিয়াছিল, কালক্রমে তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া এই দেশের বিশাল হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগে মুসলমানগণ সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর ধরিয়া এই দেশে বাস করিয়াও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুলতানি আমলে ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে একটি ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানের

সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ধর্মমতের পার্থক্য এত বেশী ছিল যে একে অন্যকে নিজ সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে নাই। এইজন্য প্রথমদিকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

কালক্রমে মুসলমানগণ বুঝিল যে, হিন্দুসভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না; হিন্দুগণও বুঝিল যে মুসলমানদের সহিত বিবাদ করিয়া কোন লাভ হইবে না। বহুদিন ধরিয়া একত্রে বাস করিবার ফলে এবং কিছুটা রাজনৈতিক চাপে ও কিছুটা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাহার পর হইতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ক্রমশঃ উভয়ের ভাবধারা ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহার ফলে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক প্রভাবিত হইতে থাকিল। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন আচারের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও মিশ্রণ ঘটিয়া থাকে এবং ইহারই ফলে মানবসমাজে নূতন সংস্কৃতির অভ্যুদয় হইয়া থাকে। সুলতানি আমলে ভারতের ইতিহাসে অনুরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছিল। এই মিলন-মিশ্রণের ফলে কালক্রমে উভয় সমাজের মধ্যে উদার মনোভাবের বিকাশ হইল এবং হিন্দু সাধু ও মুসলমান ফকিরগণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজা এই যুগেই প্রচলিত হইয়াছিল। এই পূজা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই করিত। হিন্দুর সংস্কৃতি জানিবার জন্য মুসলমানের দরবারে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ হইতে লাগিল। মুসলমানগণ হিন্দুর দর্শন, আয়ুর্বেদ ও ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে হিন্দুগণও মুসলমানদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিতে থাকেন। বহু হিন্দু উর্দু ভাষায় আর বহু মুসলমান হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করিলেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টায় নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। এই দুই সংস্কৃতির মিলনের ফলে শিল্প, স্থাপত্য ও সঙ্গীতের নূতন রীতির উদ্ভব হইল।

ধর্মের ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক মিলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। হিন্দুধর্ম যখন ইসলাম ধর্মকে অঙ্গীভূত করিতে পারিল না, বরং বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুগণ কঠোর ও উদার এই দুই প্রকার নীতি অবলম্বন করিলেন। এক দিকে রক্ষণশীল হিন্দুগণ ইসলামের প্রভাব

হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। জাতি-ভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পাইল এবং নারীজাতির অবরোধপ্রথা দৃঢ়তর হইল। মাধবাচার্য, বিশ্বেশ্বর, স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দুসমাজের রক্ষায় সচেষ্ট হইলেন। অপরদিকে ইসলাম ধর্মের কতকগুলি উদার মত হিন্দুদিগের সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার ফলে কয়েকজন হিন্দু-ধর্মপ্রচারক উদারনীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রচারিত মতবাদে কিছু পার্থক্য থাকিলেও সকল প্রচারকই ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের বাণী প্রচার করাই এই সকল উদারপন্থী ধর্মসংস্কারকদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা প্রচার করিলেন যে, সকল ধর্মের মূলনীতি এক এবং ঈশ্বর এক। এই উদার মতবাদ প্রচারের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পথ প্রশস্ত হইল এবং হিন্দুদিগের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবৃত্তি হ্রাস পাইতে লাগিল।

সুলতানি আমলের ধর্ম-সংস্কারকগণ : এই যুগের ধর্মসংস্কারকগণের মধ্যে রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্য কবীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ধর্ম-প্রচারকগণের মধ্যে বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য, নানক, নামদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। রামানন্দ দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি ধর্মমত প্রচার করেন উত্তর-ভারতে। কবীরের আবির্ভাব পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তর-প্রদেশে। তিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিলনসাধনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার ব্রাহ্মণী মাতা কাশীতে একটি পুষ্করিণীর তীরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং একজন মুসলমান জোলা ও তাহার স্ত্রী তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কবীর জন-সাধারণের মধ্যে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। হিন্দু-মুসলমানে তিনি কোন ভেদজ্ঞান করিতেন না। কবীরের ধর্মমত ছিল খুব সরল। তিনি বলিতেন—ভক্তিই মুক্তির উপায়। তাঁহার রচিত দোঁহাগুলিও ছিল খুব সরল ও ভাবপূর্ণ।

শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর জেলার অন্তর্গত তালবন্দী (বর্তমান নানকানা) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও সর্বধর্মে সমভাব পোষণ করিতেন। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই, কবীরের ন্যায় নানকও ইহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধী ছিলেন এবং ইঁহাদের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল।

ইহার পর মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদের ধারায় বাংলাদেশে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (১৪৮৬ খ্রীঃ) বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চব্বিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া আঠার বৎসরকাল শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, মথুরা, গৌড় ও অন্যান্য স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া প্রেম ও ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তিনিও আনুষ্ঠানিক পূজাপদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই উপদেশ দিতেন। নীচজাতীয় হিন্দু, এমন কি মুসলমানও তাঁহার শিষ্য ছিল। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাতিভেদের যে কঠোরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা এইসব ধর্মসংস্কারকগণের উদার মতবাদ প্রচারের ফলে অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় কথা হইল ভাষার উন্নতি। এই সব ধর্মপ্রচারকগণ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতেন; সেইজন্য প্রাদেশিক ভাষাগুলিও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এক মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে যেরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর।

দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিঃ কিন্তু ধর্ম আন্দোলন কেবলমাত্র ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ভারতের বিভিন্ন অংশে জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধনেও ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় বাংলা ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হইল, তেমনি রামানন্দ ও কবীর হিন্দীভাষায় তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিয়া হিন্দী সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। কবীরের রচিত দোঁহা ও মীরাবাঈ রচিত ভজন হিন্দী সাহিত্যের পরম সম্পদ। অন্যদিকে নানক ও তাঁহার শিষ্যগণের রচনায় পাঞ্জাবের গুরুমুখী ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রের ধর্মপ্রচারক একনাথ ও তুকারামের প্রেরণায় মারাঠী ভাষারও উন্নতি হইয়াছিল। দিল্লীর সুলতানগণ অনেকেই ফার্সীভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন-প্রয়াস লক্ষণীয়। আমীর খসরু ছিলেন এই যুগের বিখ্যাত উর্দু কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি ফার্সীর সহিত বহু হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিতেন। এইভাবেই ভারতে উর্দুভাষার উদ্ভব হয়।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ-রচনাঃ এই যুগের সাহিত্যপ্রয়াস কেবলমাত্র ধর্মসম্বন্ধীয় রচনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; ইতিহাস-রচনার আগ্রহ সুলতানি যুগের আর একটি

বৈশিষ্ট্য। মিন্‌হাজ, জিয়াউদ্দীন বরণী, আসিফ প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক তাঁহাদের রচনায় সুলতানি যুগ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাদেশিক ভাষার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল। বাংলার স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী পাঁচখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মালাধর বসু ভাগবত অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য লিখিয়া 'গুণরাজস্থান' উপাধি লাভ করেন। কৃত্তিবাস গৌড়ের এক রাজার আদেশে বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। মুসলমান মনীষীদের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেন।

স্থাপত্যশিল্প ঃ এই যুগে ভারতে স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে বহু প্রাসাদ এবং মসজিদ নির্মিত হয়। দুইটি ভিন্ন সভ্যতার মধ্যে যখন সংমিশ্রণ ঘটিল, তখন দেখা গেল যে, ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প হিন্দু ও মুসলিম ভাবধারা ও গঠনরীতি সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। আরব, পারস্য অথবা তুরস্ক হইতে আগত মুসলমানগণ স্ব স্ব দেশ হইতে শিল্পপদ্ধতির নূতন নূতন ভাবধারা ও গঠনরীতি ভারতে প্রবর্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণে অধিকসংখ্যক হিন্দু শিল্পী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। হিন্দু শিল্পিগণ স্বভাবতঃই হিন্দু শিল্পরীতির অনুকরণ করিতেন। কখনও কখনও প্রয়োজন অনুসারে মন্দিরকেই সামান্য পরিবর্তন করিয়া মসজিদে পরিণত করা হইত। এইরূপে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীন ভারতীয় গঠনরীতির সহিত মুসলিম শিল্পরীতির মিশ্রণে এক নূতন ভারতীয় স্থাপত্যপদ্ধতির উৎপত্তি হইল।

দিল্লীর স্থাপত্যশিল্পে খাঁটি মুসলমান শিল্পরীতি অনুসৃত হইলেও প্রদেশগুলিতে স্থানীয় হিন্দুশিল্পের প্রভাব বেশি ছিল। প্রত্যেক প্রদেশেরই নিজস্ব শিল্পরীতি ছিল। জৌনপুর, বঙ্গদেশ ও গুজরাটের স্থাপত্যপদ্ধতি হিন্দু শিল্পরীতির দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়াছিল। কুতব্ মসজিদ ও কুতব্ মিনার দিল্লীর স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সময় হইতেই হিন্দু শিল্পীদের উপর মুশলিম ভাবধারার প্রাধান্য সূচিত হয়। পঞ্চদশ শতকে জৌনপুরে এক নূতন শিল্পপদ্ধতির উদ্ভব হয়। হিন্দুশিল্পের সৌন্দর্য-সুষমার সহিত মুসলিম জাঁকজমকের সমন্বয়ই হইল জৌনপুরী রীতি এবং অতাল মসজিদ এই শিল্পরীতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

সুলতানি আমলে এই মিশ্র স্থাপত্যশিল্প বঙ্গদেশে যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল।

বাংলার মুসলমান শাসনকর্তাগণ গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেন। এখানে স্থাপত্য-শিল্পে প্রধানতঃ ইষ্টক ব্যবহৃত হইলেও পরে প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। চারিশত গম্বুজ-শোভিত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ সিকন্দর শাহের আমলে নির্মিত হইয়াছিল। বিশালত্ব ও সৌন্দর্যের জন্য ইহা উল্লেখযোগ্য। গৌড়ে হোসেন শাহের সময়ে নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ এবং নসরৎ শাহ কর্তৃক নির্মিত বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল এবং বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মধ্যযুগের বিখ্যাত স্থাপত্য কীর্তি।

মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব হইতেই গুজরাটে একটি সুন্দর হিন্দু স্থাপত্যরীতির প্রচলন ছিল। পরে এখানে এক অভিনব শিল্পরীতির উদ্ভব হয়। মুসলমানগণ এখানে যে সব অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দু গঠনরীতির প্রভাব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। আহ্‌মদাবাদের প্রাসাদসমূহ এবং জাম-ই-মসজিদ উৎকৃষ্ট গুজরাটি স্থাপত্যের নিদর্শন। গুলবর্গার জাম-ই-মসজিদ, দৌলতাবাদের চাঁদমিনার এবং বিজাপুরের মুহম্মদ আদিল শাহের সমাধিসৌধ গোলগম্বুজ দাক্ষিণাত্যের মুসলিম স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে বিজয়নগরের অবদান হিন্দু-ভারতের এক বিরাট গৌরব ও মহান ঐশ্বর্য।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ এই যুগে ভারতের বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিতে হয়। সুলতানি শাসনের সময়ে ভারতের সকল অংশের শাসন-ব্যবস্থা, সমাজ বা সংস্কৃতি একই রূপ ছিল না কিংবা একই গতি ধরিয়া চলে নাই। প্রত্যেক অংশেই অল্প-বিস্তর স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। সুলতানি যুগের শেষভাগে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়; যথা—উত্তর-ভারতে জৌনপুর, কাশ্মীর, মালব ও বঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে খান্দেশ, বাহ্‌মনী রাজ্য ও বিজয়নগর। পরবর্তী কালে বাহ্‌মনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বেরার, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও বিদর এই পাঁচটি রাজ্য উদ্ভূত হইয়াছিল।

বাংলাদেশ দিল্লী হইতে দূর ছিল বলিয়া এখানে দিল্লীর সুলতানদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই। আমীর খুসরু এবং অন্যান্য বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর ভালই ছিল। ইহারা সকলেই বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তখন সমগ্র ভারতে গুজরাট ও বাংলা বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের

সূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইত। পর্যটক বার্থেমা সুলতানি যুগের বাংলাকে বস্ত্র ও খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যের জন্য পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইব্নবতুতাও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। সুলতানি আমলে বাংলাদেশে জনসাধারণের খাওয়া-পরার কোন অসুবিধা ছিল না বটে, কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা খুব উন্নত ছিল না। জনৈক চীনা পর্যটক এই সময়কার বাঙালির সাংস্কৃতিক পারদর্শিতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মতে হুসেন শাহের আমলেই বাংলার গৌরব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এ ছাড়া পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত এই সময়ে বাংলাদেশের যথেষ্ট বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল। এই যুগে বাংলার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর উন্নত ছিল, তবে সকল শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা এক পর্যায়ের ছিল না। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি এই সময়কার বাংলার সমাজজীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। হুসেনসাহী সুলতানদের রাজত্ব-কালে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদবৈষম্য করা হইত না; বহু হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারীপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মোট কথা, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক—সকল ক্ষেত্রেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির সুফল পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাই ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, হুসেন শাহের রাজত্বকাল ছিল বাংলার এক গৌরবময় যুগ।

বিজয়নগর রাজ্য ঃ দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে বিজয়নগর রাজ্যের (১৩৩৬-১৫৬৫ খৃঃ) উদ্ভব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুহম্মদ তুঘ্লকের রাজত্বকালের বিশৃঙ্খলার সময়ে এই রাজ্যের উদ্ভব হয়। একাদিক্রমে তিনশত বৎসরকাল বিজয়নগরের রাজগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন। সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ ও আরবিড়ু—পর পর এই কয়টি হিন্দু রাজবংশ বিজয়নগরে রাজত্ব করেন। সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন দেবরায়। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বিজয়নগরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া যিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তিনি হইলেন তুলুভ বংশের কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৫-১৫৩০ খৃঃ)। কৃষ্ণদেবের রাজত্বকাল দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল

অধ্যায়। তাঁহার আমলেই বিজয়নগর রাজ্যের সমধিক প্রসার ঘটে এবং তাঁহার সময়েই এই রাজ্য সকল দিক দিয়া গৌরব ও সমৃদ্ধির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

বিজয়নগরের ইতিহাস প্রধানতঃ যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস হইলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই রাজ্য যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সাম্রাজ্যটি প্রায় দুইশত প্রদেশে বিভক্ত ছিল। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে প্রদেশগুলি প্রায় স্বাধীন ছিল। প্রজার মঙ্গল ও জনমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালিত হইত। সমাজ-জীবনের সকলক্ষেত্রেই পুরুষের সহিত নারী সমান অধিকার ভোগ করিত, এমন কি তাহারা রাজকার্যেও নিযুক্ত হইত। মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে কুস্তি ও তলোয়াঁর খেলা এবং নৃত্যগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। কৃষি ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। বিজয়নগরের গৌরব বহু বৈদেশিক পর্যটককে এখানে আকর্ষণ করিত। তাঁহাদের বিবরণ হইতে বিজয়নগরের শক্তি-সমৃদ্ধির কথা ও অন্যান্য বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। রাজার সীমাহীন ক্ষমতা ও প্রতাপ এবং রাজধানী বিজয়নগরের ঐশ্বর্য দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন।

বিজয়নগরের রাজগণ প্রায় সকলেই সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন, সেইজন্য বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা এখানে নির্বিবাদে বাস করিত। শিল্প ও সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ এইখানে সাধিত হইয়াছিল। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য ও তাঁহার ভ্রাতা মাধব বিদ্যারণ্য ছিলেন বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। রাজাদের প্রেরণায় ও আনুকূল্যে সংস্কৃত এবং লৌকিক ভাষা উভয়েরই পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং ছিলেন একজন পণ্ডিত ও কবি। অমর সুরকার ত্যাগরাজ দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক জীবনে এক মহান প্রেরণা। বিজয়নগরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-কীর্তির প্রায় সবই পরবর্তী কালে মুসলমান আক্রমণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বাহ্‌মনী রাজ্য: দিল্লীর সুলতানি শাসনের ধ্বংসের পর যে সকল স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মনী রাজ্য (১৩৪৭-১৫২৬ খৃঃ) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। আলাউদ্দীন বাহ্‌মন শাহ ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্য চারিটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল; যথা—দৌলতাবাদ, গুলবর্গা, বেরার ও বিদর। গুলবর্গা ছিল বাহ্‌মনী

রাজ্যের রাজধানী। বিজয়নগর ও বাহ্মনী—দাক্ষিণাত্যের এই দুইটি রাজ্য সমসাময়িক এবং দীর্ঘকাল এই দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াছিল। পরবর্তী কালে গৃহবিবাদের ফলে বাহ্মনী রাজ্যের পতন হয় এবং উহার স্থলে পাঁচটি স্বাধীন স্থলতানি রাজ্যের উদ্ভব হয়; যথা—বিজাপুর, বেরার, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর ও বিদর।

বাহ্মনী বংশে চৌদ্দজন রাজা দেড়শত বৎসরের অধিককাল এই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বাহ্মনী-স্থলতান তৃতীয় মুহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মামুদ গাওয়ান। ইঁহার দক্ষতায় রাজ্যের সীমা অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে বিচার-বিভাগের সংস্কারসাধন হয়। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্থলতান ফিরুজ শাহের আমলে রাজধানী গুলবর্গা বহু স্থরম্য প্রাসাদ ও মসজিদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে নিকিতিন নামক রুশদেশীয় এক বণিক বাহ্মনী রাজ্য পরিদর্শন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ওমরাহ্‌গণ অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও বিলাসী ছিলেন; কিন্তু জনসাধারণ দুঃখকষ্টে জীবন যাপন করিত। বাহ্‌মনী রাজ্যের বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। বিদর শহরটি ছিল খুব জনসমাকীর্ণ।

অনুশীলনী

1. Give an account of society and culture of India in early Muslim days.

মুসলমান যুগের প্রথম আমলের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বর্ণনা কর।

2. What was the condition of the people under the Sultanate of Delhi?

দিল্লীর স্থলতানি আমলে দেশের লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল?

3. Describe the inter-action between Hindu and Muslim culture in early Muslim days.

মুসলমান যুগের প্রথম আমলে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ও সমন্বয় বর্ণনা কর।

4. Describe the social and economic condition of Vijayanagar and Bahamoni kingdoms.

বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মোগলযুগে ভারতবর্ষ

মোগল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত : বাবর—দিল্লীর স্থলতানির সর্বশেষ স্থলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। তাঁহার শাসনকালেই ভারতবর্ষে যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, রাজনৈতিক অনৈক্য এবং পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহার স্থযোগ গ্রহণ করেন ভাগ্যান্বেষী মোগল-বীর জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর। স্থতরাং মোগল যুগের ভারতবর্ষের কথা জানিতে হইলে তৎপূর্বে কেমন করিয়া ভারতে এই মোগল শক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিতে হইবে। দিল্লীর স্থলতানির যখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, বাবর তখন কাবুলের আমীর। বহুদিন হইতেই তাঁহার ভারতজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। স্থলতান ইব্রাহিম লোদীর শাসন যখন অত্যাচারের সীমা ছাড়াইয়া গেল তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং ইব্রাহিমের পিতৃব্য আলম খাঁ স্থলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চাহিলেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহাদিগকে সামরিক সাহায্য প্রদান করিবার জন্য তাঁহারা বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্থচতুর বাবর এই স্থযোগকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করিয়া ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া লাহোর অধিকার করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে পানিপথের যুদ্ধে স্থলতান ইব্রাহিম লোদীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। ইহাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬ খৃঃ) এবং ইহাই ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা। ইতিহাসের ধারায় এইবার ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হইল।

রাজপুত শক্তির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাবর যখন ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন তখন মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহও দিল্লীর স্থলতানির দুর্বলতার স্থযোগে ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বাবর যখন পাঞ্জাবের পথে ভারতে প্রবেশ করেন, তখন সংগ্রামসিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অনেক রাজপুত রাজা ও কয়েকজন আফগান সর্দার সংগ্রামসিংহের সহিত যোগ দিলেন। আগ্রার পশ্চিমে খানুয়ার প্রান্তরে

উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল (১৫২৭ খৃঃ)। বাবরের ছিল সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য আর কামান। রাজপুত সৈন্য ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিল না—রাণা পরাজিত হইলেন। যে সকল যুদ্ধের ফলাফল ভারতের ভাগ্যনির্ণয় করিয়াছে খানুয়ার যুদ্ধ তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

এইভাবে বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু তিনি উহাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের আমলে আফগান নেতা শের শাহ্ দিল্লীর সিংহাসন সাময়িকভাবে অধিকার করেন এবং হুমায়ুন দেশ হইতে বিতাড়িত হন। কিন্তু শের শাহের মৃত্যুর পরে ইহার আমূল পরিবর্তন ঘটে। হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, কিন্তু সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন বা সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন কোনোটাই তাঁহার দ্বারা হয় নাই। সেই কার্য সম্পন্ন করেন আকবর। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তিনিই।

আকবর ও তাঁহার শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব—হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিখ্যাত পুত্র আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৫৬ খৃঃ)। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। হুমায়ুনের প্রবীণ সেনাপতি বৈরাম খাঁ নাবালক সম্রাটের অভিভাবকরূপে কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর সুযোগে শের শাহের পুত্র আদিল শাহের হিন্দু মন্ত্রী হিমু দিল্লী ও আগ্রা দখল করিয়াছিলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করিয়া আকবর স্বীয় প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা লইয়া গঠিত এক ক্ষুদ্র রাজ্যকে আকবর স্বীয় প্রতিভাবলে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। মোগল সাম্রাজ্য তাঁহার আমলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে দ্রুত বিস্তারলাভ করে।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে তাঁহার শাসনকাল নানা দিক দিয়া এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। আকবরের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশ জয় করিলেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না—সকল প্রজার প্রীতি ও সহযোগিতার ফলেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে। এজন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর প্রজার হিতসাধন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার শাসনকালেই সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতি সাধিত হইয়াছিল। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। জাতিবর্ণ-

নির্বিশেষে প্রজাবর্গের সমান অধিকার-ভোগ আকবরের রাজত্বকালেই সম্ভব হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য আকবর স্বয়ং রাজপুত রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যুবরাজ সেলিমেরও এক রাজপুত রমণীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

ধর্মমতে আকবর ছিলেন পরম উদার প্রকৃতির। যৌবনে স্থফী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ধর্মের প্রকৃত সারমর্ম উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। প্রকাশ্যে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার স্থযোগ দিবার জন্য ফতেপুর সিক্রিতে তিনি একটি উপাসনাগৃহ স্থাপন করেন। এখানে হিন্দু, ইসলাম, জৈন, পার্শি ও খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের ধর্মযাজকগণ মিলিত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেন। আকবর প্রত্যেক ধর্মের আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। এই আলোচনা হইতেই আকবরের একেশ্বরবাদী বা দীন্-ইলাহী ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই ধর্মের দ্বারা তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে এক নূতন ধর্মের ঐক্যে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। সকল ধর্মের সার সংগ্রহ করিয়া এই ধর্মমত গঠিত হইয়াছিল; আকবর কিন্তু এই নূতন ধর্মমত গ্রহণ করিতে কাহাকেও বাধ্য করেন নাই।

আকবর

শাসন-ব্যবস্থা—আকবর এক স্থসংবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। স্থলতানি শাসন-ব্যবস্থার স্থলে দেশীয় ও বিদেশীয় শাসনপদ্ধতির সমন্বয় ও সংমিশ্রণ দ্বারা তিনি এই স্থদক্ষ শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল উদারতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং প্রজার মঙ্গলসাধন। শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন বাদশাহ স্বয়ং। তিনি সমস্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন। সামরিক ও অসামরিক সকল বিভাগের উপরই আকবরের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে আকবর স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যের মঙ্গলসাধনের জন্যই স্বেচ্ছাচার প্রয়োগ করিতেন। কেন্দ্রীয় শাসনের পুরোভাগে ছিলেন সম্রাট, কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিভাগের

প্রত্যক্ষ পরিচালন-দায়িত্ব কয়েকজন সচিবের উপর ন্যস্ত ছিল। 'দেওয়ান' রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন। 'মীরবক্সী' ছিলেন বেতনমঞ্জুরী বিভাগের দায়িত্বে। 'মীরকয়াস' ছিলেন কারখানাসমূহের অধ্যক্ষ এবং প্রধান 'সদর' ছিলেন ধর্ম, বিচার ও দাতব্য বিভাগের কর্তা। 'খান-ই-খানান' রাজপ্রাসাদের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান করিতেন। 'কাজী-উল্-কাজী' বা প্রধান কাজী ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী। ভূমি-রাজস্বের সংস্কার আকবরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই বিরাট কার্য তাঁহার বিখ্যাত রাজস্বসচিব দেওয়ান-ই-আসরফ্ রাজা টোডরমলের প্রতিভার নিদর্শন। টোডরমল অবশ্য এই ব্যাপারে শের শাহের রাজস্বনীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। আকবরের রাজস্ব-ব্যবস্থা সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

প্রাদেশিক শাসনে ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগের ভার বিভিন্ন কর্মচারীর উপর দেওয়া হইত। সুবাদার শাসন ও সামরিক বিভাগের কর্তা ছিলেন, কিন্তু রাজস্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন দেওয়ান।

আকবরের আমলে বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল। বিচারকার্যে সততা ও আইনের চক্ষে সমতা—ইহাই ছিল আকবরের নীতি। আকবরের শাসন-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল মন্‌সব্‌দারী প্রথার প্রবর্তন। কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে শক্তিশালী করিবার জন্য আকবর জায়গীর-প্রথা লোপ করিয়া মন্‌সব্-প্রথার প্রবর্তন করেন। দশ জন হইতে আরম্ভ করিয়া দশ হাজার পর্যন্ত সৈন্য লইয়া এক-একটি মন্‌সব্ গঠিত হইত। প্রত্যেক দলের দলপতিকে মন্‌সব্‌দার বলা হইত। যুদ্ধের সময়ে ইহারা সৈন্য লইয়া সম্রাটকে সাহায্য করিতেন। এই প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আকবরের সামরিক বিভাগ শক্তিশালী ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। মোট তেত্রিশ পর্যায়ের মন্‌সব্‌দার ছিলেন।

সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ এইবার আমরা মোগলযুগে ভারতের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা করিব। দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতির পরস্পর সমন্বয় মোগল-পূর্ব যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু মোগল যুগে, বিশেষ করিয়া আকবরের শাসনকালেই আমরা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় লক্ষ্য করি। মোগলযুগের সমাজ ছিল মূলতঃ

সামন্ত-তান্ত্রিক। সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়েরই সম্মান ছিল বেশি, অন্যদিকে ইহাদের অধিকাংশই ঐশ্বর্যপূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত জীবন যাপন করিতেন। ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যাপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তাও বড় কম ছিল না। মধ্যবিত্ত সমাজ সংখ্যায় ছিল অল্প এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল না; তবে ইহারা দুর্নীতি হইতে মুক্ত ছিল। আর সাধারণ লোকের অবস্থা এই দুই শ্রেণীর তুলনায় ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বড়লোকে গরীবের উপর অত্যাচার করিত। দেশে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য-প্রথা ও বরপণ-প্রথা প্রচলিত ছিল।

মোগল-যুগে কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সিস্কো পেলসার্টের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া সমাজের প্রায় বাকী সব মানুষই ছিল দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত এবং ইহাদের বিরাট অংশ ছিল কৃষক ও শ্রমজীবী। ইহাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না; দিনের পর দিন ইহারা কঠোর শ্রম করিয়া যাইত এবং সেই শ্রমের ফল দিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য-বিলাসের পুষ্পশয্যা রচিত হইত। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আকবর এই প্রথা দুইটি রহিত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। হিন্দু সমাজের নৈতিকতা সম্পর্কে ট্যাভার্ণিয়ে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

এই যুগে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে; শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর প্রাচুর্যই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবুল ফজলের আইন্-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে ধান, যব, গম, ডাল, ইক্ষু, তুলা, তিসি প্রভৃতি বহুবিধ শস্য উত্তর-ভারতে উৎপন্ন হইত। বাংলা দেশে চিনি এত প্রচুর উৎপন্ন হইত যে, উহা অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি হইত। শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদি এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত যে সমগ্র দেশের চাহিদা মিটাইয়াও বিদেশে রপ্তানি করা চলিত। বারাণসী, জৌনপুর, পূর্ববঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। সায়েস্তা খাঁর আমলে বাংলাদেশে দুই আনায় একমণ চাউল বিক্রয় হইত—এই একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হইতেই অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশ হইতে নীল, সোরা, রেশমবস্ত্র, সূতীবস্ত্র, মসলিন, চিনি, আফিং ইত্যাদি বিদেশে চালান যাইত, আর বিদেশ হইতে আসিত সোনা, ঘোড়া, হাতীর দাঁত ও

মণিমুক্তা। মসলিপত্তম্, স্থরাট, বোম্বাই, কালিকট, চট্টগ্রাম, ভারুচ প্রভৃতি ছিল মোগলযুগের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দর। ঔরংজেবের রাজত্বকালে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

শিল্প ও সাহিত্য ঃ শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মোগলপূর্ব যুগে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের স্থচনা হইয়াছিল, মোগলযুগে, বিশেষ করিয়া সম্রাট আকবরের আমলে তাহা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আকবর শিল্প ও স্থাপত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মোগলযুগে মুসলিম ও হিন্দু শিল্পরীতির সংমিশ্রণে এক নূতন স্থাপত্য-রীতির প্রচলন হয়। স্থাপত্যশিল্পে পারসিক শিল্পরীতি ও হিন্দু শিল্পরীতির সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে ইহাই 'হিন্দু-পারসিক' (Indo-Sarasenic) শিল্পরীতি নামে খ্যাত।
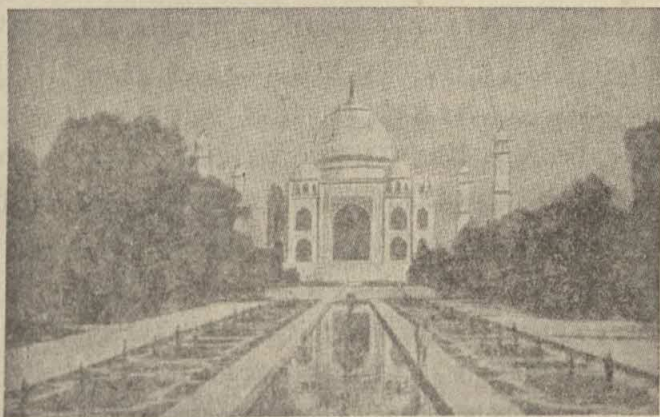
তাজমহল

আকবরের পূর্ববর্তী দুইজন মোগল সম্রাটের শিল্পকীর্তি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। আকবরের রাজত্বকালেই স্থাপত্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তিনি কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার সময়ে কতকগুলি দুর্গ, সরাই, বিদ্যালয় ইত্যাদিও নির্মিত হইয়াছিল। আকবরের শিল্পকীর্তিগুলির মধ্যে

ফতেপুর সিক্রি, হুমায়ুনের সমাধি, ইবাদৎখানা, বুলন্দ দরওয়াজা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধটির পরিকল্পনা তাঁহার জীবদ্দশায়ই প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালেই মোগল স্থাপত্যশিল্পের চূড়ান্ত উৎকর্ষ হয়। আলঙ্কারিক শিল্পকৌশলে শাহজাহানের শিল্পকীর্তিগুলিই শ্রেষ্ঠ। শাহজাহানের আমলের দেওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, জামি মসজিদ প্রভৃতি বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শিল্পকীর্তি হইল তাজমহল। পরবর্তীকালে ঔরংজেবের ধর্মান্ধতার ফলে মোগল স্থাপত্য-শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছিল।

মোগলযুগে স্থাপত্য শিল্পের ন্যায় চিত্র শিল্পেও ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় (চীন, ইরান, গ্রীক ও মোঙ্গলীয়) রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। বহির্ভারতীয় পদ্ধতি প্রধানত মুসলমানদের সহিত ভারতে আসিয়াছিল। চিত্রাঙ্কণ রীতির এই সংমিশ্রণেরই ফল মোগল চিত্র। মোগলযুগে আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়েই চিত্রকলার সমধিক উন্নতি হয়। জাহাঙ্গীরের সময়ে মোগল-চিত্রকলায় পারসিক-প্রভাব-মুক্ত ভারতীয় শিল্পরীতির প্রচলন আরম্ভ হয়। সমসাময়িক কালে রাজপুত চিত্রশিল্পও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজপুত চিত্ররীতিতে রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা হইত।

চিত্রশিল্পে যেমন, সঙ্গীতেও তেমন মোগলযুগের প্রসিদ্ধি আছে। ঔরংজেব ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত মোগল বাদশাহগণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতবিদ্যার প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, আকবরের দরবারে তানসেন-সহ ছত্রিশজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন।

সাহিত্যের উন্নতি ঃ মোগল সম্রাটগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবর স্বয়ং আরবী, ফার্সী এবং তুর্কী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কবিতা রচনা করিতেন। সমসাময়িককালে বাবরের আত্মজীবনী প্রাচ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। হুমায়ুনও সুপণ্ডিত ছিলেন। বহু কবি ও দার্শনিক তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। হুমায়ুনের কন্যা গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। জাহাঙ্গীর নিজের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তবে আকবরের শাসনকালেই ভারতে বহুসংখ্যক বিদ্বান ও মনীষী ব্যক্তির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকাল হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। তাঁহার সময়ে বহু পণ্ডিত নানাবিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া-

ছিলেন। আকবরের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি মাধবাচার্য আকবরের সাহিত্যানুরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আকবরের সময়ে তিনশ্রেণীর সাহিত্যের বিশেষভাবে অনুশীলন হইত—ইতিহাস, অনুবাদ-সাহিত্য ও কবিতা। কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আকবরের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মোল্লা দায়ুদ, আবুল ফজল, বদায়ুনী, নিজামুউদ্দীন আহম্মদ প্রভৃতি খুব প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজল একাধারে কবি, সমালোচক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত ছিলেন।

মোগল যুগে (বিশেষ করিয়া আকবরের সময়ে) সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিত মহাভারতের বিভিন্ন অংশের ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বদায়ুনী রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজী 'লীলাবতী' নামক গণিত শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন। আকবরের সময়ে কয়েকজন লোক গদ্য ও পদ্য সাহিত্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। খিজালী সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ফৈজীও খুব বড় কবি ছিলেন। মোগলযুগে কেবলমাত্র ফার্সী সাহিত্যেরই উৎকর্ষ হয় নাই, প্রাদেশিক সাহিত্যও সবিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হিন্দী সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ। মালিক মুহম্মদ জায়সী হিন্দী সাহিত্যের সর্বপ্রথম লেখক। আকবরের হিন্দী কাব্যপ্রীতির ফলে হিন্দী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। অন্ধকবি সুরদাস ও অমরকবি তুলসীদাস তাঁহার সময়েই খ্যাতি লাভ করেন। তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী বর্ণনা করিয়া 'রামচরিত মানস' বা রামায়ণ রচনা করেন। তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দী সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে। কাব্য-সাহিত্যের অধিকাংশই ধর্মসম্বন্ধে লিখিত হইত। রামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারাই ছিলেন হিন্দী কবিতার বিষয়। মোগলযুগে বাংলাদেশেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; এই সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস অবশ্য বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা জয়ানন্দ ও লোচনদাস, 'চৈতন্যভাগবত'-প্রণেতা বৃন্দাবন দাস, 'ভক্তি রত্নাকর'-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থকার। ইহা ছাড়া কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', কেতকা দাসের 'মনসামঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের

সমৃদ্ধির পরিচয়ই বহন করে। এই সাহিত্যসৃষ্টি, বলা বাহুল্য, রাজানুকূল্যেই সম্ভব হইয়াছিল।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, সমগ্র মোগল যুগে রাজনৈতিক ঐক্য ও সম্প্রীতির পাশাপাশি একটি সর্বাত্মক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছিল।

সার টমাস রো, বার্ণিয়ার প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা মোগল যুগের রাজদরবারের ও সেকালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

অনুশীলনী

1. Give an account of the importance of Akbar in the history of India.

ভারত-ইতিহাসে আকবরের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

2. Give a brief account of the Mughal system of administration—art and architecture—society and economic conditions and literature.

মোগল যুগের শাসন প্রণালী—শিল্প ও স্থাপত্য—সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মোগল যুগের অবসান ঃ ইউরোপীয়দের অভ্যুদয়

মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঃ বাবর হইতে ঔরংজেব—ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভারতে মোগলযুগ এবং ইহার পরই মোগলদের গৌরবসূর্য অস্তমিত হইতে আরম্ভ করে। সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ধর্ম-নিরপেক্ষ উদার জাতীয় শাসনের স্থলে ধর্মান্ধ সঙ্কীর্ণ নীতির অনুসরণ ও বহিরাক্রমণ ইহাই প্রধানত মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। আকবর এই বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহা রক্ষা ও শাসন করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রবর্তিত শাসনপ্রণালীর কাঠামোই পরবর্তী মুসলমান সম্রাটগণ মোটামুটি মানিয়া চলিয়াছেন। কালক্রমে নানা কারণে শাসন কাঠামো বজায় থাকিলেও শাসন প্রণালীর আদর্শে বিভ্রাট ঘটে। আকবরের সময় হইতেই মোগল শাসনের রূপ ছিল স্বেচ্ছাতন্ত্রী। এই জাতীয় শাসনের ভালমন্দ নির্ভর করে রাজার ব্যক্তিত্ব, ধর্মাদর্শ, চরিত্র ইত্যাদির উপর। আকবরের আমলে যোগ্যব্যক্তিরা সুবাদারী, মন্‌সব্‌দারী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি পাইতেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান বিচার করিয়া পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করিতেন না। জাহাঙ্গীর দুর্বলচিত্ত হইলেও শাসক হিসাবে ভালই ছিলেন; কিন্তু শাহ্‌জাহান স্বেচ্ছাতন্ত্রের অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। শাহজাদাদের সুবাদার করা বা মন্‌সব্‌দার করা এবং প্রজাপীড়ন করিয়া তাঁহার নিজস্ব আড়ম্বরের অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয়বিধ শাসন বিভাগে স্বৈরাচার প্রবর্তন করেন। পূর্বে উচ্চ রাজ-কর্মচারীরা দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন বা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন, কিন্তু সম্রাট শাহ্‌জাহানের আমলে তাঁহাদের সৎ উদ্যম নষ্ট হইয়া যায়। ফলে শাসন-কার্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়।

ঔরংজেবের আমলে অবস্থা চরমে উঠিল। তিনি পুরাপুরি স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ তাঁহার আদর্শের বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো নীতির বাধা তিনি মানিতেন না এবং কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার শাসনকালেই মোগল সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

আবার তাঁহারই কৃতকর্মের ফলে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনের পালা আরম্ভ হয়। ইহার মূলে ছিল ঔরংজেবের অনুসৃত ধর্মনীতি, তাঁহার উৎকট হিন্দুবিদ্বেষ ও অন্ধ সাম্রাজ্যলিপ্সা। আকবর যেমন মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা হিন্দু তথা রাজপুতজাতির আনুগত্য ও মিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন, ঔরংজেব তেমন গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই ঐক্যবোধ বিনষ্ট করেন। তাঁহার সংকীর্ণ নীতির কুফল তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছিলেন। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন যখন শিথিল হইয়া পড়িল, তখন দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে একে একে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইতে লাগিল। ক্রমে দিল্লীর নিকটবর্তী অযোধ্যা, এমন কি দিল্লীর উপকণ্ঠে জাঠগণও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ঔরংজেবের সময়ে মারাঠাশক্তির অভ্যুদয়ও মোগলসাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন : ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি যখন এইভাবে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল তখনই ইউরোপীয় বণিকগণ (ইংরেজ, ফরাসী ইত্যাদি) সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হইল। প্রাদেশিক স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে তখন পারস্পরিক বিরোধ চলিতেছে। সেই সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসীগণ ভারতে রাজ্য বিস্তার করিতে কৃতসংকল্প হইল।

ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের অভ্যুদয় বাণিজ্যের সূত্রেই ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহু প্রাচীন। এই সম্পর্ক ছিন্ন হয় সপ্তম শতাব্দীতে। তখন আরব শক্তির অভ্যুদয়ের ফলে মিশর, পারস্য ইত্যাদি দেশ তাহাদের অধিকারে চলিয়া যায় এবং তখন হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের সরাসরি বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। তারপর মধ্যযুগের শেষভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হইল এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের বণিক সম্প্রদায় প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হইল। এই পর্যায়ে পর্তুগীজরাই প্রথমে ভারতে আসেন।

পর্তুগীজ বণিকগণ : পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৯৮ খৃঃ) পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে আসিবার নূতন একটি জলপথ আবিষ্কার করেন। তিনি দক্ষিণ-ভারতে মালাবার উপকূলস্থিত কালিকট বন্দরে আসিয়া উপস্থিত

হন। নূতন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় পর্তুগীজ বণিকগণ ভারতে আসিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। কালিকটে তাহাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। ইহার পর সমুদ্রপথে আরব-বণিকদের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া দিয়া এগার বৎসরের মধ্যেই ভারতে পর্তুগীজ শক্তিবৃদ্ধির ইতিহাস আরম্ভ হয়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে আলবুকার্ক ভারতে পর্তুগীজদের শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভারতে পর্তুগীজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বিজাপুর রাজ্যের অধীন গোয়া বন্দর অধিকার করেন এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া ঐ স্থানকে ভারতে পর্তুগীজ শক্তির কেন্দ্র করিয়া তোলেন। তারপর মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত মালাক্কা দ্বীপ এবং পারস্যোপসাগরস্থ অরমুজ দ্বীপ অধিকার করিয়া প্রাচ্যে পর্তুগীজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে (১৫৫১ খৃঃ) পর্তুগীজ নৌশক্তি ভারতে সর্বপ্রধান হইয়াছিল। পর্তুগাল হইতে এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক ঔপনিবেশিক প্রেরণ করিবার অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া অলবুকার্ক পর্তুগীজগণকে ভারতীয় নারী বিবাহ করিতে উৎসাহিত করেন।

অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদল: ক্রমে ভারতের পশ্চিম উপকূলে দিউ, দমন, সলসেটি, বেসিন ও বোম্বাই, পূর্ব উপকূলে স্যানথোম এবং বাংলাদেশে হুগলী ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সিংহলের অধিকাংশ স্থানেও তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ও ইংরেজগণ ভারতে শক্তিশালী হইয়া উঠিলে পর্তুগীজ প্রাধান্য হ্রাস পাইতে থাকে। কালক্রমে দিউ, দমন ও গোয়া ব্যতীত অন্যান্য স্থানগুলি তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের ব্যবসায়ক্ষেত্রে পর্তুগীজদের প্রভাব একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরই একে একে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকদের ভারতে আগমন হইল। ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ইউরোপে এই সময়ে কয়েকটি কোম্পানী গঠিত হয়, যথা— ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬০০ খৃঃ); (২) ডাচ্ (ওলন্দাজ) ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬০২) ও (৩) ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬৬৷ খৃঃ)।

এই সকল ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া লাভবান হওয়া। এইজন্য ইহাদের মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। তদুপরি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাই তাহাদের ব্যণিজ্যিক প্রতিযোগিতা প্রবল করিয়া তুলিল। ইহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ,

পর্তুগীজ ও ইংরেজ এবং ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মধ্যে বিরোধ চলিতে থাকে। ওলন্দাজ কোম্পানী প্রথমে পর্তুগীজদের অধিকার হইতে মালাক্কা হস্তগত করিয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য বিস্তার করে। সিংহল দ্বীপও পর্তুগীজদের হস্তচ্যুত হইয়া ইহাদের অধিকারে আসে। এদিকে বাংলাদেশে চুঁচুড়ায়, মাদ্রাজ উপকূলে পুলিকাট ও নেগাপট্টমে এবং গুজরাট প্রদেশে সুরাটে তাহারা কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু ওলন্দাজগণ প্রধানত মালয় দ্বীপপুঞ্জেই অধিকার বিস্তারে প্রয়াসী হয়। অবশেষে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইবার পর ভারতে ওলন্দাজ শক্তি নষ্ট হয়।

ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রাধান্য ঃ ইহার পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল ইংরেজ ও ফরাসী এই দুই শক্তির মধ্যে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেই ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার এক সনদ লাভ করে। ভারতে আসিয়া ইংরেজগণ প্রথমে পর্তুগীজদের নিকট প্রবল বাধা পায়। পরে একটি নৌযুদ্ধে পর্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরেজগণ দিল্লীর বাদশাহের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। জাহাঙ্গীর ইংরেজগণকে সুরাটে স্থায়িভাবে একটি বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে)। তারপর ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ স্যার টমাস রো-কে রাজদূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন। রো বাদশাহের নিকট হইতে ইংরেজদের জন্য কতকগুলি বাণিজ্য-সংক্রান্ত সুবিধা আদায় করেন। ইহার তেইশ বৎসর পরে সম্রাট শাহ্‌জাহানের আদেশে হুগলীর পর্তুগীজ কুঠি বিনষ্ট করা হয়, ফলে বাংলায় ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ইহার পর ইংরেজগণ পূর্ব-উপকূলে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বন্দর মসলিপত্তনে এক কুঠি স্থাপন করে। এখানে ইংরেজ কুঠিয়ালরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। পরে তাহারা চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে করমণ্ডল উপকূলে কিছু জমি ইজারা লইলেন (১৬৩৯ খৃঃ)। এইখানে ইংরেজদের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ নামক এক দুর্গ স্থাপিত হয়। ইহাই ভারতে ইংরেজের তৈরি প্রথম দুর্গ। পরবর্তী কালে এই দুর্গকে কেন্দ্র করিয়াই মাদ্রাজ শহরটি গড়িয়া উঠে।

তারপর ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ পর্তুগালের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া যৌতুক হিসাবে ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বোম্বাই দ্বীপ লাভ করেন;

তিনি ইহা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বার্ষিক দশ পাউণ্ড খাজনায় ইজারা দেন। এই-ভাবে পশ্চিম উপকূলে বোম্বাইতে ইংরেজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইল। ইহার শাসন ও রক্ষণের ব্যবস্থাও ইংরেজের উপরে ন্যস্ত ছিল। কয়েক বৎসর পরে কোম্পানী বোম্বাইতে নিজস্ব মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন করিবার অধিকার লাভ করে (১৬৭৬ খৃঃ)। ভারতে ইহাই ইংরেজের প্রথম মুদ্রা-নির্মাণ প্রয়াস। ক্রমে উত্তর-পূর্বদিকে ইংরেজদের প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় কটকের নিকট হরিহরপুর এবং বালেশ্বরে কুঠি স্থাপিত হয়। পরে বাংলাদেশের হুগলী, ঢাকা, মালদহ, পাটনা ও কাসিমবাজারে ইংরেজকুঠি স্থাপিত হয়।

এই সময়ে বাংলাদেশে ইংরেজের সহিত মোগলের যে সংঘর্ষ বাধে, সে ইতিহাসও আমাদের কিছু জানা দরকার। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ ইংরেজ বণিকদের বাংলা দেশে বিনা শুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি দান করেন। তারপর ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ঔরংজেবের শাসনকালে কয়েকটি সর্তে তাহাদিগকে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু বিরোধ বাধিত স্থানীয় রাজকর্মচারীদের সহিত এবং এই অবস্থার প্রতিকার করিবার জন্য ইংরেজ বণিকগণ হুগলীর বাণিজ্যকুঠি একটি দুর্গে পরিণত করিতে সচেষ্ট হয়। এই সূত্রেই মোগলের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং অবশেষে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য কর্তৃক ইংরেজগণ বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত হন। কিন্তু জব চার্ণক নামক জনৈক বিচক্ষণ কুঠিয়াল ইংরেজ পুনরায় মোগল সাম্রাজের অনুমতিক্রমে সুতানুটি নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক চট্টগ্রাম আক্রান্ত হইলে ইঙ্গ-মোগল মনোমালিন্য আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। জব চার্ণকও তখন কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে বোম্বাইয়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সহিত ঔরংজেবের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তির সর্তানুসারে জব চার্ণককে বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে সুতানুটিগ্রামে একটি কুঠি স্থাপন করেন। বর্তমান কলিকাতার শোভাবাজার অংশই পূর্বে সুতানুটি নামে পরিচিত ছিল। ইহার নিকটেই ছিল ভাগীরথী (হুগলী) নদী। হুগলী নদীর তীরে এই কুঠি স্থাপনই প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা নগরীর ভিত্তিস্থাপনের সূচনা করিয়াছিল। ইহার প্রায় আট বৎসর পরে ইংরেজগণ সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের

জমিদারী-স্বত্ব ক্রয় করে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে একটি দুর্গ নির্মিত হইল; তখনকার ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে দুর্গটির নাম রাখা হইল 'ফোর্ট উইলিয়ম'। এইরূপে ভারতে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি স্থানে ইংরেজদিগের তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল।

ইহার কিছুকাল পরে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া ইংরেজগণ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিবার পর দ্বিতীয় আর একটি কোম্পানী ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য করিবার জন্য ভারতে আসিল। নয় বৎসর পরে এই দুইটি কোম্পানী সম্মিলিত হইয়া ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত হয়। এই কোম্পানীই পরবর্তী কালে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

ফরাসী বণিকদের আগমন ঃ রাজনৈতিক প্রাধান্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা ঃ
ইংরেজ বণিকদের অনেক পরে ফরাসীগণ ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইল। তখন চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকাল। এই কোম্পানী ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সুরাটে এবং পর বৎসর মসলিপত্তনে কুঠি স্থাপন করে। ইহার পর তাহারা দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে পণ্ডিচেরীতে কুঠি স্থাপন করে এবং অল্পদিনের মধ্যে পণ্ডিচেরী ভারতে ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা নবাব সায়েস্তা খাঁর অনুমতি লইয়া ফরাসীরা চন্দননগরে একটি কুঠি নির্মাণ করে। তখন ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে ইউরোপের তিনটি শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল—ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ। ওলন্দাজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ফরাসীদের অসুবিধা হয়। দীর্ঘকাল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ফরাসীরা ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একে একে মরিসাস, মাহে ও কারিকল অধিকার করিয়া এই তিন স্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। তখন কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য করাই ফরাসীদের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনের অভিপ্রায় তাহাদের ছিল না। কিন্তু ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য-লাভের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। ফরাসী শাসনকর্তা ডুপ্লে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ বাধিয়া গেল এবং ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

মারাঠা ও শিখ শক্তির অভ্যুদয়ঃ যে সময়ে ঔরংজেব তাঁহার উৎকট হিন্দুবিদ্বেষী নীতির দ্বারা সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

শিবাজী

মোগল-মারাঠা সংঘর্ষ ঔরংজেবের রাজত্বকালের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ছত্রপতি শিবাজী ছিলেন মারাঠা-শক্তির প্রতিষ্ঠাতা। মোগল রাজশক্তির সহিত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে মোগলের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নষ্ট করেন এবং এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তি কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের (মারাঠাগণের আদর্শ ছিল 'হিন্দুপাদ-পাদশাহী' অর্থাৎ হিন্দুরাজ্য গঠন) যোগ্যতা ও শক্তি একমাত্র মারাঠাগণেরই ছিল। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) মারাঠা শক্তির শোচনীয় পরাজয়ের ফলে এই আদর্শ সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মারাঠা শক্তির দুর্বলতা ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়কে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ দান করিয়াছিল।

ঔরংজেবের ধর্মান্ধনীতির ফলে ভারতে আর একটি শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইতিহাসে ইহাই শিখশক্তি নামে পরিচিত। শিখজাতিও মারাঠাদের ন্যায় মোগলদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। শিখসম্প্রদায়ের নবম গুরু তেজবাহাদুর 'খালসা' নামে শিখ সামরিক বাহিনীর সংগঠক ছিলেন। প্রধানতঃ তিনিই শিখজাতির মনে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ঔরংজেবের হাতে বন্দী তেজবাহাদুরের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। সমগ্র শিখজাতিকে তীব্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করেন। বহু সংগ্রাম ও অত্যাচারের ভিতর দিয়া শিখগণ সমগ্র পাঞ্জাবে এক স্বাধীন শিখরাজ্য গড়িয়া

তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রঞ্জিৎ সিংহ এই রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। ভারতে তখন বৃটিশ শক্তি গড়িয়া উঠিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজদের সহিত শিখদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে পরাজয়ের পর (১৮৪৫) শিখশক্তি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং পাঞ্জাব বৃটিশ শক্তির অধীন হইয়া যায়।

মহীশূর রাজ্য : ভারতে নবাগত বৃটিশশক্তি যখন ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতেছিল, তখন যে সকল দেশীয় রাজ্য বাধাদানে অগ্রসর হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে মহীশূর রাজ্যের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। মহীশূররাজ হায়দার আলি তখন এক শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শক্তিবৃদ্ধিতে মারাঠা ও ইংরেজ সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হায়দার আলির সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ বাধে এবং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর মহীশূরের পরবর্তী রাজা হায়দরের সুযোগ্য পুত্র টিপু এককভাবে ইংরেজ শক্তিকে প্রবল বাধা দান করেন। বার বার পরাজিত হইলেও টিপুর স্বাধীনতাস্পৃহা হ্রাস পায় নাই। চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধে (১৭৯৯ খৃঃ) টিপুর মৃত্যুর পর মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটে। ভারতে রাজ্যবিস্তারে ইংরেজের পথ তখন এক রকম নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিল বলিলেই হয়। মারাঠা, শিখ ও মহীশূর শক্তির পতনের পর তাহাদিগকে বাধা দিবার আর কোনো দেশীয় শক্তি রহিল না।

বৃটিশ শক্তির উত্থান ও প্রসার : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল বাংলা দেশে। বাংলার নবাব তখন সিরাজ-উদ্দৌলা। ইংরেজ বণিকগণ যখন বার বার তাঁহার আদেশ অমান্য ও নিষেধ উপেক্ষা করিতে লাগিল, তখন নবাবের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠিল। ইহারই পরিণতি পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭ খৃঃ)। মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের সহায়তায় পলাশির যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ বাংলাদেশে ইংরেজ প্রাধান্যের সূচনা করেন। বিজয়ী ক্লাইভের নেতৃত্বে তখন ফরাসী কোম্পানীর সহিত বুঝাপড়া হইল। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধের পর ভারতে ফরাসী প্রাধান্য লুপ্ত হইল এবং তারপর একমাত্র ইংরেজ শক্তিই ভারতের মাটিতে টিকিয়া গেল। পলাশি যুদ্ধের সাতবৎসর পরে মীরকাশিমের পরাজয় এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ক্লাইভের

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় দেওয়ানী লাভ ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের ভিত্তিস্থাপনকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজজীবন: ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপনের সূচনাকালে, অষ্টাদশ শতকে ভারতের সমাজজীবন কিরূপ ছিল তাহা আমরা এইবার আলোচনা করিব। তখনকার ইতিহাসে আমরা একটি রাজশক্তির অবসান ও অপর একটি নূতন শক্তির অভ্যুদয় লক্ষ্য করি। তিনটি পৃথক সমাজ ও সংস্কৃতি তখন ভারতের মাটিতে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল—ইওরোপীয়, মুসলমান ও হিন্দু। এই তিনটি বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির সংঘাতের ফল ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর এক নূতন প্রভাব স্থাপন করিল। অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় সমাজ বলিতে গেলে উহা ছিল এক ঘোর অন্ধকারময় যুগ। কুসংস্কার, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদি নানাপ্রকার রীতি-নীতিসমাজ জীবনকে আড়ষ্ট, ও প্রাণহীন করিয়া রাখিয়াছিল। শিক্ষা নাই, উন্নত জীবনের আদর্শ নাই—সমাজ যেন মৃতবৎ। স্ত্রী-জাতির অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। বহুবিধ প্রথার চাপে তাহাদের অস্তিত্ব দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠিক এমন সময়ে পাশ্চাত্ত্যের প্রাণবান এক সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতীয় সমাজে রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। সেই রূপান্তরের পথে ধীরে ধীরে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ আসিয়া ভারতবাসীর চিত্তকে এক নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। এই যুগের অর্থনৈতিক জীবন অনেকটা মোগল আমলের অর্থনৈতিক জীবনেরই অনুসরণ বলা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিল্প উন্নত ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ হইতেই অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে ঐ সময়ে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল এবং যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছিল। ফলে ভারতের বাজারে দেখা দিল বিলাতী পণ্যের প্রতিযোগিতা। ক্রমে বাংলা তথা ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে এক দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল। কুটিরশিল্পগুলি একে একে ধ্বংস হইতে লাগিল এবং ইহার ফলে কৃষিজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনই পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংসর্গে এদেশে যে সংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ করে তাহার ফল আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই প্রত্যক্ষ করি।

অনুশীলনী

1. What were the causes of the fall of the Mughal empire ?

মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণ কি ?

2. How did the English come to power in India ?

ইংরাজেরা কিরূপে ভারতে প্রাধান্য লাভ করে ?

3. Describe the rise and fall of the Maratha, Mysorean and Sikh powers.

মারাঠা, মহীশূর ও শিখ শক্তির উত্থান ও পতন বর্ণনা কর।

4. Give an account of the life and condition of the Indian people in the 18th century.

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয়দের জীবন ও অবস্থা বর্ণনা কর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের বিস্তার ও পরবর্তী রূপান্তর

ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব গঠন—পলাশি যুদ্ধের পর বাংলাদেশে ইংরেজের শুধু সামরিক প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্যও সংস্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার অপরিমিত অর্থসম্পদ ইংরেজকে ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দান করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, আর হেষ্টিংস সেই ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। হেষ্টিংস-এর আমলে ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রসারে এই কয়টি রূপান্তর লক্ষ্য করিবার বিষয়, যথা—(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন রদ করিয়া প্রকাশ্যভাবে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন; (২) রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল এবং রাজস্বের তত্ত্বাবধানের জন্য বোর্ড অব রেভিন্যু গঠিত হইল, (৩) কলিকাতা বাংলার রাজধানী হইল; (৪) পাঁচ বৎসরের মেয়াদে ভূস্বামীদের সহিত খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা হইল; (৫) বিচার বিভাগের সংস্কারসাধন হইল এবং (৬) পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিয়ামক আইন (Regulating Act, 1773) প্রবর্তিত হইল।

লর্ড ক্লাইভ

ইহার পর লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের গভর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসিলেন (১৭৮৬ খৃঃ)। তাঁহার শাসনকালেও নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। কর্ণওয়ালিসের শাসন-সংস্কারের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা—(১) ইংরেজ কর্মচারিগণের অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন বন্ধ করা; (২) রাজস্ব ও বিচার বিভাগ পৃথক করা; (৩) সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালত ছাড়া চারিটি নূতন প্রাদেশিক আদালতের প্রতিষ্ঠা; (৪) পুলিস বিভাগের পরিবর্তন সাধন ও (৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন (১৭৯৩ খৃঃ)।

কর্ণওয়ালিসের পর আসিলেন লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮ খৃঃ)। তাঁহার সময়েই ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ওয়েলেসলী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, দেশীয় রাজগণকে তিনি ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন। বৃটিশের স্বার্থরক্ষার জন্য ওয়েলেসলী তাঁহাদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) নীতি অবলম্বন করিয়া দুর্বল দেশীয় রাজগণকে বৃটিশ সামরিক সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া তুলিলেন। ইহার ফলে দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাদের সার্বভৌমত্ব হারাইলেন এবং হায়দরাবাদ, অযোধ্যা, তাঞ্জোর, কর্ণাট প্রভৃতি বহু দেশীয় রাজ্য বৃটিশ প্রভাবের অধীনে আসিয়া পড়িল। এই মিত্রতা নীতির সহায়তায় ওয়েলেসলী ভারতবর্ষে ইংরেজের অধিকারকে প্রকৃতপক্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের রূপ দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের আর একটি প্রধান ঘটনা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু। ইহার ফলে মহীশূরের এক বিরাট অংশ বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িল।

ওয়েলেসলীর পরবর্তী কালেও সাম্রাজ্য বিস্তারের এই নীতি অপ্রতিহতভাবে অনুসৃত হইতে থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুধু ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়াই সন্তুষ্ট হইল না, পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তান ও ব্রহ্মদেশের প্রতিও উহার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের শেষে নূতন গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন লর্ড ডালহৌসী। ওয়েলেসলীর মত ইনিও একজন সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। ডালহৌসী তাঁহার রাজ্যবিস্তার নীতির জন্য বিখ্যাত। যুদ্ধ করিয়া হউক আর না হউক, দেশীয় রাজ্যগুলিকে কুক্ষিগত করাই (Annexation) হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। যুদ্ধ করিয়া তিনি সমগ্র পাঞ্জাব, পেগু ও সিকিম রাজ্যের একাংশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং সেই একই সময়ে স্বত্ববিলোপ-নীতির সহায়তায় তিনি একে একে সাতারা, সম্বলপুর, ঝাঁসি, নাগপুর প্রভৃতি অধিকার করিলেন। ডালহৌসী এইখানেই থামিলেন না—তিনি বহু রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কুশাসনের অজুহাতে তিনি অযোধ্যা রাজ্যটি কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং হায়দরাবাদের নিজামের নিকট হইতে সৈন্যসাহায্য দানের বিনিময়ে সম্পদ-পূর্ণ বেরার প্রদেশটি গ্রহণ করিলেন। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ পলাশি যুদ্ধের শতবর্ষ মধ্যেই প্রায় সমগ্র ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

শাসন-ব্যবস্থা ঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থায়ও বহুবিধ পরিবর্তন হইল। ক্লাইভ, হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের আমলে শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন লইয়া আসিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। বেন্টিঙ্কের শাসনকাল যুদ্ধবিগ্রহের কিংবা রাজ্যবিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য নয়, তাঁহার শাসনকাল সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি যেমন কোম্পানীর রাজস্ব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেন, তেমনই শাসন সংক্রান্ত ও বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনকার্যে তখনো পর্যন্ত ভারতীয়দের কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ দান করা হয় নাই।

ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন যখন কায়েম হইল তখন গোড়ার দিকে উহার গঠনতন্ত্র পার্লামেণ্টের চার্টার আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। তখন কোম্পানী ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত ছিল। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোম্পানী যখন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইল, তখনই আসিল লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট (১৭৭৩ খৃঃ)। এই আইন দ্বারা কোম্পানীর লণ্ডনস্থ পরিচালকসভার এবং ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। বাংলা দেশের গভর্ণর এখন হইতে গভর্ণর-জেনারেল আখ্যা পাইলেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সদস্য লইয়া একটি কাউন্সিল গঠিত হইল। বিচার-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ভারতশাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর উপর পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। এখন হইতে কোম্পানীর কার্যকলাপ আর স্বাধীনভাবে চলিতে পারিল না। পিটের ভারতশাসন আইনের বলে পার্লামেণ্টের ছয়জন সদস্য লইয়া একটি নিয়ন্ত্রণ সমিতি (Board of Control) গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কর্তৃক গঠিত এই সমিতির উপর কোম্পানীর কার্য পরিচালনার উপর দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল।

ইতিপূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কুড়ি বৎসরের জন্য ভারতে বাণিজ্য করিবার অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে

ঐ বৎসরেই কোম্পানীকে ভারতবর্ষে আরও কুড়ি বৎসরের জন্য বাণিজ্য করিবার অধিকার দেওয়া হইল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কুড়ি বৎসরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল, তবে এইবার সনদ আইনে (Charter Act) কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপিত হইল। ইহার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এক চতুর্থ সনদ আইনে কোম্পানীর মেয়াদ আরও বিশ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এইবার পার্লামেণ্টের বিরোধী দল কোম্পানীকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু এই চতুর্থ মেয়াদে কয়েকটি গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। যথা:—(১) বাংলার গভর্ণর-জেনারেল ভারতের গভর্ণর-জেনারেল আখ্যায় অভিহিত হইলেন, (২) ভারতবর্ষে কোম্পানী কর্তৃক অধিকৃত রাজ্য 'ইংলণ্ডের রাজার পক্ষে' কোম্পানীকে পরিচালনা করিতে হইবে; (৩) বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানীর রূপান্তর।

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের একশত বৎসর পূর্ণ হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। আমরা দেখিয়াছি এই একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ইংরেজের অধিকার নিরঙ্কুশ-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার ফলে ভারতবাসীর মনে ধীরে ধীরে একটি বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব শাসকদের অলক্ষ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। ইহাই একদিন সিপাহী বিদ্রোহের ভিতর দিয়া প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভারতে কোম্পানী-রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া দিয়াছিল। এইবার আমরা ঊনবিংশ শতকের ভারত ইতিহাসের এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি আলোচনা করিব।

সিপাহী সৈন্যের ইতিহাস: ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া প্রথমে কুঠিস্থাপন করে এবং পরে কুঠি রক্ষার্থে দুর্গ নির্মাণ করে। এই সকল দুর্গে অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য থাকিত। ক্রমে অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইলে দেশীয় সৈন্যকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষা দিয়া সিপাহী সৈন্য গঠন করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজরাজ্য বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী সৈন্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি লাভ করে। সিপাহীরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত কোম্পানীর কাজ করিত। কিন্তু পরবর্তী কালে নানা কারণে তাহাদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠে।

সিপাহী বিদ্রোহ: বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি একদিনে বা একমাত্র রাজনৈতিক কারণে হয় নাই। ইহার পিছনে ছিল অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক কারণ—

অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। কোম্পানীর শাসনের গোড়ার দিকে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেশের সর্বত্র দেখা দিয়াছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়ত ও জমিদার শ্রেণীর মধ্যে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অসন্তোষের ভিতর দিয়াই ভারতের বিভিন্ন অংশে ছোট বড় কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ইহারই সর্বশেষ পরিণতি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ—রাজনৈতিক ঃ সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলিকে ঐতিহাসিকগণ সাধারণত চারিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা : (১) রাজনৈতিক ; (২) আর্থিক ও সামাজিক ; (৩) ধর্মনৈতিক এবং (৪) সামরিক। এই কারণগুলি আমরা একে একে বিচার করিয়া দেখিব। প্রথমে রাজনৈতিক কারণের কথা ধরা যাউক। ভারতে বৃটিশ শাসনের ক্রমবর্ধমান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শাসন-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালেই ভারতবর্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। তাঁহার সামন্ত রাজ্যগুলি গ্রাস করিবার প্রয়াস এবং অনুমোদিত স্বত্বলোপনীতি, দেশীয় রাজাদিগের মনে আতঙ্ক ও বিক্ষোভের সঞ্চার করে। সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া অযোধ্যার মুসলমান রাজ্যটিকে বৃটিশরাজভুক্ত করা হইল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেব বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সকল কার্যের ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর দেশীয় রাজগণ এবং জনসাধারণ বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। এই বিদ্বেষই একদিন বিদ্রোহের রূপ লইয়া দেখা দিল।

অর্থনৈতিক ঃ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও ছিল অবর্ণনীয়। কোম্পানীর শাসন ছিল শোষণেরই নামান্তর। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দেশীয়রাজ্য অধিকৃত হইলে ঐ সমস্ত রাজ্যের রাজাদের অনুচর ও আশ্রিতবর্গের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে আর্থিক ও সামাজিক অসন্তোষ দেখা দিল। এছাড়া, নূতন ভূমি বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদিগের সহিত জমির সরাসরি বন্দোবস্ত হইল। অযোধ্যার নবাবের বৃত্তিভোগী কর্মচারীর ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদল ভাঙিয়া দেওয়ার ফলে তাহাদের জীবিকানির্বাহের এক সমস্যা দেখা দিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা বেশি অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল অযোধ্যায় তালুকদারগণের মধ্যে এবং এই বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্রই ছিল অযোধ্যা।

সামাজিক ও ধর্মনৈতিক: ঐতিহাসিকগণের মতে সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিতপূর্বে সতীদাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ আইন পাশ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের ফলে প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের এক বিরাট অংশ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের অনেকেরই মনে এই ধারণা হইল যে, ইংরেজ বুঝি ভারতবাসীর ধর্ম ও জাতি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। এছাড়া, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে দ্রুত প্রসার ভারতবর্ষে ঘটিয়াছিল, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ভিতর দিয়া অলক্ষ্যে সমাজের যে নবরূপান্তর সাধিত হইতেছিল, তাহার প্রতিক্রিয়াও সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

সামরিক: কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ দেখা দিয়াছিল সিপাহীদের মধ্যে। কোম্পানীর দেশীয় সিপাহীগণ দূরদেশে যুদ্ধ করিতে যাইতে পছন্দ করিত না, বিশেষ করিয়া জলপথে যাওয়া তাহাদের সংস্কারের বিরুদ্ধ ছিল। ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় তাহারা অল্প বেতন পাইত। দূরদেশে যাওয়ার জন্য তাহারা অতিরিক্ত ভাতা দাবী করিয়াছিল। সরকার তাহাদের সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন; ইহার ফলে সিপাহীগণের কয়েকটি দল মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই সময়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, পারস্যের যুদ্ধ এবং চীনের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে বহু ইংরেজ সৈন্যকে ভারত হইতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং দেশীয় সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ভারতে তখন ছিল মাত্র অল্প সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য; সিপাহীদের ধারণা হইল এদেশে কোম্পানীর রাজত্ব তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। অবশেষে সৈন্যদের মধ্যে 'এনফিল্ড' নামে একপ্রকার নূতন রাইফেলের প্রবর্তন হইল। এই রাইফেলে ব্যবহারের জন্য যে টোটা দেওয়া হইত উহা ছিল চর্বি মিশ্রিত। এই টোটা দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে ভরিতে হইত। সিপাহীদের ধারণা হইল যে, হিন্দু ও মুসলমানদের জাতি-ধর্ম নাশ করিবার জন্য টোটাগুলিতে গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। সিপাহীরা এই টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার তো করিলই, এমন কি তাহারা একযোগে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইল।

সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা—সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয় বাংলাদেশের ব্যারাকপুর ও বহরমপুরের সেনা-নিবাসে। ইহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের ঘটনা। এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইয়াছিল। তারপর ভারতের অন্যতম বৃহৎ সেনা-

নিবাস মিরাটে সিপাহীগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বহু ইংরেজকে হত্যা করে। মিরাটের বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই পাঞ্জাব হইতে মধ্যভারত পর্যন্ত এই বিরাট ভূখণ্ডের সর্বত্র বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হয়। মিরাটের বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর দিকে অভিযান করিয়া দিল্লী অধিকার করে। নামেমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং তাহারা তাঁহাকেই ভারত-সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লীর পতনে বৃটিশের মর্যাদার হানি হইল। ভারতের গবর্ণর জেনারেল তখন লর্ড ক্যানিং। তিনি এই সংবাদ পাইয়া খুব বিচলিত হইলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রসার—তারপর রাজপুতানা, বেরিলী, কানপুর, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী এবং বিহারের কয়েকটি স্থানে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইল। বিহারের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেন বর্ষীয়ান রাজপুতবীর কুনওয়ার সিং। প্রধানতঃ কানপুর, লক্ষ্মৌ এবং দিল্লী—এই তিন স্থানেই বিদ্রোহ প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং বহু সিপাহীকে হত্যা করা হয়। শিখ, গুর্খা প্রভৃতি জাতি এই বিদ্রোহ হইতে দূরে ছিল এবং কয়েকটি দেশীয় রাজ্য এই বিদ্রোহ দমন করিতে ইংরেজদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। কানপুর বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নানা সাহেব। ইনি নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। এখানে বহু ইংরেজকে হত্যা করা হয়। পরে ইংরেজগণ কানপুর পুনরুদ্ধার করেন। বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি দিল্লী শহর পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ইংরেজগণ তৎপর হইলেন। বাদশাহ বন্দী হইয়া ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হইলেন। লক্ষ্মৌ নগরে ইংরেজগণ বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে বিদ্রোহীরা রেসিডেন্সী অবরোধ করে। এই অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অনেক ইংরেজ নরনারী অবরুদ্ধ হইয়া অবর্ণনীয় ক্লেশ ভোগ করে। পরে জেনারেল হ্যাভলক ও আউট্রামের সম্মিলিত চেষ্টায় রেসিডেন্সীর উদ্ধার সাধন হইয়াছিল। মধ্যভারতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন মারাঠাবীর তাঁতিয়া তোপী ও ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ইঁহাদের দুজনের চেষ্টায় মধ্যভারতে বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্ব বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁতিয়া তোপী পরাজিত হন এবং বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ—সিপাহী বিদ্রোহ অনেকদিন স্থায়ী হইয়াছিল এবং বহু দেশীয় সৈন্য ও ভারতবাসী এই বিদ্রোহে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার কারণ, (১) উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণের অভাব; (২) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের অভাব; (৩) জনসাধারণের সহানুভূতি ও উপযুক্ত একতার অভাব এবং (৪) ইংরেজদের সহিত দেশীয় রাজাদের সহযোগিতা। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বিচার করিতে গিয়া ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, ইহা সুপরিকল্পিত জাতীয় সংগ্রাম ছিল না—কেননা তখন পর্যন্ত প্রকৃত জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ভারতবাসীর চিত্তে দেখা দেয় নাই। প্রধানতঃ ইহা সিপাহীদেরই বিদ্রোহ এবং তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন অসন্তুষ্ট ও গদীচ্যুত কয়েকজন রাজা ও জমিদার। এই বিদ্রোহ ঠিক সর্বভারতীয় ছিল না; উত্তর-ভারতের সিপাহীদের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল—সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। এই বিদ্রোহ প্রমাণ করিল যে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল তখন পর্যন্ত সুদৃঢ় হয় নাই। বিদ্রোহের ফলে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হয় এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষ সরাসরি ইংলণ্ডের রাণীর শাসনাধীনে চলিয়া যায়। ইংলণ্ডের রাণী তখন ভিক্টোরিয়া—তিনি ভারত-সম্রাজ্ঞী হইলেন এবং তখন হইতে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল 'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধি আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসান, মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এক ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদে দরবার বসাইয়া এই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ঘোষণায় বলা হইল যে, কোম্পানী দেশীয় রাজাদের সহিত সন্ধি ও যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা প্রতিপালিত হইবে; দেশীয় রাজাদের স্বত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা হইবে; ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না; রাজ্য বিস্তারের নীতি পরিত্যক্ত হইবে এবং যোগ্যতানুসারে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে সরকারী কার্যে নিয়োগ করা হইবে। ভারতে বৃটিশ শাসন ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া না উঠিবার জন্যই সাতান্ন-সালের বিদ্রোহ

ঘটিয়াছিল—এই কথা স্মরণ করিয়া অতঃপর শাসন-ব্যবস্থায় অধিকসংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের নীতি গৃহীত হইল।

অনুশীলনী

1. How was the British Power built up in India ?

ভারতে কি ভাবে বৃটিশ-শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল ?

2. Describe the administrative organisation set up in India by the East India Company.

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাহা বর্ণনা কর।

3. What were the causes of the Revolt of 1857.

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের কারণ কি কি ?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নবজাগরণের পথে ভারতবর্ষ

ভারতে নবজাগরন—অষ্টাদশ শতকে শিল্পবিপ্লবের ফলে যেমন ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষে তেমনই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের মাধ্যমে যে নূতন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতবাসী আসিয়াছিল, তাহার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটিয়াছিল। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পিছনে যে বৃটিশ বণিকসম্প্রদায়ের অর্থলিপ্সা ছিল ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি প্রতিক্ষেত্রেই দেখা দিল এক আমূল পরিবর্তন। এই সূত্র ধরিয়াই ক্রমে এই দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার হইল। ভারতের নিজস্ব অর্থ নৈতিক ভিত্তির আমূল পরিবর্তনের ফলে গ্রামের লোক চাকরীর জন্য বাহিরে যাইতে লাগিল। গ্রাম্যজীবনে মস্ত একটা ওলট পালট আসিল। এইভাবে ক্রমে এক চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিল। গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিল ; ফলে জনসাধারণকে কৃষিজমির উপর নির্ভরশীল হইতে হইল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক সর্বাত্মক বিপ্লব দেখা দিল। বাংলাদেশে বৃটিশ প্রাধান্য প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। কাজেকাজেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রভাব বাংলাদেশেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। দুইটি সভ্যতার ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়া আধুনিক বাংলা তথা বর্তমান ভারতের জন্ম হইল। ভারতবর্ষ নবজাগরণের পথে অগ্রসর হইল।

মোগল শাসনের শেষভাগে ভারতীয় সংস্কৃতির গতিহীনতা সমগ্র সামজদেহে এক তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য। ক্রমে ইহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিল দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নামিয়া আসিল এক অন্ধকারের যুগ। এই অন্ধকারের সূচনা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ এবং প্রায় সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই বিশালদেশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল স্তর ব্যাপিয়া ছিল। তারপর আমরা ক্রমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিলাম,

ইহার প্রভাব অনুভব করিলাম। বাংলাদেশেই প্রথম নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সহিত বাংলা দেশের এই নবজাগরণের তুলনা করিতে পারা যায়। সেখানে যেমন ইতালী দেশে সর্বপ্রথম ইহা দেখা দিয়াছিল, তেমনি ভারতবর্ষেও বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল।

ইংরেজি শিক্ষার ফল ঃ ভারতবর্ষে এই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন, রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খৃঃ)। প্রসঙ্গত পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তনের কথা এখানে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। কারণ এই শিক্ষাকেই পাথেয় করিয়া ভারতবর্ষ নবজাগরণের পথে পদার্পণ করিয়াছিল। লর্ড বেন্টিঙ্কের কথা আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। বহুবিধ সংস্কার প্রচেষ্টার জন্য বেন্টিঙ্কের শাসনকাল কোম্পানীর আমলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তিনিই এই দেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন করিয়া পরোক্ষে এদেশের এক মহান উপকার সাধন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দাবী তুলিয়াছিলেন এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই তিনি এই শিক্ষার বিস্তার চাহিয়াছিলেন। তখন হইতে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। ইহার ফলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইল। প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইল হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খৃঃ); তারপর মেডিকেল কলেজ (১৮৩৮ খৃঃ) ইত্যাদি। ক্রমে বাংলার জাতীয় জীবনে নবজাগরণের সকল লক্ষণ স্পষ্টভাবে অনুভূত হইল। একদিকে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া প্রতিভাশালী যুবকগণ যেমন এক নূতন উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল, তেমনি অন্যদিকে প্রাচ্যবিদ্যায় অভিজ্ঞ কয়েকজন ইংরেজ মনীষী, যেমন—কোলব্রুক, উইলসন ইত্যাদি, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও বিজ্ঞান সুধি-সমাজে প্রচারিত করিয়া দেশের লুপ্ত জ্ঞানভাণ্ডার উদ্ধার করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইল। রামমোহন রায়ের রচনার দ্বারা কেবল যে উপনিষদ্ গ্রন্থ বাংলায় পুনঃ প্রবর্তিত হইল তাহা নহে, বর্তমান বাংলা গদ্যসাহিত্যেরও পরিপুষ্টি হইল। ধর্মজগতে রামমোহন একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ইহার ফলে বাঙালী তথা ভারতবাসীর বহুদিনের চিত্তের জড়তা ঘুচিয়া গিয়াছিল। যে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বিষবাষ্পে দেশ আচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, রামমোহনের

চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসায় মৃতপ্রায় ভারতের বুকে ধীরে ধীরে নব-চেতনার সঞ্চার হইতে লাগিল।

শিক্ষার বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার। ইংরেজ শাসন যেমন এদেশে দৃঢ়মূল হইতে থাকে, তেমনি ধীরে ধীরে এই দেশের মানুষের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হইতে থাকে। প্রথম দিকে ইংরেজশাসকগণ ইংরেজি শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না, বা এ বিষয়ে তাঁহারা কোনো উদ্যোগ-আয়োজনও করেন নাই, অর্থব্যয় তো দূরের কথা। বরং তাঁহারা সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রথম একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইল। সেই টাকা দিয়া সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কথা হইল। বাংলাদেশে তখন রামমোহন প্রমুখ কয়েকজন চিন্তাশীল সমাজনায়ক দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এই সময়ে ভারত-হিতৈষী মহামতি ডেভিড হেয়ার আসিয়া ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহাদেরই সমবেত চেষ্টায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ নামে এক বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ইহাতে ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী কালের খ্যাতনামা বাঙালী চিন্তানায়কদের মধ্যে অনেকেই এই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন।

এই ইংরেজি শিক্ষা প্রথমে বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে বাংলাদেশে যেমন ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটিতে লাগিল, তেমনি ইহা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বহু স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইতে লাগিল। প্রসঙ্গত বাংলা তথা ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেখিতে দেখিতে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারলাভ ঘটিল এবং ফলে গড়িয়া উঠিল এক বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে ইঁহাদের দান অবিস্মরণীয়। ইঁহাদের মধ্যে একদল ছিলেন নূতন ভাবধারার প্রচারক। পুরাতন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রতিকারের ঝড় তুলিলেন। অন্যদিকে, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ প্রভৃতির পক্ষে তাঁহারা তীব্র প্রচারকার্য চালাইতে

লাগিলেন। এই নূতন ভাবধারার প্রভাবেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। মোট কথা, সেদিন শিক্ষা, সংস্কার, রাজনীতি ও দেশপ্রেম সকলক্ষেত্রে রামমোহন যে নবজাগরণের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ফল স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। বাংলা গদ্যের স্রষ্টাদের মধ্যে রামমোহন যেমন অন্যতম, তেমনই সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনিই আধুনিক ভারতবর্ষে প্রথম।

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রামমোহনই ছিলেন নবজাগরণের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। সমাজসংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবর্তক তিনি। তাঁহাকে আমরা ভারতের জাতীয়তাবাদের জনকও বলিতে পারি। তাঁহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রামমোহনের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল ধর্ম এবং নীতি। যুক্তি এবং প্রত্যয়সিদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই রামমোহন নব-জাগরণকে সকল দিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও সুবিশাল ব্যক্তিত্ব ভারতের নবজাগরণকে শুধু প্রভাবিতই করে নাই, অনেকখানি ত্বরান্বিতও করিয়া দিয়াছিল। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ সেদিন ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। রামমোহন রায়ের বিপ্লবী মন হিন্দুধর্মের অসার আনুষ্ঠানিক অংশকে বর্জন করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে একেশ্বরবাদী এবং সকলপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ ঃ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ব্রাহ্মসভা নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত হইয়া দেশের নবজাগরণকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। রামমোহনের পরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। তাঁহার নেতৃত্বে নবজাগরণ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া রামমোহনের বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিবাদী রচনা ছিল 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রাণস্বরূপ। ইহার পর আসিলেন কেশবচন্দ্র সেন—ইহার নেতৃত্বেও ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইভাবে উনবিংশ

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি প্রচার করিয়া ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণকে অনেক দিক দিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের 'প্রার্থনাসমাজ' ও দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্যসমাজের' নামও উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানও জাতিভেদ প্রথা ও বাল্যবিবাহ দূরীকরণ, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল। আর্যসমাজের আন্দোলন সমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ—ভারতীয় নবজাগরণের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। রামমোহন যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করেন, তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬) ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারায় এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ইঙ্গিত প্রদান করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, রামকৃষ্ণ বাল্যকালে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন নাই, কেবল নির্জনে গভীর ভক্তিভরে কালীমাতার ধ্যান করিতেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া

স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণদেব প্রচার করিলেন যে বিভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন পথ, কিন্তু সকলেরই গন্তব্য স্থান এক—সেই এক ঈশ্বর-প্রাপ্তি। সেই সময়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেই হিন্দু ধর্মকে পৌত্তলিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিল। রামকৃষ্ণ সেই অবহেলিত ও উপেক্ষিত হিন্দুধর্মকে ইহার প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ প্রচার করিলেন যে, হিন্দুধর্ম একটি জাগ্রত জীবন্ত ধর্ম এবং ইহার শেষ লক্ষ্য এক ঈশ্বর ; এই এক ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সাধারণ লোকের পক্ষে মূর্তিপূজা

ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। রামকৃষ্ণের যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণের আদর্শকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। অদ্বৈতবেদান্তাশ্রয়ী হিন্দুধর্মকে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের সমক্ষে প্রচার করিয়া যুগান্তর আনয়ন করেন। ধর্মের ক্ষেত্রে সমাজসেবার আদর্শ এদেশে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম লইয়া আসিলেন। তিনিই ভারতবর্ষে এক নূতন ধর্ম ও কর্ম চেতনার সৃষ্টি করেন। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে তাহার অতীত সভ্যতা সম্পর্কে নূতন করিয়া সজাগ করিয়া তুলিলেন। ভারতবাসীর ধমনীতে তিনি আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করিলেন। আমেরিকা এবং ইউরোপে তিনি ভারতের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ভাবধারার প্রভাবে রামকৃষ্ণ-মিশন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল।

এই নবজাগরণ কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজকে সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্য লইয়া দেখা দিলেন একজন মনীষী মুসলমান। তাঁহার নাম স্যার সৈয়দ আহম্মদ। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আলিগড়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুসলিম সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং মুসলমান সমাজকে নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

নবযুগের সাহিত্য ঃ বাংলার নবজাগরণ কেবলমাত্র ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যেও উহা প্রতিফলিত হইয়াছিল। বর্তমানে বাংলাভাষার জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতেই হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন এবং উইলিয়ম কেরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মিশনারীরা যদিও খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাভাষায় পুস্তক রচনা ও মুদ্রিত করেন তথাপি উহা পরোক্ষে বাংলা-ভাষাকেই পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময় রামমোহন তাঁহার ভাবধারার প্রচার-উদ্দেশ্যে যেসব পুস্তক রচনা করেন তাহাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাঁহার হাতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তিনি হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খৃঃ)। প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক সুবিখ্যাত

উপন্যাস রচনা করিয়া ভাষা ও সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। বিদ্যাসাগর যেমন বাংলা গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা কাব্যে এক নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়া উহাকে নূতন রূপ প্রদান করেন। মাইকেলের ছন্দ ও রচনা-রীতিতে বৈদেশিক প্রভাব থাকিলেও তাঁহার অমর কাব্য ও কবিতা জাতীয়তা ভাবে পূর্ণ। বিদ্যাসাগর ও মাইকেল বাংলা ভাষায় যে প্রেরণা সৃষ্টি করেন তাহাই পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে পূর্ণতর পরিণতি লাভ করে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বাংলার জাতীয় কবি। তাঁহাদের কাব্য ও কবিতা জাতীয়তা-বোধের বিকাশ সাধনে সাহায্য করিয়াছে। নাট্য সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অমৃতলাল বসু অমর নাট্য রচনা করিয়াছেন। এই সকল কাব্য, উপন্যাস ও নাটকে বাংলার মাটি, বাংলার জল-বায়ু এবং বাংলার জাতীয় ও সামাজিক আদর্শ অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের সব দিক সমৃদ্ধ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যে উন্নত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ।

সমাজ সংস্কার ঃ এইভাবে নবজাগরণ সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যখন নূতন ভাবধারার সৃষ্টি করিল, তখন বহুকালের সঞ্চিত কয়েকটি সামাজিক কুপ্রথার প্রতি শিক্ষিত দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলে সমাজে শিশুহত্যা, সতীদাহ প্রভৃতি কয়েকটি নিষ্ঠুর প্রথা উঠিয়া যায়। সবচেয়ে নিষ্ঠুর ছিল সতীদাহ প্রথা—মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় পত্নীকে বলপূর্বক দগ্ধ করা। এই নৃশংস প্রথাটির বিরুদ্ধে রামমোহন সে-যুগে প্রথম আন্দোলন করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আইনের সাহায্যে এই কুপ্রথাটি বন্ধ হয়। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য সমাজসংস্কার হইল বিধবা-বিবাহ। হিন্দু বিধবার বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত এই কথা ঘোষণা করেন বিদ্যাসাগর এবং তাঁহারই আন্দোলনের ফলে বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল।

জাতীয়তাবোধ ঃ এইভাবে বাংলার নবজাগরণ যখন শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন ইহার পরিণতি জাতীয়তাবোধের ভিতর দিয়া কিভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এইবার আমরা সেই কথা বলিব। এই

জাতীয়তাবোধের পিছনে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ছিল সাহিত্য। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও রঙ্গলাল প্রভৃতির গদ্য ও পদ্য রচনার ভিতর দিয়া বাংলার সাহিত্য-জগতে যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল। অন্ততঃ এই সময়ে বাংলা-সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশাত্ম-বোধ যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাদেশিকতার যে মন্ত্র ভারতবাসীকে দিয়া গিয়াছেন, উহাই ভারতবাসীকে গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই ভারতের জাতীয়তা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র

নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জনমানসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। উহা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। ভারতের ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই ইহা ক্রমশঃ অনুভব করেন। অবশ্য এই চিন্তাধারার পিছনে অর্থনৈতিক কারণও ছিল। স্বাধীনতার এই আকাঙ্ক্ষাই ক্রমে শাসক ও শাসিতের মধ্যেও ব্যবধান সৃষ্টি করিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই স্বায়ত্তশাসনের দাবী লইয়া ভারতবাসী আন্দোলন শুরু করিল। এই আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'ভারতসভা' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ভারতকে একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এই 'ভারতসভা'-ই সর্বপ্রথম এদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিল। ক্রমে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হইল এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভারতবাসী আন্দোলন শুরু করিল। এই সময়ে 'ইলবার্ট বিল'-কে উপলক্ষ্য করিয়া জাতীয়তাবাদের গভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয়দের

জাতীয় ঐক্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ভারতের জাতীয় আন্দোলন যাহাতে বিদ্রোহে পরিণত না হয় সেই জন্য বড়লাট লর্ড ডাফরিণ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসাহিত করেন।

সুরেন্দ্রনাথ W. C. Bonnerjee

জাতীয় কংগ্রেস : ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইল। সর্বভারতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা হইতেই কংগ্রেসের জন্ম। বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ যখন এই কথা চিন্তা করিতেছিলেন, তখন বাংলার বাহিরে যাঁহারা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দাদাভাই নওরোজী ও মাধবগোবিন্দ রাণাডের নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব ভারতীয় দেশপ্রেমিক ও চিন্তানায়কদের চেষ্টায় এবং এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামক একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ সিভিলিয়নের সহযোগিতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন প্রসিদ্ধ বাঙালি ব্যারিষ্টার W. C. Bonnerjee (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন বসিতে

লাগিল এবং ইহা ভারতবাসীদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

প্রথম যুগে কংগ্রেস ছিল আপোষপন্থী, উহার সুর ছিল নরম। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাগণ শীঘ্রই বুঝিলেন যে, তাঁহাদের আবেদন-নিবেদনে সরকার কর্ণপাত করিতেছে না। তখন ক্রমশঃ নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিলেন, কংগ্রেসের কর্মপন্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সর্বপ্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ও বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল। প্রধানতঃ তাঁহার নেতৃত্বেই কংগ্রেস আপোষবিরোধী আদর্শ গ্রহণ করে। তিলকের এই রাজনৈতিক মতের ভিতর ভারতবাসী বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের সন্ধান পাইল এবং বাংলাদেশেও এই আদর্শ প্রবল হইয়া উঠিল। এই বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ হইতেই বাংলাদেশে বিংশ শতকের প্রথম দশকেই এক নূতন আন্দোলনের উদ্ভব হইল। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ঃ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধা হইবে, এই অজুহাতে বাংলাদেশকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত করেন। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাঙালি জননায়ক ও চিন্তানায়কগণ। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া সারা বাংলায় আন্দোলন ক্রমে তীব্র হইয়া উঠিল। বিলাতী দ্রব্যসামগ্রী বর্জন করার দাবী উঠিল। সহরে সহরে স্বদেশী স্কুল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ভারতবাসীর কণ্ঠে 'স্বরাজ'-এর দাবী উঠিল—তাহারা চাহিল নিজের দেশ নিজে শাসন করিবার অধিকার। ইহার ফলে কংগ্রেস এই সময় হইতে একটি শক্তিশালী গণপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইল। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, সাবানের কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হইল।

সন্ত্রাস বাদ ঃ বাংলার এই স্বদেশী আন্দোলনকে সরকার কঠোরভাবে দমন করিতে গিয়া বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিলেন। মহারাষ্ট্র ও বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। বাংলা দেশে এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ইঁহারা বলিলেন যে, আইনকানুনের পথে

স্বাধীনতা আসিবে না, তাই তাঁহারা বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য জাতিকে আহ্বান জানাইলেন। সন্ত্রাসবাদ ভারতে ইংরেজ শাসকদের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিল এবং তাহারাও দমননীতির কঠোরতা ও অত্যাচার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

শ্রীঅরবিন্দ

রবীন্দ্রনাথ

এই সময়ে একদিকে কংগ্রেসী আন্দোলনের তীব্রতা এবং অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদের আতঙ্কে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একদফা শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন। ইহাই ইতিহাসে 'মর্লি-মিণ্টো' সংস্কার নামে পরিচিত। কিন্তু ভারতবাসীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ এই সংস্কারে সন্তুষ্ট হইল না—ইহা তাহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে হইল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান—কংগ্রেস ও লীগ—মিলিতভাবে ব্যাপক সংস্কার দাবী করিল। যুদ্ধের শেষভাগে, ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আর একদফা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হইল। ইহাই 'মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিফর্ম'। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এই সংস্কার কি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনিয়া দেয়, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইল।

অনুশীলনী

1. What were the changes brought about by British impact on Indian economy ?

বৃটিশের সংস্পর্শে ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের কি পরিবর্তন আসিয়াছিল ?

2. What was the result of the Western cultural impact on India ?

ভারতের উপর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শের কি ফল হইয়াছিল ?

3. Describe the 19th century awakening in Bengal and elsewhere.

বাংলাদেশে ও অন্যত্র উনবিংশ শতাব্দীতে কি নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল ?

4. Give an account of the social and political changes in the 19th century in India ?

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন বর্ণনা কর।

5. What were the contributions of (1) Raja Rammohan Roy, (2) Vidyasagar, (3) Ramkrishna and (4) Vivekananda towards national awakening in Bengal.

বাংলাদেশে নবজাগরণের পশ্চাতে (১) রাজা রামমোহন রায়, (২) বিদ্যাসাগর, (৩) রামকৃষ্ণ ও (৪) বিবেকানন্দের অবদানের কথা আলোচনা কর।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের অগ্রগতি—১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লি মিণ্টো শাসন-সংস্কার ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। এই সংস্কারের দ্বারা একটি মারাত্মক প্রথা প্রবর্তিত হয় ইহা হইল সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা। ইহা দ্বারা হিন্দু ও মুসললানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়। স্বভাবতঃই এই ভূয়া সংস্কার ভারতবাসীর জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, বরং ইহা ভারতে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিতে সহায়তা করিল। তারপর বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনমতকে শান্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সে-চেষ্টাও বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের নির্মম অত্যাচার-অবিচার চলিতেছিল। সেখানেও ভারত-বাসী ইহার প্রতিবাদে আন্দোলন করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভারতের বাহিরে তাঁহার নেতৃত্বে ইহাই প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধীর সাফল্য ভারতের রাজনৈতিক চেতনাকে আরো সুতীব্র করিয়া তুলিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল। ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে যথেষ্ট ধনবল ও জনবল যোগাইয়াছিল। সুতরাং ভারতবাসীর মনে আশা ছিল যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। তাঁহারা সে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের সংস্কারের ভিত্তিতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যে ভারত-শাসন আইন রচিত হইল, তাহাতে দেখা গেল যে, এই নূতন আইন দ্বারা কিছু শাসন-সংস্কার করা হইল বটে, কিন্তু উহার দ্বারা ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল না ফলে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার—প্রসঙ্গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এই শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র বিভাগ, পরিবহন, ডাক-বিভাগ প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রহিল—এগুলির নাম দেওয়া হয় সংরক্ষিত বিভাগ (Reserved Subjects)। আর বিচার, জেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, বনবিভাগ, রাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির দায়িত্ব রহিল প্রাদেশিক সরকারের উপর। এইগুলিকে বলা হইল হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects)। কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে ভাইসরয় ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার অধীন রহিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট ইঁহাদের কোনো দায়িত্ব রহিল না। তাঁহারা ভারত সচিবের মাধ্যমে বৃটিশ পার্লমেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় এক দ্বৈতশাসনের (Dyarchy) প্রচলন করা হইল। গভর্ণর ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভা শাসন-শৃঙ্খলা প্রভৃতি গুরুত্ব বিষয় সম্পর্কে বড়লাট ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার নিকট দায়ী ছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলির ভার দেওয়া হইল আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত মন্ত্রীদের হস্তে। কেন্দ্রে রহিল দুই-কক্ষযুক্ত আইনসভা আর প্রদেশগুলিতে রহিল এক-কক্ষযুক্ত আইনসভা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই নূতন শাসন-সংস্কার ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন দাবি কিছুমাত্র মিটাইতে পারিল না। প্রকৃত ক্ষমতা সবকিছু গভর্ণর ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভা এবং গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার হস্তে ন্যস্ত ছিল। জাতীয় দাবী ইহাতে মিটিল না, ফলে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি শীঘ্রই তীব্র আকারে দেখা দিল। তাই মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হইবার পর তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনই পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থার ভূমিকা রচনা করিয়াছিল।

কংগ্রেস এই নূতন শাসনসংস্কার বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। এই সময়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এক দমনমূলক আইন পাশ করেন। ইহাই কুখ্যাত রাউলাট আইন। বাংলা তথা ভারতে বৈপ্লবিক বা সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য

ভারত সরকার স্যার রাউলাটের অধীনে একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটি কঠোর আইন করিবার সুপারিস করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাউলাট আইন জারী হইল। কংগ্রেস এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। ভারতবাসীর অর্থে ও সামর্থ্যে ইংরেজ জয়লাভ করিয়াছে এবং তাহারই প্রতিদানে ভারত সরকারের নিকট তাহারা পাইল রাউলাট আইন। এই আইনের বলে যুদ্ধের সময় অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য যেসব আইন পাস করা হইয়াছিল, সেইগুলিকে এখন দেশের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমন করিবার কাজে ব্যবহার করা হইল। ভারতের সর্বত্র অশান্তি ধূমায়িত হইয়া উঠিল।

মহাত্মা গান্ধী ঃ জাতির এই সঙ্কটমুহূর্তে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন মহাত্মা গান্ধী। সেইদিন হইতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাঁহারই নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া এক নূতন অধ্যায় রচনা করিল। মহাত্মা গান্ধী অগ্রণী হইয়া রাউলাট আইনের প্রতিবাদ করিলেন এবং গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিলেন যে, এই অন্যায় আইন প্রত্যাহৃত না হইলে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। ভারত সরকার গান্ধীর প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করিলেন। গান্ধী ইহা অমান্য করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই আইনের বলে পাঞ্জাবে নেতৃগণ ধৃত হইলেন। তখন পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিল। পাঞ্জাবের বিক্ষুব্ধ অধিবাসিগণ কর্তৃক অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকার এই সভা বেআইনী বলিয়া

মহাত্মা গান্ধী

ঘোষণা করে, এবং সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর বৃটিশ সেনাপতি ডায়ারের নেতৃত্বে গুলি বর্ষণ করা হয়। ফলে সহস্রাধিক নরনারী ও শিশু নিহত হয়। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন।

অসহযোগ আন্দোলন ঃ মহাত্মা গান্ধী তখন সরকারের সহিত অসহযোগিতা করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দেওয়া, সরকারী আইনসভা, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী স্কুল ও কলেজ বর্জন—ইহাই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী। শাসনকার্যে, শিক্ষাব্যাপারে, শোষণকার্যে অসহযোগ ঘোষণা করা হইল। মাদকদ্রব্য বর্জিত হইল, দেশের সর্বত্র চরকা চলিল। দেশবাসী অসহযোগ আন্দোলনে দলে দলে যোগ দিতে লাগিল। ত্রিশ হাজার ভারতবাসী এই উপলক্ষে গ্রেপ্তার হইল। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ও ইংরেজের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। উহার নাম খিলাফৎ আন্দোলন। তুর্কির সুলতান ছিলেন মুসলমানদের খলিফা বা ধর্মগুরু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরাজেরা তুরস্কের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলন করেন। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন একত্রে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বেগবান করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ডের ফলে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন তখনকার মত স্থগিত করিয়া দিলেন।

স্বরাজ্যদল ঃ এই সময়ে কংগ্রেস নেতাগণের একাংশ জাতির নিকটে নূতন কর্মপন্থা উপস্থাপিত করিলেন। ইহার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে 'স্বরাজ্যদল' নামে এক নূতন সংগঠন গড়িয়া উঠিল। এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু। গান্ধীজি তখন রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃত হইয়া দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। স্বরাজ্যদল আইনসভার নির্বাচনে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বিরাট ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইলেন এবং আইনসভার ভিতর থাকিয়া সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করিয়া দ্বৈতশাসনব্যবস্থা প্রায় অচল করিয়া তুলিলেন। স্বরাজ্যদলের এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরোক্ষে জাতীয় আন্দোলনকে নূতনভাবে উদ্দীপ্ত করিরা তুলিল।

সাইমন কমিশন—ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছাইল তখন বৃটিশ সরকার ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি রাজকীয় কমিশন বসাইলেন। এই কমিশনের সকল সভ্যই ছিলেন ইংরেজ। কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন। এই কমিশন তাই 'সাইমন কমিশন' নামে খ্যাত। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কিন্তু এই কমিশনে কোন ভারতবাসীকে লওয়া হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কংগ্রেসের নির্দেশে উহা বর্জন করা হয়। তারপর সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বড়লাট লর্ড আরুইন্ একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করিলেন (১৯৩০খৃঃ)। এই বৈঠকে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি আহূত না হওয়ায়, কংগ্রেস উহা বর্জন করে। ইতিমধ্যে গান্ধী কারামুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া এক নূতন আন্দোলন আরম্ভ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। ইহাই ইতিহাসে অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন নামে খ্যাত।

আইন-অমান্য আন্দোলন—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ সবরমতি আশ্রম হইতে দুইশত মাইল দূরে সমুদ্রোপকূলে ডাণ্ডী নামক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী একটি সত্যাগ্রহী দল লইয়া যাত্রা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভ ও গণআন্দোলন আরম্ভ হইল। শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিল। কৃষকেরা কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিল এবং সর্বত্র বিলাতি দ্রব্য বর্জিত হইতে লাগিল। এই সময় কোন কোন স্থানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও দেখা দিতে লাগিল। বিপ্লবী কার্যকলাপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। সরকার পক্ষ হইতে এই আন্দোলন দমনের জন্য কঠোরতম নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল।

গান্ধী-আরুইন্ চুক্তি—ইহার পর হইতেই ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক দিক্ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলন হইতে কংগ্রেস আপোষের পথে পদক্ষেপ করিল। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পরিণত হইবার পর গান্ধী বড়লাট লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নূতন করিয়া আলোচনা করিলেন। এই আলোচনারই ফল গান্ধী-আরউইন্ চুক্তি (১৯৩১, ৪ঠা মার্চ)। এই চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে রাজী হইল। কংগ্রেসের একমাত্র

প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজি বৈঠকে যোগ দিতে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। কিন্তু বৈঠকের প্রহসনে বিরক্ত হইয়া গান্ধীজি রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। ভারতে ফিরিয়া তিনি আবার আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র ঃ ইহার পরই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। আন্দোলনের চাপে একটি নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। ইহাই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র নামে পরিচিত। কংগ্রেসের বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর। এই শাসনতন্ত্রে দুইটি মূলনীতি স্বীকৃত হয়, একটি হইল যুক্তরাষ্ট্র গঠন, অপরটি হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই শাসনতন্ত্রে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিবার প্রতিশ্রুতি থাকিলেও, স্বাধীনতার কথা ইহার কোথাও বলা হয় নাই। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই শাসনতন্ত্র অস্থায়ী কংগ্রেস গভর্ণরশাসিত অধিকাংশ প্রদেশেই সরকার গঠন করিতে সক্ষম হইল এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতায় আসীন ছিল। কেবলমাত্র বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এই তিনটি প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

মুসলিম লীগের কংগ্রেস বিরোধিতা ঃ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে ইংরাজ সরকার মুসলমানদিগকে হাত করিবার জন্য ভেদনীতি আরম্ভ করেন। সরকারের প্ররোচনায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু ও মুসলমানের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মনোভাব স্থায়ী করিবার জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লি-মিণ্টো সংস্কারে ধর্মের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনকে দুর্বল করিবার জন্য মুসলিম লীগকে সরকার আবার উৎসাহিত করিতে থাকেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিলে জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস-শাসনে মুসলমানেরা ন্যায়বিচার পাইবে না। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লীগের লাহোর বৈঠকে মুসলমানদের জন্য পৃথক পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এক গুরুতর পটপরিবর্তন হইল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিল। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায়

ভারতেও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। এই বিশ্বযুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ ছিল না তথাপি ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত জাতি বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধে কংগ্রেস বিনাসর্তে ভারতকে জড়াইতে চাহিল না। যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে—কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই দাবী জানান হইল। সরকার ইহাতে সম্মত হইলেন না। ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন। এখন হইতে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের নূতন পর্যায় আরম্ভ হইল। প্রায় দেড় বৎসর পরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আবার কংগ্রেসের সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইতে বাধ্য হইলেন।

ইহার পর একটির পর একটি ঘটনা দ্রুতগতিতে আবর্তিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নিকট প্রবল ইংরেজ শক্তির পরাজয় ভারতে ইংরেজ শাসনকে সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমর্থন পাইবার জন্য বৃটিশ সরকার আপোষের হাত প্রসারিত করিলেন। বৃটিশ সরকার স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি ভারতে আসিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিল কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ও আগষ্ট বিপ্লব (১৯৪২) খৃঃ। এই বিপ্লব ভারতবর্ষে অকস্মাৎ প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। এত বড় গণবিক্ষোভ ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। ঠিক এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ ভারতসীমান্তে ইংরেজকে

নেতাজী

চরম আঘাত হানিল। নেতাজী সুভাষ ও তাঁহার ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বীরত্ব-কথা যখন প্রকাশ পাইল তখন উহা ভারতবাসীর মনে এক অপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। এই বিক্ষোভ ক্রমে বৃটিশের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর ভারতীয় অংশে আত্মপ্রকাশ করিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নৌবিদ্রোহ হইতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উপলব্ধি হইল যে, ভারতবর্ষকে আর তাহাদের অধীনে রাখা চলিবে না।

কেবিনেট মিশন ঃ তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়াভেল তখন ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হইলেন। পরবর্তী ঘটনাসমূহ অতি দ্রুতগতিতে চলিল। মহাযুদ্ধের অবসান ও আন্তর্জাতিক চাপে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের প্রতি তাঁহাদের নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হইলেন। ইংলণ্ডে শ্রমিক গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। নৌবিদ্রোহের একমাস পরেই বৃটিশ কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষে আসিলেন এবং দীর্ঘ এক মাস ধরিয়া তাঁহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের অনমনীয় মনোভাবের জন্য কেবিনেট মিশন ব্যর্থ হইল।

অনুশীলনী

1. Discribe briefly India's struggle for Independence and its achievements.

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও উহার সাফল্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. Write notes on :—

(a) Non-violent Non-co-operation ; (b) Civil Disobedience ; (c) Gandbi-Irwin Pact ; (d) August Revolution ; (e) Cabinet Mission.

টীকা লিখ :—(ক) অসহযোগ আন্দোলন ; (খ) আইন অমান্য আন্দোলন ; (গ) গান্ধী-আরউইন চুক্তি ; (ঘ) আগষ্ট বিপ্লব ; (ঙ) মন্ত্রী মিশন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্বাধীন ভারত

সংবিধান পরিষদ ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠন : মন্ত্রী মিশন ফিরিয়া যাইবার পর (১৯৪৬, ১৬ই মে) কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনার কিছু অংশ গ্রহণ করিল। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে কংগ্রেস সম্মত হইল না বটে কিন্তু সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে সংবিধান পরিষদে (Constituent Assembly) যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল। তখন গভর্ণর জেনারেলের কার্যকরী সমিতিতে কংগ্রেসী সদস্যদের লওয়া হইল। মুসলিম লীগ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইল এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করিল। ১৬ই আগষ্ট এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করিল; ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে রক্তক্ষয়ী সম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়া গেল। লীগ দাবী করিল মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলি লইয়া একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। লীগনায়ক মহম্মদ আলি জিন্না 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট জানাইলেন।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিলেন। লীগ এই সরকারের সহিত প্রথমে সহযোগিতা করিতে চাহে নাই, কিন্তু পরে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের পীড়াপীড়িতে অন্তর্বর্তী সরকারের সহিত যোগদান করিল। ইহাতে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোন সমধান হইল না। তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি নূতন একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই বৃটিশ সরকার দায়িত্ব-বোধসম্পন্ন ভারতীয় নেতৃবর্গের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবেন।

মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা : তারপর ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় করিয়া পাঠাইলেন। মাউণ্টব্যাটেন ভারতে আসিয়া ১৯৪৭ এর মার্চ মাসে সর্বপ্রধান কার্যভার গ্রহণ করিলেন এবং অতি অল্প

কালের মধ্যেই তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণার তারিখ ৩রা জুন, ১৯৪৭। এই ঘোষণায় বলা হইল, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলির অধিবাসিগণ ইচ্ছা করিলে পৃথক ডোমিনিয়ম গঠন করিতে পারিবে কিন্তু সে ক্ষেত্রে পাঞ্জাব, ও বাংলাদেশের ব্যবচ্ছেদ প্রয়োজন হইবে। ঘোষণায় আরও বলা হইল যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষকে দুইটি ডোমিনিয়নে পরিণত করিবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিবেন। ইহাই সংক্ষেপে মাউণ্টবাটেন পরিকল্পনা। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত বিভাগের ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবের একাংশ লইয়া এবং সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে লইয়া পাকিস্তান নামে একটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষের বাকী অংশ লইয়া গঠিত হইল বর্তমান ভারতরাষ্ট্র। ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদের জন্য স্যর সাইরিল র‍্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে দুইটি সীমা-নির্ধারণ কমিশন নিযুক্ত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আইন ঃ ইহার পর ১৯৪৭এর জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন (The Indian Indepedence Act) গৃহীত হইল এবং ১৫ই আগষ্ট ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিবার দিন ধার্য হইল। ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রিতে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে। ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তান ও ইণ্ডিয়া বা ভারত এই দুইটি নূতন ডোমিনিয়নের জন্মলাভ হইল। দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া ভারতকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া এই স্বাধীনতা অসিল। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হইলেন জওহরলাল নেহরু। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সাময়িকভাবে গভর্ণর-জেনারেল রহিয়া গেলেন। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের গভর্ণর-জেনারেল হইলেন মহম্মদ আলি জিন্না।

ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরে ভারতীয় ইউনিয়নের গণপরিষদের যে অধিবেশন হয় তাহাতে গণপরিষদের সভাপতি হিসাবে শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "বহুবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর আজ আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করিতে যাইতেছি। যাঁহারা এই সংগ্রামে সবকিছু বিসর্জন দিয়াছেন, এমন কি ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সেইসব অজ্ঞাত শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি ও তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

আর জাতীয় জীবনের এই শুভ মূহূর্তে আমরা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি।”

স্বাধীন ভারতের আদর্শ—স্বাধীন ভারতের আদর্শ হিসাবে নূতন সংবিধানে বলা হইল যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ন্যায় বিচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সকল ভারতবাসীই সমানভাবে ভোগ করিতে পারিবে। আরও বলা হইল যে, ভারতরাষ্ট্র হইবে প্রজাতান্ত্রিক অর্থাৎ কোন রাজা এই রাষ্ট্রের নায়ক থাকিবেন না; গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি এই দেশের শাসনতন্ত্রের পুরোভাগে থাকিবেন এবং নির্বাচিত মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের সিদ্ধান্তও স্বাধীন ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনই স্বাধীন ভারতের আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গঠন করিবার দায়িত্ব স্বাধীন ভারতের সরকার তথা জনসমাজ গ্রহণ করিয়াছে।
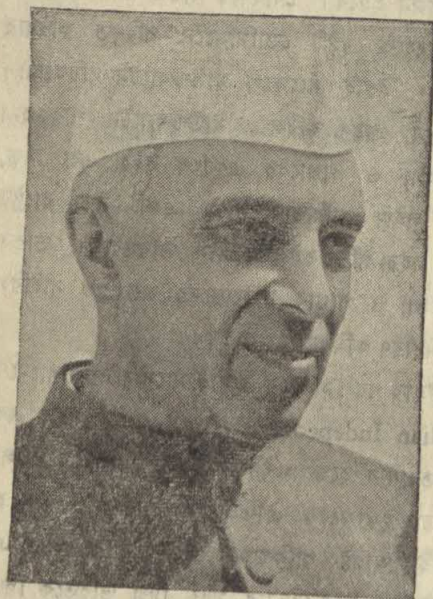
শ্রীজওহরলাল নেহরু

স্বাধীনভারতের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং প্রথম প্রধান মন্ত্রী হইলেন শ্রীজওহরলাল নেহরু।

অনুশীলনী

1. Why was India divided into two parts ?

কি কারণে ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হইল ?

2. What are the ideal and goal of the Indian Union ?

ভারত ইউনিয়নের আদর্শ ও লক্ষ্য কি ?

3. Write notes on :—

(a) National Reconstruction ; (b) A Welfare State ; (c) Socialist pattern of Society.

টীকা লিখ :— (ক) জাতীয় পুনর্গঠন ; (ঘ) জন-কল্যাণকর রাষ্ট্র ; (গ) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ।

তৃতীয় খণ্ড

[নাগরিকচেতনা ও সরকার]

নাগরিকচেতনা ও সরকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়-প্রসঙ্গ

নাগরিক কাহাকে বলে—কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়া ঐ রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তিকে সাধারণতঃ নাগরিক বলা হয়। নাগরিক (citizen) শব্দটি আসিয়াছে নগর (city) হইতে। ইহার আসল অর্থ নগরের অধিবাসী বা কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী। কিন্তু পৌরবিজ্ঞানে ইহার একটি বিশেষ অর্থ আছে। যে কোন রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী কিন্তু সেই রাষ্ট্রের নাগরিক পদবাচ্য নহে। সকল রাষ্ট্রেই সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক বাস করে যথা:—(১) নাগরিক; (২) প্রজা এবং (৩) বিদেশী। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর লোককে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় আর তৃতীয় শ্রেণীর লোকের আনুগত্য থাকে তাহারা যে রাষ্ট্রের অধিবাসী সেই বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি। আবার নাগরিক ও প্রজাগণের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। প্রজাগণ নাগরিকের ন্যায় রাষ্ট্রের যাবতীয় অধিকার ভোগ করিতে পারে না; গুণের অভাবে বা দোষের জন্য তাহারা রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। বহিরাগত ব্যক্তি কেবলমাত্র সেই রাষ্ট্রের সামাজিক সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে, তাহারা কিন্তু কখনো সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং একমাত্র নাগরিক ভিন্ন অপর কেহই রাষ্ট্রের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিবার কিম্বা ভোগ করিবার যোগ্য নহে। বর্তমানে ইহাই নাগরিকের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে বুদ্ধিমান, সংযমী ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহই সুনাগরিক হইতে পারে না। নৈতিক ও বুদ্ধিপ্রসূত দুইপ্রকার গুণাবলীই তাহার থাকিবে। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য নৈতিক আদর্শের প্রয়োজনীতা সর্বাগ্রে।"

নাগরিকেরা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত, আর বিদেশীয়রা (Aliens) অন্য রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। কলিকাতাবাসী বাঙালী, পাঞ্জাবী, প্রভৃতি জনগণ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। তাই তাহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক এই উভয়বিধ অধিকার ভোগ করে। পক্ষান্তরে কলিকাতাবাসী চীনা, ইংরেজ, জাপানী প্রভৃতি জনগণ চীন, বৃটেন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা বিদেশী এবং কেবলমাত্র সামাজিক অধিকার ভোগ করে। অবশ্য কোন বিদেশী তাহার নিজের দেশের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া যে-দেশে সে রহিয়াছে সেই দেশের প্রতি তাহার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিলে, সে সেই দেশের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, **আনুগত্য ও পূর্ণ অধিকার ভোগ**—ইহাই নাগরিকত্বের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন রাজ্যে বাস করিলে নাগরিকত্ব সর্বদাই এক এবং সর্বভারতীয়।

নাগরিক অধিকার—নাগরিক দুই শ্রেণীর, যথা—(১) জন্মসূত্রে নাগরিক এবং (২) অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক। এই উভয় প্রকার নাগরিকই রাষ্ট্রের যাবতীয় অধিকার ভোগ করিতে পারে। অধিকার (Rights) বলিতে আমরা বুঝিয়া থাকি যাহা খুশি অবাধে করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। এই অধিকার গায়ের জোরে অর্জন করা যায়, আবার সামাজিক চেতনা হইতেও এই অধিকার জন্মায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার বলিতে সামাজিক চেতনা হইতে জাত অধিকার বুঝাইয়া থাকে। আমরা সমাজবিদ্যার আলোচনার গোড়াতেই দেখিয়াছি যে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সমাজের উপর নির্ভর করে, আবার সমাজের পূর্ণতা নির্ভর করে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে। এই বোধ হইতেই সমাজ সৃষ্টি ও সামাজিক চেতনার বিকাশ হইয়াছে।

রাষ্ট্রের নিকট আনুগত্য স্বীকারের ফলে নাগরিকগণ কতকগুলি অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। এই অধিকার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) **নৈতিক অধিকার** (Moral Rights) এবং **আইনসঙ্গত অধিকার** (Legal Rights)। নৈতিক অধিকারের মূল হইল মানুষের ন্যায়-বুদ্ধি ও বিবেক। আইনসঙ্গত অধিকার রাষ্ট্রের আইনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেষোক্ত অধিকার সম্বন্ধেই আলোচনা করে। আইনসঙ্গত অধিকার আবার দুই প্রকার:—সামাজিক ও রাজনৈতিক। যে সকল অধিকার ভিন্ন মানুষ সমাজে সভ্য জীবন যাপন করিতে পারে না,

মোটামুটিভাবে তাহাকে সামাজিক অধিকার বলা হইয়া থাকে। আর রাজনৈতিক অধিকার হইতেছে রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যাপারে সাধারণ নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা।
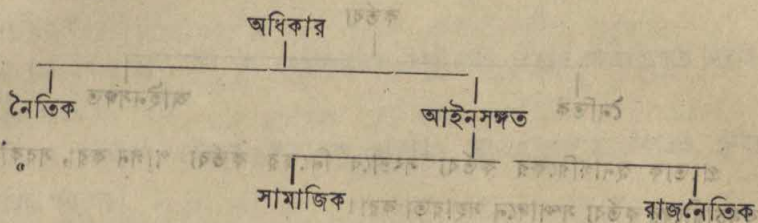
সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার—সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে যোগাযোগ খুব নিবিড়। এমন অনেক রাজনৈতিক অধিকার আছে যাহা সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেক সামাজিক অধিকার আছে যেগুলিকে রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া ধরা হয়; যেমন, মিলিত হইবার অধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা। এই দুইটিকে একাধারে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়। রাজনৈতিক অধিকার দ্বারা সামাজিক অধিকার সংরক্ষিত হইয়া থাকে। সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার সামাজিক অধিকার। কিন্তু আইন সভায় যখন ইহার প্রতিকূল আইন রচিত হয়, তখন সেখানে তাহার বিরোধিতা করিবার অধিকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে আসে। রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত সামাজিক অধিকার মূল্যহীন; কারণ রাজনৈতিক অধিকারের সাহায্যেই সামাজিক অধিকার সংরক্ষিত হয়।

নাগরিক কর্তব্য—অধিকারের সহিত কর্তব্য (Duties) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এমন অধিকার আমরা কদাচ ভোগ করি না, যাহার সঙ্গে আমাদের কর্তব্যের যোগ নাই। এখন নাগরিকতার সহিত কর্তব্যবোধের মনোভাব আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। কোন কিছু করিবার দায়িত্ব বা ঔচিত্যকে কর্তব্য বলা হয়। কর্তব্য দুই প্রকার—**নৈতিক কর্তব্য** (Moral duty) ও **আইনসঙ্গত কর্তব্য** (Legal duty)। আইনসঙ্গত কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। কর (tax) প্রদান

করা একটি আইন সঙ্গত কর্তব্য। ইহা না দিলে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় না এবং রাষ্ট্রের চক্ষে ইহা সর্বদাই দণ্ডনীয়।

প্রত্যেক সুনাগরিকের কর্তব্য সৎভাবে নিজের কর্তব্য পালন করা, সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করা।

অধিকার ও কর্তব্য—অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র বজ্ঞানের একটি কথা হইল—Right implies duties" অর্থাৎ কর্তব্য অধিকারের মধ্যেই নিহিত। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে কর্তব্যবোধ ও অধিকারবোধ জন্মে। মানুষের পরস্পরের উপর দাবী ও আস্থাই হইল কর্তব্য ও অধিকারের সামাজিক ভিত্তি। সামাজিক মঙ্গল বিধান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। নাগরিকগণের অধিকার স্বীকার করা ব্যতীত রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। আবার অধিকার যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। আমাদের মনে রাখা দরকার অধিকার অর্থ স্বেচ্ছাচার নহে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য হইতে অধিকার জন্মে। সুতরাং, সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগ করিবার প্রচেষ্টা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কর্তব্য যথাযথ পালনের ফলেই অধিকার পূর্ণ বিকাশ লাভ লাভ করে। অতএব, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

সামাজিক অধিকার—নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) জীবনধারণের অধিকার—ইহা দ্বারা আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলারক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ রোধ করিয়া ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

(২) স্বাধীনতার অধিকার—অবাধে ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাফেরার অধিকার না থাকিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। সকল সভ্য দেশেই ইহা প্রাথমিক সামাজিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়।

(৩) সম্পত্তির অধিকার—সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার সর্বত্রই স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু অধুনা ইহা ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

(৭) চুক্তি করিবার অধিকার—ইহা উপরি-উক্ত তৃতীয় শ্রেণীর অধিকারেরই অংশ বিশেষ। কিন্তু এই অধিকারেরও মাত্রা আছে এবং ইহা বর্তমানে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৫) বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—ইহাও ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

(৬) সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা—সরকার অনেক ক্ষেত্রে ইহারও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

(৭) পরিবার গঠনের অধিকার ও সামাজিক অধিকার।

রাজনৈতিক অধিকার—যে অধিকার বলে নাগরিকগণ শাসকবর্গকে মনোনয়ন করিতে পারে; শাসন-নীতি নির্ধারণ করিতে পারে, নিজে শাসনযন্ত্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে—এই জাতীয় অধিকারের নাম রাজনৈতিক অধিকার। এক কথায় ব্যবস্থা-পরিষদে ভোট দিবার ও নির্বাচনে যে কোন শাসন-সংক্রান্ত পদপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইবার অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলা চলে। মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে :—

(১) ভোট দিবার অধিকার—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সময়ের পর কয়েক বৎসরের জন্য (সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য) শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের জন্য ভোট হয়। নাগরিকগণের ভোটে যে-দলের অধিক সংখ্যক প্রার্থী আইনসভাতে আসন লাভ করে তাহারাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই ভোট দেওয়া নাগরিকগণের সর্বপ্রধান অধিকার।

(২) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার—প্রত্যেক নাগরিক যেমন ভোট দিতে পারে তেমনি প্রত্যেক নির্বাচনে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিতে পারে।

(৩) সরকারী কর্মগ্রহণের অধিকার—প্রত্যেক নাগরিকের উপযুক্ত হইলে দেশের সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার আছে।

(৪) বসবাস করিবার অধিকার—রাজ্যের যে কোন অংশে নাগরিকদিগের বসবাস করিবার অধিকার আছে।

(৫) বিদেশে থাকাকালীন নিরাপত্তার অধিকার—বিদেশে বাস করিবার সময়ও নাগরিকগণ যাহাতে নিরাপত্তার সহিত চলিতে পারে তাহাও রাষ্ট্র দেখিতে বাধ্য।

(৬) আবেদন ও প্রতিরোধের অধিকার—সরকার যদি জনস্বার্থ-বিরো কোন কার্য করে তবে নাগরিকগণ তাহার প্রতিবিধানের জন্য আবেদন করিতে পারে এবং আইনসঙ্গতভাবে প্রতিরোধ করিবার অধিকার তাহাদের আছে।

নাগরিকদের কর্তব্য—পূর্বেই বলিয়াছি নাগরিকদের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যও যুক্ত থাকে, যথা—(১) আদেশ পালন (Obedience)—ইহা নাগরিকদের প্রাথমিক কর্তব্য। আইন এবং নীতি এই দুই দিক হইতেই ইহা করণীয়। (২) আনুগত্য (Allegiance)—ইহা না থাকিলে কোন রাষ্ট্রই চলিতে পারে না। (৩) করপ্রদান—অর্থ ব্যতীত রাষ্ট্রের সকল মঙ্গলকার্য অচল হয়। কাজেই এবিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। ইহা ছাড়া, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রভৃতি আরো অনেকপ্রকার কর্তব্য আছে যেগুলি যথাযথভাবে পালন না করিলে কোন রাষ্ট্রই সুষ্ঠুভাবে চলিতে ও উন্নত হইতে পারে না।

পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন—পরিবার লইয়াই সমাজ এবং সমাজ লইয়া রাষ্ট্র। পরিবারের প্রধান কর্তব্য সন্তান প্রতিপালন। পরিবারই মানুষের আশ্রয়। শৈশবে কোন মানুষই মাতাপিতা অথবা আত্মীয়স্বজনের স্নেহযত্ন ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য সমাজবিজ্ঞানীদের মতে পরিবারই মানব-সমাজের আদিমতম এবং ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান। পরিবার দুই প্রকারের, যথা—(১) জৈবিক (Biological) ও (২) সামাজিক (Sociological)। মাতাপিতা ও তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়াই প্রথমশ্রেণীর পরিবার সৃষ্টি আর মাতাপিতা ও দত্তক সন্তানাদি রক্তের সহিত সম্পর্ক-হীন অন্যান্য আত্মীয়স্বজন লইয়া সামাজিক পরিবারের সৃষ্টি।

মানুষের পরিবার এককুল ও দ্বিকুল হইয়া থাকে। নিজ বংশ অথবা স্ত্রীর বংশের সন্তান-সন্ততি লইয়া যে পরিবার গঠিত হয় উহাই এককুল পরিবার এবং যে ক্ষেত্রে একটি পরিবার পুরুষ বংশের ও স্ত্রীর বংশের উভয়েই সন্তানাদিদ্বারা গঠিত হয় তাহাকে বলা হয় দ্বিকুল পরিবার। সভ্যসমাজে শেষোক্ত শ্রেণীর পরিবার বিরল বলিলেই হয়।

এককুল পরিবারের আবার দুইটি শাখা :—(১) পিতৃপ্রধান (Patriarchal) এবং (২) মাতৃপ্রধান (Matriarchal)। পিতৃপ্রধান পরিবারে সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই পরিবারের সর্বময় কর্তা এবং কর্তার নির্দেশই পরিবারটি পরিচালিত হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই জাতীয় পরিবার অধিক। মাতৃপ্রধান পরিবার বর্তমান সভ্যসমাজে বিরল। ইহার কিছু কিছু নিদর্শন আমাদের দেশে খাসিয়া, গারো এবং দক্ষিণ-ভারতের নায়ারদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

এককুল পরিবার আবার চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত :—(১) একপত্নীক পরিবার—ইহা মাতাপিতা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া গঠিত। সভ্যসমাজে এই জাতীয় পরিবারই বিদ্যমান। (২) বহুপত্নীক পরিবার—ইহা এক পিতা এবং একাধিক মাতার সন্তান-সন্ততি দ্বারা গঠিত। প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং অষ্টাদশ শতকের বাংলায় কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই জাতীয় পরিবার দেখা যাইত। (৩) বহু পতিত্বের পরিবার—ইহা একাধিক পিতা ও একটিমাত্র মাতার সন্তান-সন্ততি দ্বারা গঠিত। দক্ষিণ-ভারতের টোডাজাতি ইহার নিদর্শন। (৪) যৌথ পরিবার ; ভারতে একমাত্র হিন্দুদিগের মধ্যেই এই জাতীয় পরিবারের প্রচলন আছে ; ইহা পরিবারের নিজস্ব সন্তান-সন্ততি ব্যতীত বহু আত্মীয়স্বজন লইয়া গঠিত হইয়া থাকে।
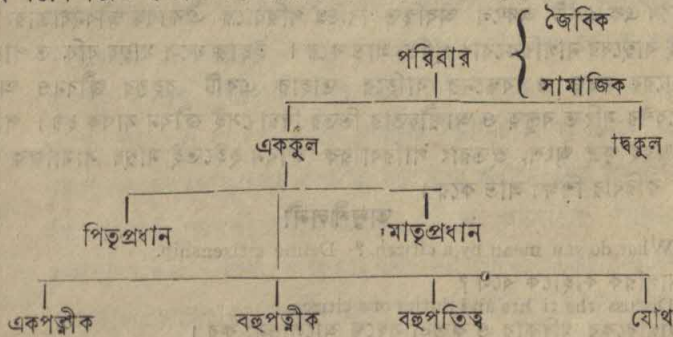
সমাজজীবনে পরিবর্তন—মানব পরিবার মাত্রেরই একটি আবাসস্থান থাকিবে, নতুবা উহা যাযাবর শ্রেণীতে পরিণত হইবে। একটি পরিবারের জীবনযাত্রা তাই বাসস্থানের মাধ্যমেই আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র বাসস্থান হইলেই চলে না ; খাদ্যের সংস্থানও দরকার ; সেইজন্য একটি পরিবারে খাদ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কর্মের বিভাগ দেখা যায়। আদিম যুগের মানুষের জীবন-যাত্রার এখন প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে। সভ্য সমাজে অর্থ প্রচলন হইবার পর হইতে প্রায়ই পুরুষদের উপর অর্থ উপার্জনের ভার পড়িয়াছে আর মেয়েদের দায়িত্ব হইল এই অর্থের দ্বারা পরিবারের সকলের খাদ্যের সংস্থান করা। সময়ের অগ্রগতির সহিত এবং প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে বর্তমানে অবশ্য এই চিরাচরিত জীবনধারায় পরিবর্তন দেখা দিয়াছে ; এখন অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই অর্থ উপার্জন করিতে হইতেছে।

আধুনিককালে মানুষের সমাজ-জীবনে বিপুল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। পরিবর্তনের সহিত জটিলতারও সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার জীবন-যাত্রার প্রণালীতেও দেখা দিয়াছে আমূল পরিবর্তন। সুদূর অতীতে একটি পরিবারের পক্ষে একটিমাত্র ভূমিখণ্ড যথেষ্ট ছিল। তখন জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক বির্বতনের ফলে পারিবারিক সংগঠন বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই যৌথ পরিবারের আদর্শ শিথিল হইয়া আসিতেছে। যৌথ পরিবারের দোষ-ত্রুটি দুই-ই আছে তথাপি একথা স্বীকার্য যে আমাদের সমাজজীবনে, অধিকতর সুখ, শান্তি, শৃঙ্খলতা ও সংঘবদ্ধতা আনিয়া দিবার পক্ষে ইহার আদর্শ বিশেষ কার্যকরী আর ইহারই মাধ্যমে মানুষের নাগরিক চেতনা বিকাশ লাভ সম্ভব।

সমাজ-জীবনে সহযোগীতা—ছোট বড় কয়েকটি পরিবার মিলিয়া একটি অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। ইহারই স্থানীয় জনসমষ্টি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ধরণের আঞ্চলিক জনসমষ্টি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই সহযোগীতা দৈহিক, নৈতিক এবং আর্থিক হইতে পারে। এইভাবে এক একটি অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন পরিবারে ঐক্যবদ্ধ জীবনযাত্রার ভিতর দিয়াই বানুষের নাগরিকবোধ পূর্ণতা লাভ করে। ইহার ফলে মানুষ বুঝিতে পারে যে পরিবারের সম্বন্ধ ও বন্ধনের বাহিরে তাহার একটি বৃহত্তর জীবনও আছে ; প্রতিবেশীর সহিত বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার ভিতর দিয়া সেই জীবন সার্থক হয়। পরিবার সমাজেরই ক্ষুদ্র অংশ, সুতরাং পারিবারিক জীবন হইতেই মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করিবার শিক্ষা লাভ করে।

অনুশীলনী

1. What do ycu mean by a citizen. ? Define citizenship.
   নাগরিক কাহাকে বলে ?
2. Discuss the ri hts and duties of a citizen.
   নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।
3. Indicate the differences between the ancient social life and modern social life and discuss the causes of the differences.

   মানুষের প্রাচীন সমাজ-জীবন ও আধুনিক সমাজ-জীবনের প্রভেদগুলি নির্দেশ করিয়া উহার কারণগুলি আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জনসমষ্টির স্বাস্থ্য

ভূমিকা—বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মানুষ ভিন্ন উন্নত সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জনসমষ্টির জীবনে যেমন নৈতিক আদর্শের প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি আছে তাহাদের জীবনে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা। আমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে পড়িয়াছি যে, স্বাস্থ্যই মানুষের প্রকৃত সম্পদ। ইহা ব্যক্তিগত মানুষের জীবনে যেমন সত্য, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে অর্থাৎ জনসমষ্টির জীবনে তাহা অপেক্ষা আরো বেশী সত্য। রাষ্ট্রকে তাই জনসমষ্টির স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং ইহার জন্যই প্রত্যেক উন্নত রাষ্ট্রে একটি করিয়া জনস্বাস্থ্য (Public Health) বিভাগ থাকে। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিলে জনসমষ্টির জীবনী-শক্তি হ্রাস পায় এবং জীবনী শক্তিবিহীন জনসমষ্টি দ্বারা গঠনমূলক কোন কার্য হইতে পারে না। বংশপরম্পরায় যদি ইহা চলিতে থাকে তাহা হইলে একদিন প্রকৃতির নিয়মে সেই জনসমষ্টির অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের জনস্বাস্থ্য—একশত বৎসর পূর্বে সৈন্যগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে রাজকীয় কমিশন বসে তাহা অসামরিক জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। তারপর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলার 'কমিশন অব পাবলিক হেলথ' গঠিত হয়। এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশ সমূহে কয়েকটি 'স্যানিটারী কমিশনার' এর পদ সৃষ্টি হয়। বিংশ শতকের গোড়াতেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি জনস্বাস্থ্য বিভাগ খোলা হয়। ইহাই পরবর্তী কালে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা যখন আরো বৃদ্ধি হইল, তখন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার 'কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা' বোর্ড গঠন করিলেন। ইহা ভিন্ন জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরো কয়েকটি সর্বভারতীয় বোর্ড গঠিত হয়। স্বাস্থ্য-বিষয়ক ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শদানই এই বোর্ডগুলির উদ্দেশ্য।

বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রধানত রাজ্যেরই বিষয়। এজন্য প্রতি রাজ্যে একজন

করিয়া 'ডিরেক্টর রব পাবলিক হেলথ' নামক অফিসার রোগ ও মহামারী নিবারণের কার্যে নিযুক্ত আছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসের অধীনে আনা হইয়াছে। স্বাধীনতালাভের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় একটি পৃথক স্বাস্থ্য-দপ্তর সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতে প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার যেখানে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ছিল ২৩·৭ জন, সেখানে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইয়াছে ১৩·০ জন। তথাপি এই মৃত্যুর হার অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। মেলেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, কলেরা, বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি রোগে বৎসরে বহুলোক মারা যায়। হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে সাত কোটি লোক ম্যালেরিয়া রোগে ভোগে আর ইহাতে মারা যায় তিন লক্ষ লোক। ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দরুণ মাথাপিছু খরচের হার সর্বাধিক। এখানে প্রতি বৎসর গড়ে নয় হইতে দশলক্ষ টাকা জনস্বাস্থ্যের জন্য খরচ হইয়া থাকে। ইহার ফলে এই রাজ্যে মৃত্যুর হার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। যেখানে ত্রিশ বৎসরপূর্বে মৃত্যুর হার ছিল হাজার প্রতি ২৯৮, সেখানে বর্তমানে উহা হাজার প্রতি ৮·২তে দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গড় আয়ুর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মৃত্যুর হার বর্তমানে যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে ৩৮০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রহিয়াছে; এই স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে স্থানীয় জনসমষ্টির যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের মানও পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। গ্রাম অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বড় অভাব এবং ইহার জন্য জনসমষ্টির দুর্দশার সীমা থাকে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ত্রিশ হাজার গ্রামে পানীয় জলের সত্র আছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টির স্বাস্থ্যের তদারক করিবার জন্য প্রতি দেড় হাজার লোকের জন্য একজন করিয়া চিকিৎসক আছেন। এই রাজ্যের ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণদলের কার্যের ফলে প্রায় দুই কোটি কুড়ি লক্ষ লোক প্রতি বৎসর উপকৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সদর হাসপাতালের সংখ্যা ১৫টি আর মহকুমা হাসপাতালের সংখ্যা ৩১টি।

নাগরিকতার গুণাবলী ও কর্তব্য—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন স্বাকরতা নাগরিকের একটি প্রধান গুণ। প্রাচীন ভারতে নাগরিকজীবন যে কত উন্নত ছিল কৌটিল্য ও মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে তাহা আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। একদিকে

শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে, অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্ররূপে, এবং অন্যদিকে বিলাস-প্রাচুর্যময় স্বচ্ছন্দ ও নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের আদর্শ স্থান হিসাবে প্রাচীন ভারতের প্রত্যেকটি 'পুর' বা নগর বিশেষ উন্নত ছিল। ইহার মূলে ছিল প্রত্যেক পুরবাসীর সৌন্দর্যবোধ এবং উন্নত নাগরিক জীবনযাপনের একটি সংঘবদ্ধ চেতনা।

প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন এবং রাষ্ট্রানুমোদিত আইনসঙ্গত জীবনযাপন; (২) সমাজের মঙ্গলসাধন। আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য, উন্নততর নাগরিক এবং সমাজজীবন গড়িয়া তোলা। বিশিষ্ট রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ নাগরিক কর্তব্যের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। (১) প্রথম কর্তব্য আনুগত্য স্বীকার; (২) দ্বিতীয় কর্তব্য আইন মান্য করিয়া চলা; (৩) তৃতীয় কর্তব্য নিয়মিতভাবে কর দেওয়া; (৪) চতুর্থ কর্তব্য ভোটাধিকারের উপযুক্ত ব্যবহার এবং (৫) পঞ্চম কর্তব্য হইল গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যোগদান করা। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক নাগরিককে আরো কয়েকটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়; যেমন—দলাদলির মনোভাব বর্জন করা, সর্বসাধারণের কল্যাণমূলক কার্যে যোগদান করা ও সকলের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা, নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে সজাগ থাকা এবং নিজের সন্তান-সন্ততি ও জনসাধারণের শিক্ষার বিষয়ে অবহিত হওয়া।

জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ নিবারণ—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি যথাযথভাবে পালন না করিলে ব্যক্তি-মানুষ যেমন সুস্থ দেহে জীবন যাপন করিতে পারে না তেমনই গোষ্ঠী-মানুষও সুখী হইতে পারে না। ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জনসমষ্টিকে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিতে হইবে। আমরা জানি খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান—এইগুলি সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনযাত্রার প্রধান উপাদান এবং বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা ভিন্ন এইগুলির উন্নতি সুদূর পরাহত।

স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান খাদ্য। জনস্বাস্থ্যেরও ইহাই প্রধান উপাদান। খাদ্যই দেহের ক্ষয়পূরণ করে। কেবলমাত্র ক্ষয়পূরণের জন্য নহে দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধনের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য শরীরের শক্তি যোগায় এবং তাপ উৎপাদন করে।

সুতরাং খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কোন অংশে কম নহে। এই খাদ্য যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও সুষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ব্যাধির কবলে পড়িয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইতেছে। ইহারই জন্য ভারতের জনসমষ্টির স্বাস্থ্য দিন দিন অবনতির পথে যাইতেছে। সুতরাং উন্নততর খাদ্য-পরিকল্পনা ভিন্ন জনসমষ্টির স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান অসম্ভব। আবার পুষ্টিকর খাদ্য ব্যতীত, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নাই। পুষ্টিকর খাদ্য ব্যয়বহুল; সেইজন্য আমাদের দেশে বহু দরিদ্র পরিবার পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে অক্ষম। সমাজের যে অংশে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, সেই অংশেই সাধারণতঃ মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়।

পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা—খাদ্য-বিজ্ঞানীদের মতে দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের ভিতর কয়েকটি বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন। প্রোটিন, ক্যাল-সিয়াম, ফসফরাস, লৌহ এবং এ, বি, সি, ডি ভিটামিনগুলি মানুষের খাদ্যের প্রধান উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এই উপাদানগুলি ব্যতীত দেহের পুষ্টি হইতে পারে না। ইহাদের যে-কোন একটি কম হইলে শরীরের পুষ্টি স্বভাবতই ব্যাহত হয়। ভিটামিন হইল খাদ্যপ্রাণ। জীবন ধারণের পক্ষে ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয়। ইহা চক্ষে দেখা যায় না। ভিটামিন ব্যতীত দেহের পুষ্টি বা বৃদ্ধি কিছুই হইতে পারে না। আবার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন উপাদানযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বালক, যুবক ও বৃদ্ধের খাদ্য তাই এক রকমের হইতে পারে না। খাদ্য-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একজন সুস্থ ও সবল ব্যক্তির (যাহাকে কায়িক পরিশ্রম করিতে হয়) প্রতিদিন ৩০০০ হইতে ৪০০০ হাজার ক্যালোরি খাদ্যের প্রয়োজন। ক্যালোরি হইল দেহের তাপশক্তি। এই যে আমরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিবিধ কাজকর্ম করিতেছি এবং মানসিক পরিশ্রম করিতেছি, ইহার ফলে দেহের কর্মশক্তি হ্রাস পায়। ইহা পূরণ করা দরকার, নতুবা শরীর কর্মক্ষম থাকিবে না। ইহারই জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণের ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করিবার নিয়ম। মানুষের শরীর এমন ভাবেই গঠিত হইয়াছে যে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরির অভাব ঘটে, তাহা হইলে ইহা কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলিতে বাধ্য। দুধ, মাখন, ছানা, চিনি, মাছ, মাংস ডিম ইত্যাদি খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য বেশী। উপযুক্ত

সুষম খাদ্য নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিবার একটি সুফল এই যে ইহার ফলে শরীর নীরোগ থাকে।

এইসব খাদ্য স্বভাবতই ব্যয়সাধ্য এবং দরিদ্র লোকের পক্ষে এইরূপ ব্যয়সাধ্য খাদ্যের সংস্থান করা কঠিন। তাই ইহার পরিবর্তে যে সকল কম মূল্যের খাদ্যে ক্যালোরি-মূল্য অধিক, সেইসকল খাদ্যের ব্যবস্থা করাই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উচিত। ডাল, সিম, কাঁচা ও পাকা কলা, টম্যাটো, লেবু, শাক সব্জি প্রভৃতি খাদ্যের মধ্যেও ক্যালোরি-মূল্য যথেষ্ট আছে। ইহা ব্যতীত ডুমুর, বেল, খেজুর প্রভৃতিও যথেষ্ট পুষ্টিকর। কিন্তু খাদ্যের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারাই খাদ্য-প্রাণ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রায় সকল গৃহস্থের ঘরে রন্ধনের ব্যাপারে সাধারণত যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে; কারণ, এই প্রকার অতিরিক্ত তৈল ও মসলাদি দ্বারা রন্ধনের জন্য খাদ্যের ভিটামিন বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে সিদ্ধ করিয়া রন্ধন করিবার যে ব্যবস্থা বিদ্যমান তাহাতে ভিটামিন নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। বর্তমানে তাই প্রায় সকল সভ্যদেশেই জনস্বাস্থ্যের খাতিরে তরি-তরকারি, শাক-সবজি প্রভৃতি শুধু সিদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। আবার টম্যাটো, গাজর প্রভৃতি কাঁচা খাইবার রীতিও আছে, ইহা দ্বারা এইসব খাদ্যের সমুদয় ভিটামিন পাওয়া যায়।

বাসস্থানের গুরুত্ব—কিন্তু কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলেই মানুষের স্বাস্থ্য ষোল আনা সংরক্ষিত হয় না। এইখানেই বাসস্থানের গুরুত্ব। আমরা যদি উৎকৃষ্ট প্রোটিনযুক্ত বা ভিটামিনযুক্ত খাদ্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করি অথচ আলো-বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে এবং অপরিচ্ছন্ন ঘরে বাস করি তাহা হইলে শরীর কিছুতেই নীরোগ থাকিতে পারে না, অসুখ-বিসুখ হইবেই। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীমাত্রেই এই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আধুনিক যুগে সকল উন্নত দেশে তাই মানুষের ব্যসবাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। উপযুক্ত পরিকল্পনা ভিন্ন স্বাস্থ্যপ্রদ বাসস্থান নির্মিত হইতে পারে না। আলো এবং বাতাস—এই দুইটি হইল বাসস্থানের গোড়ার কথা। আমাদের পরিবেশের চারিদিকে কত জীবাণু রহিয়াছে। সূর্যের তাপ ইহাদিগকে ধ্বংস করে। অতএব যে গৃহে অবাধ সূর্যের আলো, সেইরকম গৃহই আমাদের বসবাসের উপযোগী। বাতাস হইতে আমরা অক্সিজেন পাইয়া থাকি;

অক্সিজেন ভিন্ন আমরা এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারি না। কাজেই যে গৃহে প্রচুর বাতাস আসিতে পারে, বাসস্থানের পক্ষে সেই রকম গৃহই উপযোগী। আলো-বাতাসের পরেই হইল বাসস্থানের স্থান-নির্বাচনের প্রশ্ন। সেইজন্য জলীয় বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে জীবাণুর সৃষ্টি হয়। উঁচু এবং শুষ্ক স্থানের উপরই বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত। সভ্য মানুষের বাসস্থান বলিতে শয়নঘর, রান্নাঘর, এবং বৈঠকখানা যুক্ত গৃহকেই বুঝায়। শয়নঘরেই সাধারণতঃ প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখিবার বিধি। এই ঘরগুলি আবার আয়তনে বড় হওয়া দরকার। বাসস্থানের রন্ধনগৃহটি বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিষ্কার রান্নাঘর স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। রান্নাঘরের ব্যবস্থা এমন করিতে হইবে যাহাতে ধোঁয়া বাহির হইয়া যায় এবং আলো-বাতাস আসিতে পারে। এছাড়া বাসস্থানের পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাও উন্নত হওয়া দরকার। জলই জীবন। পানীয় জলের সহিত যাহাতে রোগ-জীবাণু মিশিয়া না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পানীয়জলের গুরুত্ব—পানীয়জল জনস্বাস্থ্যের আর একটি উপাদান। জলের মাধ্যমে নানা রকম রোগজীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগগুলির জীবাণু জলবাহী—পানীয় জলের মাধ্যমেই এই রোগগুলি সাধারণত জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ভারতের গ্রামে পানীয় জল একটি সমস্যা। বহু গ্রামে বৈশাখ মাসে পুকুরগুলি শুকাইয়া গিয়া কষ্টজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সমস্যা দূর করিবাব জন্য সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ হইতে গ্রামে গ্রামে নলকূপ বা টিউব-ওয়েল্ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শহর অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল।

পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব—বিশুদ্ধ খাদ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ গৃহ যেমন স্বাস্থ্যের অনুকূল তেমনই পোশাক-পরিচ্ছদের উপর জনসমষ্টির স্বাস্থ্য প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। জীবাণু কেবলমাত্র খাদ্যের মধ্যে বা অপরিচ্ছন্ন বাসস্থানেই থাকে না, অপরিষ্কার পোশাকও ইহাদের আশ্রয়স্থল। এইজন্যই সভ্য সমাজে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধানের রীতি আছে। পোশাক-পরিচ্ছদের অন্য প্রয়োজনীয়তাও আছে; ইহা আমাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে এবং দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ সংরক্ষণ করে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব—কিন্তু বিশুদ্ধ খাদ্য, পরিচ্ছন্ন গৃহ ও পরিচ্ছদ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সত্ত্বেও রোগ-ব্যাধি হইবেই। সভ্য মানুষ ইহার বিরুদ্ধেও আজ সংগ্রাম করিতে শিখিয়াছে। জনস্বাস্থ্যে আজ তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানকে নিয়োজিত করা হইয়াছে। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধক টিকা দিবার ব্যবস্থা দ্বারা মানুষকে এইসব রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ম্যালেরিয়া আর একটি দুরন্ত ব্যাধি; জীবাণু-বাহী এ্যানোফিলিস মশক দ্বারা ম্যালেরিয়া ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে তাই মশকের উৎপাত নিবারণের জন্য ডি, ডি, টি, নামক একপ্রকার কেমিক্যাল পাউডার গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কুইনিন, প্যালুড্রিন প্রভৃতি ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থাও হইয়াছে।

জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক জীবন—ইংরাজিতে একটি কথা আছেঃ 'Not by bread alone' অর্থাৎ কেবল মাত্র খাওয়া-দাওয়াই জীবনের সার কথা নহে। তাহা যদি হইত তবে মানুষের সহিত মনুষ্যেতর প্রাণীর পার্থক্য কোথায় রহিল? মানুষ তাই সভ্যতার পথে ধাপে ধাপে যেমন অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি সে দেহের পরিপুষ্টির সহিত মানসিক পরিপুষ্টির কথাও বিশেষভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। সমাজজীবনে যদি সংস্কৃতি না থাকিত, আমোদ-প্রমোদের (Recreation) ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে তাহার জীবন দুর্বিষহ হইত। সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি জীবনযাত্রার মান ও শিল্প। কোন জনসমষ্টির সংস্কৃতির পরিমাপ করা যায় তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও জীবনযাত্রার মান দেখিয়া। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের জীবনযাত্রা এক ধরণের নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন দেশে মানুষের বিভিন্ন জীবনযাত্রা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জনসমষ্টির জীবনযাত্রার ধরণ হইতে শীতপ্রধান দেশের জীবনযাত্রার ধরণ পৃথক। মানুষের জীবন বর্তমানে কর্মবহুল হইয়া উঠিয়াছে। কাজের চাকার সহিত তাহার জীবনটি যেন বাঁধা। উদয়াস্ত তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু এই কর্মময় জীবনে যদি নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের অবস্থা আজ কি দাঁড়াইত? জীবন যদি কর্মের চাপে একঘেয়ে ও দুর্বিষহ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে জীবনের মূল্য

কোথায়? এইজন্যই আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধুলা ও লাইব্রেরী প্রভৃতির প্রয়োজন সকল সভ্য সমাজেই আজ বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দেহের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুস্থ দেহে পঙ্গু মন সমাজের বিশেষ কোন উপকারে আসিতে পারে না। সেইজন্যই সংস্কৃতির সহিত ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ, পার্ক, লাইব্রেরী প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে। জনসমষ্টির জীবনে শান্তি-বিনোদনের জন্য বর্তমানে সকল রাষ্ট্র হইতেই বিবিধ প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

সংগঠন ও শিক্ষার মূল্য—ইংরেজী মনীষী কার্লাইল বলিয়াছেন—Politics is not the sole aim of a man's life—অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শই মানুষের একমাত্র আদর্শ হইতে পারে না। তাহার জীবনে আরো নানা দিক আছে, নানা আদর্শ আছে। এই সব বিভিন্ন আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য মানুষ নানা রকম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সভ্যসমাজে আমরা মানুষের বিভিন্ন আদর্শের স্ফূরণ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এইভাবে বিভিন্ন আদর্শের উপলব্ধির ভিতর দিয়াই মানুষ পূর্ণতা লাভ করে এবং এইজন্যই পৃথিবীতে বর্তমানে নানাপ্রকার ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের জীবনে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই পৃথিবীতে এত রকমের সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছে। জনসমষ্টির প্রচেষ্টাতেই এই জাতীয় সংগঠন গড়িয়া উঠে এবং ইহাদের দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এইরকম বেসরকারী সমাজকল্যাণ সংস্থা বহু আছে।

শিক্ষাসম্পর্কিত সর্বভারতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এইজন্য ভারতসরকারের অধীনে একটি শিক্ষাদপ্তর রহিয়াছে। জাতির উন্নতি-অবনতি যাচাই করিবার প্রকৃষ্ট মাপকাঠি হইতেছে শিক্ষা। জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মুখ্য দায়িত্ব হইতেছে রাজ্য সরকারের। সমাজের শিক্ষা রাজ্যসরকারের দায়িত্ব হইলেও জনসমষ্টির জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি তাহা বিশদভাবে না বলিলেও চলে। মানুষের লক্ষ্য কি? সে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে চায়। শিক্ষা ভিন্ন এই দুইটি হইবার নয়। বর্তমানে তাই প্রগতিশীল অগ্রসর রাষ্ট্রই ব্যাপকভাবে

শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস পাইতেছেন। শিক্ষা-প্রসারের প্রথম স্তর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বর্তমান ভারতসরকার বহু প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা ছাড়া মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ভারতসরকার বহু টাকা খরচ করিতেছেন। ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার না হইলে জনসমষ্টির মনে কোন বিষয়েই দায়িত্ববোধ জন্মিতে পারে না। শিক্ষিত জনসমষ্টি তাই রাষ্ট্রের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

অনুশীলনী

1. How can we preserve public health and prevent diseases ?
   আমরা কিভাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ নিবারণ করিতে পারি ?
2. Describe the importance of Education and Culture in the community.
   জন-সমষ্টির জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জনসমষ্টি ও সরকার

শাসক ও শাসিত শ্রেণী ঃ সভ্যদেশের জনসমষ্টিকে একটা রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিতে হয়। জনসমষ্টিকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি, যথা—(১) শাসক-শ্রেণী এবং (২) শাসিত শ্রেণী। যাহারা রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, আর যাঁহারা ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হন তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই বেশি : একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত সেই বিষয়ে বিশেষ কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। আয়তনের অনুপাতে এই সংখ্যা কোথাও কয়েক লক্ষ, আবার কোথাও বা কয়েক কোটিও হইতে পারে। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল বলেন যে—সুশাসনের উপযোগী জনসংখ্যাই একটি রাষ্ট্রের পক্ষে কাম্য। তবে সাধারণ নিয়ম এই যে, একটি রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদ যে পরিমাণে থাকিবে উহার আয়তন সেই তুলনায় হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা জনসংখ্যার আধিক্য ঘটিলে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা।

রাষ্ট্র ও সরকার ঃ আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, একটি দেশের জনসংখ্যা তিন শ্রেণীর, যথা—নাগরিক, প্রজা ও বিদেশী; এবং ইহাদের মধ্যে কি পার্থক্য তাহাও আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইখানে রাষ্ট্র ও সরকার বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিব। রাষ্ট্র ও সরকার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইলেও, রাষ্ট্র ও সরকার এক পদার্থ নহে। সরকার রাষ্ট্রের একটি অংশ-বিশেষ হইলেও, রাষ্ট্রের সমস্ত ইচ্ছা সরকারের কার্যাবলীর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সরকারই আমাদের নিকট প্রধান বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এই তিনটি পার্থক্য আমাদের মনে রাখা দরকার যথা—(১) রাষ্ট্র একটি সামগ্রিক পদার্থ ; সরকার ইহার একটি অংশমাত্র। (২) রাষ্ট্র একটি অমূর্ত ধারণা (Abstract idea), আর সরকার হইল একটি মূর্ত পদার্থ, কারণ ইহা কয়েকটি লোক লইয়া গঠিত। (৩) সমস্ত রাষ্ট্রের লক্ষণ এক, কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রই জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমিত্ব—এই চারিটি উপাদানে গঠিত। লক্ষণ এক হইলেও রাষ্ট্রের শ্রেণীভেদ আছে, যেমন ইংলণ্ডে 'রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র' ভারতে 'গণতন্ত্রী রাষ্ট্র', আবার কোন দেশে 'সামন্ততন্ত্র', কোথাও বা 'একানায়ত্ব শাসন' বর্তমান।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ ঃ এ্যারিষ্টটলের মতে শাসকমণ্ডলী দুই শ্রেণীর, যথা—(১) সরকারের ক্ষমতা কত জনের উপর দেওয়া হইয়াছে, এবং (২) সরকারের উদ্দেশ্য কি? সরকারের কার্যের ভাল-মন্দ দেখিয়াই আমরা সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকি। দেশের শাসনব্যবস্থা যখন জনসাধারণের হিতার্থে পরিচালিত হয়, তখন আমরা উহাকে স্বাভাবিক (normal) সরকার বলি; আবার, সরকার যখন নিজে স্বার্থচিন্তা করিয়া কাজ করেন, তখন উহাকে বলা হয় কুশাসন। যখন শাসনব্যবস্থা একটিমাত্র লোকের হাতে ন্যস্ত হয় এবং তিনি কেবল নিজের স্বার্থসাধন করেন তখন উহাকে বলা হয় স্বৈরাচারতন্ত্র; আবার যেখানে বহুলোক দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিচালিত হয়, উহাকে বলা হয় গণতন্ত্র। গণতন্ত্রই বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিয়া সকল সভ্যদেশে স্বীকৃত হইয়াছে। এ্যারিষ্টটলের মতে শাসনব্যবস্থা তিন প্রকারের; যথা—(১) রাজ-তন্ত্র (Monarchy) (২) অভিজাত-তন্ত্র (Aristocracy) এবং (৩) পলিটি (Polity) বা গণতন্ত্র। বর্তমান যুগের সরকার প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা—একনায়ক-তন্ত্র ও গণতন্ত্র

যে শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একজনের উপর ন্যস্ত থাকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে বলা হয় **একনায়ক-তন্ত্র** (Dictatorship); আর জনসাধারণের উপর যখন দেশের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তখন উহাকে বলা হয় **গণতন্ত্র** (Democracy)। গণতন্ত্র আবার দুই শ্রেণীর; যথা—(১) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional or limited monarchy) এবং (২) রিপাবলিক (Republic)। প্রথমটিতে রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ; এই ক্ষেত্রে রাজা থাকিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণদ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রীদের উপরই রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। আর দ্বিতয়টিতে রাষ্ট্রে রাজা থাকে না; জনসাধারণদ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিরাই শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। গণতন্ত্র একক (unitary) হইতে পারে, আবার যুক্তরাষ্ট্র (Federation) হইতে পারে। প্রথমটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসনকার্য একটি সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের যাবতীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার এই উভয়ে মিলিয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি স্ব স্ব সীমার মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি : গণতান্ত্রিক শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হয়? সাধারণতঃ দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ অথবা রাষ্ট্রপতি ইহা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রের শাসনভার মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিলে উহাকে মন্ত্রিপরিষদের শাসন বলা হয়। এই শ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রকৃতি সাধারণতঃ এইরূপ থাকে: প্রথমত জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি আইনসভা গঠিত হয় এবং তৎপরে উক্ত আইনসভায় যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে সদস্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং ইহারাই তখন রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং তাঁহাদের কার্যের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। ইহাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দায়িত্বশীল সরকার বা Responsible Government বলা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে জনসাধারণ একজনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে এবং তিনিই জনসাধারণের নির্দেশমত রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে শাসনকার্য পরিচালন করিয়া থাকেন।

সমাজ-জীবনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা: বর্তমানকালে প্রায় সকল সভ্য দেশেই রাষ্ট্রের শাসনকার্য নির্বাচিত জনসমষ্টিদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। নির্বাচক-মণ্ডলীদ্বারাই (Electorate) এই সব নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। এক-একটি এলাকায় নির্বাচন-প্রার্থীদের জন্য প্রথমে নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত হয়। তারপর তাহারা ভোট দিয়া বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্য হইতে তাহাদের মনোমত এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সমর্থন করে। নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনে ভোট-দাতা তাঁহার রুচি ও মতানুযায়ী তাঁহার মতাবলম্বী এক বা একাধিক প্রার্থীকে ভোট দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। ইহাই গণতন্ত্র-সম্মত নির্বাচন। বিভিন্ন রকম নির্বাচন-পদ্ধতি প্রচলিত। এইভাবে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির (যথা—মিউনিসিপ্যালিটি) নীতি ও কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন।

নির্বাচন দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা—(১) প্রত্যক্ষ (direct) এবং (২) পরোক্ষ (indirect) নির্বাচন। যেখানে ভোটদাতাগণ সোজাসুজি ভোটদ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করেন সেখানে বলা হয় প্রত্যক্ষ নির্বাচন; আর যে ক্ষেত্রে ভোটদাতাগণ কয়েকজন নির্বাচক (electors) বাছিয়া লন এবং পরে সেই নির্বাচকেরা প্রকৃত প্রার্থীকে নির্বাচন করেন, তাহাকেই বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন।

জনসাধারণ (ভোটাধিকার প্রাপ্ত)
|
নির্বাচকমণ্ডলী
|
নির্বাচন-প্রার্থী (প্রতিনিধি)
|
ভোট
|
প্রত্যক্ষ — পরোক্ষ

প্রসঙ্গতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের দোষগুণের কথা বলা দরকার। অনেক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর মতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথা কিছু জটিল। প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকারের (adult franchise) উপর ইহার ভিত্তি এবং ইহাদের সকলেই শিক্ষিত নহে। বেশির ভাগই অশিক্ষিত এবং সেইজন্য ভোটদানের সময় ইহারা নির্বাচনে অবতীর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামতদ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রলোভনেও ইহারা অনুপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনের একটি সুবিধা এই যে, এই ক্ষেত্রে জনসমষ্টি নিজেরাই প্রতিনিধি নির্বাচন করে বলিয়া তাহারা বিভিন্ন প্রার্থীদের নীতি বিচার করিবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক প্রার্থীকে ভোটদাতার নিকট যাইয়া তাহার ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালীও ব্যাখ্যা করিতে হয়। ইহার ফলে জনসাধারণের কিছু রাজনৈতিক শিক্ষাও হয় অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিকের সহিত তাহারা পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

পরোক্ষ নির্বাচনে বিশেষ কোন জটিলতা নাই। এক্ষেত্রে জনসাধারণ যোগ্য লোকের হাতে নির্বাচন ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে যথার্থ উপযুক্ত প্রার্থীর রাজনৈতিক মতামত ও তাহার কার্যাবলীর যথাযথ বিচার করা সম্ভব হয়। পরোক্ষ নির্বাচনে দ্বন্দ্ব বা বিবাদের ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। তবে পরোক্ষ নির্বাচনে একটি বিশেষ ত্রুটি এই যে, জনসাধারণ দূরে থাকে এবং তাহাদের হাতে প্রতিনিধি-নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে না। ইহার ফলে সুগঠিত রাজনৈতিক দল তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার সুযোগ পায়, কারণ তাহারা ঘুস দিয়া স্বল্পসংখ্যক নির্বাচককে অনায়াসেই প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হয়। সকলের উপর বড় কথা হইল এই, যে, পরোক্ষ নির্বাচনে জন-

সাধারণ তাহাদের ভোটাধিকার (franchise) পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে পারে না এবং ইহার দরুণ গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেকখানি ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই যে ভোট দিবার অধিকার—ইহাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক অধিকার। ইহা দ্বারা তাহারা আইনসভার গঠন ও নীতি নির্ধারণ করে। জাতি, ধর্ম, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে যে সার্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Suffrage) তাহার গুণ ও দোষ দুই-ই আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসাধারণের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সরকারের নীতি নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সকলকেই দেওয়া উচিত। জনসাধারণ যদি তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বভাবতঃই দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়ে। ফলে নাগরিক দায়িত্ব-পালনে তাহাদের আগ্রহ হ্রাস পাইবে। সার্বজনীন ভোটাধিকার না থাকিলে শাসকশ্রেণী জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিবে না এবং তাঁহারা জনসাধারণকে উপেক্ষা করিবে, ইহা অতি সত্য। আবার অনেকের মতে, যাহারা ঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে সক্ষম, কেবলমাত্র তাহাদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। এইখানে শিক্ষার প্রশ্নটি আসে। শিক্ষাব্যতীত দেশের রাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যে জনসাধারণ প্রবেশ করিতে পারে না। আবার জনসাধারণের শিক্ষা মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের দায়িত্ব—রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করিয়া তোলা অথবা শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া। যেখানে সুযোগ নাই, বুঝিতে হইবে সে ক্ষেত্রে সরকারের ত্রুটি রহিয়াছে এবং সরকারের ত্রুটিতে জনসাধারণের ভোটাধিকার হরণ করা কোনমতেই উচিত না।

পূর্বে অনেক দেশেই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইত না। বর্তমানে এই মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে এবং এখন অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ভোটদানের যোগ্যতা আছে এমন প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে দায়িত্বশীল সরকার ছিল না। তখন আইন-পরিষদ ছিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের অতি সামান্য অংশের ভোটাধিকার ছিল। সুখের বিষয় ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করিবার পর এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে এবং ভারতের সংবিধানে জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

ভোটাধিকার ও রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে নাগরিকের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক অধিকার হইল ভোটাধিকার। পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বশ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। যে সরকার জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে তাহাকেই আমরা গণতন্ত্রী সরকার বলিয়া থাকি। এই যে ভোটাধিকার—যাহা মানুষের জন্মগত অধিকার বলিয়া স্বীকৃত—ইহাই জনসাধারণকে দেশের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণের এবং নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়া থাকে। পূর্বে গণতন্ত্রের যে রূপ ছিল বর্তমানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ তাহা আর নাই। পূর্বে গণতন্ত্র ছিল জনসাধারণের প্রত্যক্ষ শাসন, আর বর্তমানের গণতন্ত্র হইতেছে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা পরোক্ষ শাসন। নাগরিকের ভোটাধিকার যেমন আছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় কার্যেও যোগদান করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। ইহাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)। রাজনৈতিক অধিকার বলিতে সাধারণতঃ এইগুলি বুঝায়, যথা—(১) ভোটাধিকার ; (২) সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার ; এবং (৩) রাজনৈতিক সভা ও কার্যে যোগদান করিবার অধিকার।

রাজনৈতিক দল ঃ সমাজ জীবনে রাজনীতি ব্যতীত মানুষ থাকিতে পারে না। রাজনীতি তাহার সমাজচেতনার উত্তুঙ্গ শীর্ষ। সকল দেশেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যতালিকা (Programme) লইয়া এক বা একাধিক রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোক বিদ্যমা-, সেইহেতু এই সব বিভিন্ন দলের সমর্থকের অভাব হয় না। প্রত্যেক দলকে জনসাধারণের নিকট নিজ নিজ কার্যতালিকা ও উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া তাহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিতে হয় এবং প্রত্যেক দলের আসল লক্ষ্য হইল অধিকসংখ্যক জনসাধারণ সমর্থন লাভ করিয়া সরকার গঠন করা। এইভাবেই সকল সভ্যদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি রাজনৈতিক দলের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, যথা—(১) যাহারা দল গঠন করিবে, তাহাদের দলের কার্যসূচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া চাই ; (২) রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে সর্ব অবস্থায় দলীয় স্বার্থ বা আদর্শ রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে ; এবং (৩) দলের সদস্যগণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে।

এখন দেখা যাক এই রাজনৈতিক দলগুলি কি ভাবে সরকার গঠন করিয়া থাকে।

ভোটাধিকারপ্রাপ্ত জনসাধারণের নিকট হইতেই তাহাদিগকে সরকার-গঠনের ক্ষমতা লাভ করিতে হইবে। এক একটি দলের একটি রাজনৈতিক মত বা আদর্শ থাকে। সেই মত বা আদর্শ অনুসরণ করে এমন জনসাধারণ দেশে অনেক আছে। ইহাদের লইয়াই এই রকম এক একটি রাজনৈতিক দল তৈরী হয়। নির্বাচনের পূর্বে প্রত্যেক দলের সদস্যগণ একটি সভায় মিলিত হইয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন কি না তাহা ঠিক করেন। যদি অংশগ্রহণ সাব্যস্ত হয়, তখন দলের উদ্দেশ্য ও কার্য-তালিকা (Party manifesto) তৈরী করা হয়। এই জাতীয় ম্যানিফেস্টো সকল দলের পক্ষ হইতেই প্রকাশ করা হয় এবং উহাতে প্রত্যেক দলই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা দেশের মঙ্গলসাধন করিবেন। ইহার পর তাঁহারা নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রত্যেক দলই নিজেদের দলভুক্ত লোককে নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাইয়া থাকেন ও প্রত্যেক দলই আইনসভায় অধিকাংশ আসন দখল করিবার জন্য চেষ্টা করেন ; কেন না নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিন্ন সরকার-গঠন করা সম্ভব নহে। ইহার জন্য সকল দলের পক্ষ হইতেই বক্তৃতা, প্রচারপত্র ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভোটারদের স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়া থাকে। নির্বাচন-অন্তে যে দল আইন-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আহূত হয়। তারপর দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁহার পরামর্শ অনুসারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা ঃ প্রত্যেক নাগরিকই কয়েক প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে, যথা—(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ; (২) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং (৩) সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা। সমাজ-জীবনে এই প্রকার প্রত্যেকটি স্বাধীনতার গুরুত্ব আছে। জনসাধারণের কল্যাণ-কামনায় সংবাদপত্র মারফৎ প্রত্যেকেরই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত। ইহাই স্বাধীন মানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ। সেই মত যদি রাষ্ট্রের মনোমত না হয়, তথাপি রাষ্ট্রের উহাতে বাধা দেওয়া উচিত নহে ; বাধা দিলে নাগরিকের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাক্‌স্বাধীনতার (Right of Speech) নামান্তর। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের বাক্-স্বাধীনতা থাকে, কারণ ইহা দ্বারাই সে সরকারী ব্যবস্থা এবং কার্য-কলাপের সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। অবশ্য অন্যের মানহানিকর

বা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক (Treason) কোন কিছু বলিবার অধিকার কোন নাগরিকের থাকা উচিত নয়। এইজন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বাক্-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। সংঘের ভিতর দিয়াই মানুষের সমাজ-চেতনা মূর্ত হইয়া উঠে। সংঘবদ্ধতা মানুষের জন্মগত প্রকৃতি; কারণ পরিণামে এই প্রকৃতিই রাষ্ট্রের সংগঠনের ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠে। রাষ্ট্রের সংগঠন ভিন্ন মানুষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার সুযোগ নাই। সেইজন্য সকল সুসভ্য রাষ্ট্রেই সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (Right of Association) স্বীকৃত হইয়াছে। তবে এই সব অধিকার যথাযথ দায়িত্বের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে জনস্বার্থ এবং পরে রাষ্ট্রের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই এই সব অধিকার প্রয়োগ করা প্রত্যেক সুনাগরিকের কর্তব্য। সমাজের অমঙ্গল হয়, রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় এমন কিছু বলা বা এমন কোন উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। সেইজন্য এই সব বিভিন্ন অধিকারের সহিত দায়িত্বের প্রশ্নটিও বিশেষভাবে জড়িত।

জনসমষ্টির রাজনৈতিক জীবন ঃ কোন দেশের জনসমষ্টিকে আমরা সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকি, যথা—(১) সহরের জনসমষ্টি এবং (২) গ্রামের জনসমষ্টি। আমরা জানি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। সেই কারণে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত এই দুই শ্রেণীই বিশেষভাবে জড়িত। রাষ্ট্রকর্তৃক জনসাধারণের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হয় বলিয়া জনসাধারণ সর্বদাই রাষ্ট্রকে উপযুক্তভাবে গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ গঠন কেবলমাত্র জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ দ্বারা সম্ভব। নাগরিক মাত্রেরই কতকগুলি অধিকার থাকে এবং সেই অধিকারগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্যই তাহাকে রাজনৈতিক বিষয়ে জড়িত থাকিতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলির এই বিষয়ে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। জনসমষ্টিকে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা তাহাদের অন্যতম কর্তব্য। এইজন্যই শহরে ও গ্রামে রাজনৈতিক সভার আয়োজন হইয়া থাকে।

নাগরিক কেন রাজনীতির চর্চা করিবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকমাত্রেই জানে তাহার ভোটাধিকার আছে এবং ইহার বলে সে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন করিতে পারে, অথবা উহাতে সহায়তা করিতে পারে।

এই অধিকার হইতে যাহাতে সে বঞ্চিত না হয়, সেইজন্যই তাহাকে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া অনুশীলন করিতে হয়। জনসমষ্টির রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার বিবিধ উপায় আছে। সভা করা, সভায় স্বাধীন মত প্রকাশ করা, সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বাধীন মত ব্যক্ত করা এবং অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আইনসভা অথবা শাসকমণ্ডলীর নিকট আবেদন করা ইত্যাদি নানা উপায়ে রাজনৈতিক জীবন গঠন করা যাইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে, শহর ও গ্রামের জনসমষ্টির রাজনৈতিক চেতনার বহু পার্থক্য আছে। কারণ শহর ও গ্রামের রাজনৈতিক জীবন বিভিন্ন, সমস্যাও বিভিন্ন। শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক, গ্রামে কম; শহরে রাজনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্র বিচিত্র ও বিস্তৃত, গ্রামে সংকীর্ণ। সেই কারণেই এই দুই অঞ্চলের জনসমষ্টির রাজনৈতিকবোধ কখনই এক প্রকারের হইতে পারে না।

গণতান্ত্রিক আদর্শ—সমাজে ও জীবনেঃ সভ্যতার পথে মানুষ যতই অগ্রসর হইয়াছে, যতই তাহার সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সংঘবদ্ধতা আসিয়াছে এবং তাহার রাজনৈতিক চেতনা যতই প্রখর হইয়াছে, ততই সে গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণ করিতে চাহিয়াছে। সেইজন্য বর্তমান কালে সকল সুসভ্য রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক আদর্শ-অনুযায়ী সমাজ গঠন করিতে বদ্ধপরিকর। গণতান্ত্রিক সমাজ বলিতে আমরা কি বুঝিব? বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি. ডি. এইচ. কোলের মতে, "গণতান্ত্রিক সমাজ বলিতে আমরা এমন একটি সমাজ বুঝি যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা আহার্য এবং পানীয় সংগ্রহ, আশ্রয় নির্মাণ এবং বিপদ-আপদ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করে।"

এই যুগে মানুষের জীবন স্বভাবতঃই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কত জটিলতা! এখন কাহারও পক্ষেই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী জীবনধারণ সম্ভব নহে। একজনকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে এই পারস্পরিক সহযোগিতার ইচ্ছার ভিতর দিয়াই সমাজে ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ইহারই মাধ্যমে একে অন্যের স্বার্থের প্রতি সচেতন হয় সাম্যের ভাব দেখা দেয়। এই সাম্যই হইল গণতান্ত্রিক শাসনের প্রধান কথা স্বাধীনতা ইহার দ্বিতীয় ভিত্তি। তারপর শ্রেণী-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেককে স্ব স্ব ক্ষমতা বিকাশের পূর্ণতম সুযোগ প্রদান করা গণতান্ত্রিক সমাজের আর একটি

লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক সমাজ এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর স্বার্থ এবং অধিকার সমান ভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় মতপ্রকাশের অধিকার থাকিবে; ইহা দ্বারাই জনসাধারণের দেশপ্রীতি বৃদ্ধি পায় ও সকলের মধ্যে সহযোগিতা দৃঢ় হয়। মোট কথা, প্রত্যেকের মঙ্গলসাধন এবং সমাজ-জীবনে অখণ্ড শান্তি বজায় রাখাই গণতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্য।

সমাজে যেমন, তেমনি ব্যক্তির জীবনেও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ব্যতীত সভ্য মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা দ্বারাই আমরা বাঁচিয়া আছি। আমরা প্রতিদিন যে সব সুখ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে ঐ সব সুখ-সুবিধা অন্য লোকের সহায়তা ভিন্ন আদৌ সম্ভব হইত না। আমি একটি সামান্য মানুষ, আমার ক্ষমতা সামান্য, তথাপি অজ্ঞাতসারে আমিও সমাজের কত লোকের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সহায়তা করিয়া চলিয়াছি। আমরা সকলের জন্য, সকলে আমাদের জন্য ইহা পারিবারিক জীবনে যেমন সত্য, সামাজিক জীবনেও তেমনি। এই গণতান্ত্রিক আচরণদ্বারাই প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকি।

অনুশীলনী

1. Define State. How does it differ from Government?
   রাষ্ট্র বলিতে কি বুঝায়? রাষ্ট্র ও সরকারে প্রভেদ কি?
2. What is the importance of election in modern communities?
   বর্তমান সমাজ-জীবনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা কি?
3. Give a short description of elections?
   নির্বাচন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
4. What do you mean by political parties?
   রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়?
5. What are the ideals of a Democratic Society.
   গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষেই দেশের সমগ্র অংশ সমান দক্ষতার সহিত শাসন করা সম্ভব নহে। সেইজন্ত সভ্যজগতের সব দেশেই কিছু না কিছু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিগ্নমান। সকল রাষ্ট্রই দেশকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করিয়া ঐ সব অংশের শাসনব্যবস্থা স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করিয়া থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকেই বলা হয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-government) অথবা স্থানীয় শাসন (Local Government)। স্থানীয় অঞ্চলগুলির জনসাধারণ যাহাতে নিজেদের সমস্তার সমাধান নিজেরাই করিয়া লইতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া উচিত। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি উপকার হইতেছে এই যে, ইহা জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে, জনমতকে সুশিক্ষিত করে এবং গণতন্ত্রকে সার্থক করে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়টির আলোচনা করিব।

স্বায়ত্তশাসন বা স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলিতে এমন একটি শাসন-প্রণালীকে বুঝায়, যাহার দ্বারা ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের মধ্যে তথাকার রাস্তাঘাট-নির্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কার্য পরিচালিত হয়। এই সব কার্য করিবার দায়িত্ব সাধারণতঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকিলেও স্থানীয় জনসমষ্টিকেই মিলিয়া মিশিয়া সেই অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে সচেতন থাকিতে হয়। সভ্য সমাজে মানুষ যেখানেই সংঘবদ্ধভাবে বাস করে সেখানেই কতকগুলি বিষয়ের প্রয়োজন থাকিবেই, যথা—রাস্তাঘাট-নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা, জনশিক্ষা ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে এই কার্যগুলির দায়িত্ব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপরেই থাকে। গ্রাম ও নগরের স্থানীয় শাসনের কাঠামোটি এক ধরণের হইলেও উভয়ের কার্যাবলীর মধ্যে অনেক পার্থক্য বিগ্যমান। অনেক সময়ে আবার এই সব অঞ্চলের শান্তিরক্ষার ভারও এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর থাকে। কোন কোন বৃহৎ শহরে পরিবহন এবং আলো ও গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থাও ইহাদের উপর দেওয়া হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগঠন ঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা—(১) গ্রাম্য ও (২) পৌর। পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বা স্থানীয় বোর্ড, জিলা বোর্ড ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসন সংগঠন। পঞ্চায়েৎ এবং ইউনিয়ন বোর্ড কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত হইতে পারে; আবার বড় গ্রাম হইলে একটি গ্রামেই পঞ্চায়েৎ এবং ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হইতে পারে। লোক্যাল বা স্থানীয় বোর্ডের এলাকা সাধারণতঃ একটি মহকুমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে আর জিলাবোর্ডের এলাকা গঠিত হয় একটি সমগ্র জেলা লইয়া। পৌর স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন রূপ আমরা দেখিতে পাই মিউনিসিপ্যালিটি, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এবং বড় বড় শহরে কর্পোরেশনের মধ্যে।

কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের ধাঁচেই স্থানীয় শাসন-সংস্থাগুলি গঠিত হইয়া থাকে। এই সব সংস্থায় একটি করিয়া প্রতিনিধি-পরিষদ ও কার্যনির্বাহক সভা থাকে। করদাতা (Tax-payer) অথবা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটে প্রতিনিধি-পরিষদ গঠিত হয়। কার্যনির্বাহক সভা অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হয়। এই কার্যনির্বাহক সভা সর্ববিষয়ে প্রতিনিধি-পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। একদল বেতনভুক্ কর্মচারীর সহায়তায় কার্যনির্বাহক সভা তাহাদের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে, স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। রাজ্য-সরকারের কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ ইহাদের উপর থাকে। এই সব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপরে স্থানীয় জনসমষ্টির সামগ্রিক কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করে। যদি ইহাদের কর্তব্য সম্পাদনে কোন ত্রুটি বা দায়িত্ব পালনে কোন শৈথিল্য দেখা দেয়, তাহা হইলে সেই অঞ্চলের জনসমষ্টির সমূহ ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে; এই কারণেই রাজ্য-সরকার ইহাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং কোন ক্ষেত্রে অযোগ্যতা প্রকাশ পাইলে রাজ্য-সরকার যে-কোন ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড অথবা জিলা বোর্ডকে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। তবে একান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহাদের দৈনন্দিন কার্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সংস্থার আর্থিক স্বাচ্ছল্যবিধান করিবার জন্য হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ এবং কোন অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা না করার অধিকার রাজ্যসরকারের।
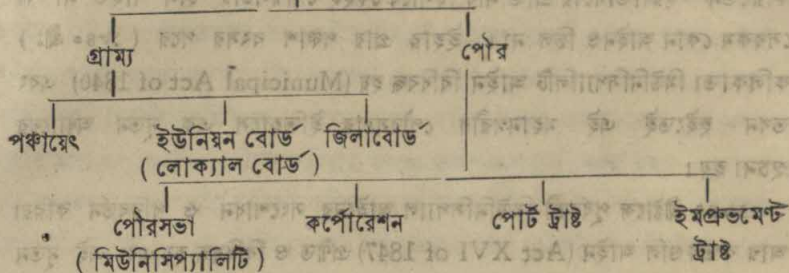
কলিকাতা কর্পোরেশন ঃ আড়াই শত বৎসর পূর্বেকার এক নগণ্য ও অখ্যাত গ্রাম বর্তমানে ভারতের মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে এবং এই মহানগরীর পৌর-শাসনের দায়িত্ব যে সংস্থার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে উহারই নাম কলিকাতা কর্পোরেশন। ইহা ভারতের সর্ববৃহৎ পৌরসভা। এই পৌরসভার গোড়ার ইতিহাস এইখানে একটু বলা হইতেছে।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় নির্দেশ অনুসারে একজন মেয়র ও নয়জন অলড্যারম্যান লইয়া প্রথম পৌরসভা গঠিত হয়। তখন ইহার নাম ছিল 'কোর্ট অব রেকর্ডস' বা 'কোর্ট হাউস'। বর্তমানে শহরের যেখানে সেন্ট এণ্ড্রুজ গীর্জাটি রহিয়াছে তাহার সন্নিকটে ইহার ভবন নির্মিত হয়। ইহার অর্ধশতাব্দীকাল পরে তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে কলিকাতার রাস্তাগুলি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা ও আবর্জনা অন্যত্র লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্বপ্রথম বিধিনিষেধ প্রণীত ও প্রযুক্ত হয়। তখনও কলিকাতায় 'ওয়ার্ড' (Ward) সৃষ্টি হয় নাই; সমগ্র শহরটি ৩১টি ডিভিসনে বিভক্ত ছিল এবং এক একজন থানাদার এইরূপ একটি ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে মিউনিসিপ্যাল শাসনের কোন ব্যবস্থাই কলিকাতায় ছিল না। তারপর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন সোর যখন বাংলার গভর্ণর জেনারেল, সেই সময়ে তাঁহারই নেতৃত্বে কলিকাতা শহরে সর্বপ্রথম সুগঠিত ও সংঘবদ্ধভাবে পৌরশাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। কোম্পানীর আমলে লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকালেই কলিকাতা শহরের পৌরশাসন-ব্যবস্থার, বিশেষভাবে ইহার পথঘাট-নির্মাণ, ড্রেননির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারের সমধিক উন্নতি হয়। তখনও পর্যন্ত

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির শাসনকার্য ইংরেজ রাজপুরুষগণই সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেন—করদাতাগণের প্রতিনিধি হিসাবে কেহই পৌরসভায় স্থান পাইত না বা সেরকম কোন আইনও ছিল না। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে (১৮৪০ খ্রীঃ) কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আইন বিধিবদ্ধ হয় (Municipal Act of 1840) এবং তখন হইতেই এই মহানগরীর পৌরসভার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববর্তী মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া আর কতকগুলি আইন (Act XVI of 1847) প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হয় এবং এই নূতন আইন অনুসারে সাতজন কমিশনার লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। এই প্রথম বোর্ডে ৪ জন শ্বেতাঙ্গ ও তিনজন ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিল। ইহার এক বৎসর পরে লর্ড ডালহৌসির নির্দেশে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতি বিধানে একাধিক আইন পাশ হয়। প্রধানতঃ তাঁহারই সময়ে এই মহানগরীর এই দুইটি বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল ; যথা—(১) ড্রেনেজ ও সিউয়ারেজ (Drainage and Sewerage) এবং (২) পানীয় জল সরবরাহ। শহরে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা এই সময় হইতেই হয় এবং এখন হইতেই সাতজনের স্থলে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন কমিশনার নিযুক্ত হয়। ইহার ষোল বৎসরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির শাসনকার্য সংক্রান্ত আর একটি নূতন বিল (Act VI of 1863) প্রণীত হয়। এই আইন প্রবর্তিত হইবার পর কলিকাতা কর্পোরেশন শাসনতন্ত্রে ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনারের পদের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে শহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে মিউনিসিপ্যালিটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার একটি ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করে। পুরাতন হাওড়া পুলটি এই সময়ে নির্মিত হইয়াছিল।

এইরূপে আরো কয়েকটি দফায় শহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ১৮৫৮ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দকাল পর্যন্ত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি প্রায় দুইকোটি টাকা খরচ করে। এই সময়েই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাইস্-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিল। তখন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান লইয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের মোট সংখ্যা ছিল ৭২ জন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটির শাসন-সংক্রান্ত আর একদফা নূতন আইন (Act IV of 1876) প্রবর্তিত

হইল। এই নূতন আইন অনুসারে ৭২ জন কমিশনারের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক কমিশনার নির্বাচন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা করদাতাগণ সর্বপ্রথম লাভ করে। শহরের পৌরসভা প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা পায়। বার বৎসরে আর একদফা নূতন আইনের বলে (Act II of 1888) পৌরসভার শাসন-তন্ত্রে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এখন হইতে কমিশনারের সংখ্যা হয় ৭৫ এবং ইহার মধ্যে ৫০ জনকে নির্বাচন করিবার ক্ষমতা করদাতাগণকে দেওয়া হয়।

কলিকাতা পৌরসভার ইতিহাসে ইহার পরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের 'ম্যাকেঞ্জি আইন'। এই আইনের বলে কর্তৃপক্ষ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা সঙ্কোচ করেন এবং তখন ২৮জন কমিশনার এই ম্যাকেঞ্জি আইনের বিরোধিতা করিয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৌরসভার শাসন ও নির্বাচন ব্যবস্থায় এই আইনই বলবৎ ছিল। তারপর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত নূতন আইনের বলে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাসে নবযুগ আরম্ভ হয়। তিনি তখন স্বায়ত্তশাসনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা মহানগরীর পৌরসভাতে স্বায়ত্তশাসনের পথ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিয়া দেন। ম্যাকেঞ্জি আইন প্রবর্তিত হইবার পঁচিশ বৎসরকাল পরে সুরেন্দ্রনাথ-রচিত মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ হইল। এই নূতন আইনের বলে (Municipal Act of 1923) কলিকাতা পৌরসভার এলাকা ও ক্ষমতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। করদাতাগণের ভোটাধিকারও বৃদ্ধি পায়। এখন হইতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি 'কলিকাতা কর্পোরেশন' নামে পরিচিত হয়। কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁহার সময়েই পৌরসভার ভিতর ও বাহিরের রূপ একেবারে বদলাইয়া যায়। বস্তী উন্নয়ন, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, বিনাখরচে দরিদ্রের চিকিৎসা এবং দরিদ্র পরিবারের দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ প্রভৃতি এই সময়কার পৌরসভার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

বর্তমান কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ৭৬ জন কাউন্সিলর ও ৫ জন অল্ডারম্যান লইয়া গঠিত। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই আইনের সংশোধন হয় এবং তখন হইতে এই পৌর প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলরের সংখ্যা হইয়াছে ৮১, ইহার মধ্যে ৮০ জন ৮০টি ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত আর একজন

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান—ইনি পদাধিকারবলে কাউন্সিলর। এই ৮০টি ওয়ার্ডকে ১৬টি বরোতে (Borough) শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি (কাউন্সিলর) নির্বাচিত হন এবং প্রতিনিধিগণ অল্ডারম্যান নির্বাচিত করেন। কাউন্সিলরদের কার্যকাল চার বৎসর। কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন। ইহাদের কার্যকাল এক বৎসর। কর্পোরেশনের সভায় মহানাগরিক বা মেয়র সভাপতিত্ব করেন। মেয়রকে শহরের প্রথম নাগরিকের সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতিনিধি-পরিষদের কার্যকাল শেষ হইলে পৌরসভার নির্বাচন হয়।

পৌর-প্রতিনিধিগণ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নীতি ঠিক করেন এবং পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা কমিশনার (ইনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন) সেই নীতি কার্যে পরিণত করেন। ইনি পৌরসভার সদস্য নহেন, তবে সভার কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন. কিন্তু ভোট দিতে পারেন না। সভার প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার প্রধান দায়িত্ব ইহার। ইহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর; কার্যকাল উত্তীর্ণ হইলে পৌরসভা রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া আরো পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করিতে পারেন।

কর্পোরেশনের কাজ মিউনিসিপ্যালিটির কাজের ন্যায়। কলিকাতা মহানগরীর জনস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ করার জন্য ময়লা জল নিষ্কাশন করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা, নর্দমা ব্যবস্থার (Drainage) নিয়ন্ত্রণ করা, রাস্তাঘাটের আবর্জনা দূর করা, ইত্যাদির দায়িত্ব কর্পোরেশন গ্রহণ করে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, গৃহনির্মাণ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রবর্তন করা, ব্যবসায়ী, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিজীবীদের কাজের জন্য লাইসেন্স আদায় করা, হাট-বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করা, ইত্যাদি বহুবিধ কাজ কলিকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠানকে করিতে হয়। আবার কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ যাহাতে না হয়, সেজন্য কর্পোরেশনের জনস্বাস্থ্যবিভাগ হইতে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বাজারে বা খাবারের দোকানে যাহাতে দূষিত বা বাসি খাবারের জিনিস বিক্রয় না হয়, সেদিকেও কর্পোরেশনের লক্ষ্য থাকে। কলিকাতা মহানগরীতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও পৌরসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রত্যেক নাগরিককে সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা ইহার আর একটি লক্ষ্য।

এই সব বিবিধ কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য পৌরসভার নয়টী ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে; যথা—(১) শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন; (২) শিক্ষা; (৩) হিসাব; (৪) কর ও ফিন্যান্স; (৫) স্বাস্থ্য; (৬) পূর্তকার্য; (৭) গৃহনির্মাণ; (৮) পাবলিক ইউটিলিটিজ য়্যাণ্ড মার্কেট; (৯) পানীয় জলসরবরাহ। প্রত্যেক কমিটি ৯ হইতে ১২ জন সদস্য লইয়া গঠিত।

কলিকাতার পৌরসভার বাৎসরিক আয় আনুমানিক সাতকোটি টাকা। কর্পোরেশন প্রধানত নিম্নলিখিত উৎস হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, এই মহানগরীর সমুদয় জমি ও গৃহের বাৎসরিক আয়ের উপর কর্পোরেশন নির্দিষ্ট হারে ২০৲ টাকা কর ধার্য করিয়া থাকে। জমি এবং বাড়ির মালিক উভয়কেই সমানভাবে কর দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির উপর ধার্য কর পৌরসভার আর একটি প্রধান আয়। তৃতীয়তঃ, গৃহপালিত পশু এবং বিভিন্ন যান-বাহনের মালিকদের উপর কর ধার্য করা হয় এবং ইহাতেও কিছু কিছু আয় হয়। মোটর গাড়ির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহা আদায় করে রাজ্যসরকার এবং তাহার একটি অংশ কর্পোরেশন পাইয়া থাকে। চতুর্থতঃ, হাটবাজার হইতে এবং কর্পোরেশনের নিজস্ব সম্পত্তি হইতেও কিছু আয় হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘ ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক শহরে আমরা মিউনিসিপ্যালিটি দেখিতে পাই। মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য সংখ্যা কত হইবে তাহা স্থির করার দায়িত্ব রাজ্যসরকারের। তবে কোনও মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার বা সদস্যসংখ্যা ৯ জনের কম ও ৩২ জনের বেশি হইবে না। মিউনিসি-প্যালিটির কার্যকালের মেয়াদ থাকে সাধারণতঃ চার বৎসর, তবে রাজ্যসরকার ইচ্ছা করিলে আর এক বৎসরকাল বাড়াইয়া দিতে পারেন। পৌরসংঘের সভাপতি (Chairman) ও সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) কমিশনারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। পৌরসংঘের যাবতীয় কার্য চেয়ারম্যানদ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। এছাড়া, একজন কর্মসচিব, একজন হেলথ অফিসার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারী থাকে। পৌরসংঘের সভাপতি ও উপ-সভাপতির পদ অবৈতনিক। রাজ্যসরকার পৌরসংঘের উপর কতকগুলি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রাখিয়াছেন। কোন গুরুতর বিচ্যুতি ঘটিলে পৌরসংঘ বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতা সরকারের আছে।

নাগরিকদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্যই পৌরসংঘ। শহরের জনস্বাস্থ্য, যানবাহন, শিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির উপরে ন্যস্ত। জনস্বাস্থ্য-সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত শহর হইতে ময়লা-নিষ্কাশন এবং সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য টীকা, ইনজেকসন প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ। পৌরসংঘগুলির আয়ের উৎস হইতেছে ইহাদের এলাকা-ভুক্ত বাড়ি এবং জমির উপর ধার্য কর, যানবাহনের উপর ধার্য কর, খেয়াঘাট, সেতুনির্মাণ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের নিকট হইতে অনুমতিপত্র বাবদ প্রাপ্ত অর্থ। তাহা ছাড়া প্রয়োজন হইলে রাজ্যসরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গ্রাম্য অঞ্চলে তিন শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসন বিদ্যমান; যথা—গ্রামে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড আর জিলার সদরে জিলাবোর্ড। প্রথম দুইটির কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি; এখন আমরা তৃতীয়টি সম্পর্কে বলিব। জেলাবোর্ড (District Board) সমগ্র দেশের পল্লী অঞ্চল লইয়া গঠিত হয়। ইহার সদস্যসংখ্যা ৯ হইতে ৩৬ জনের বেশি হয় না; সদস্যরা সকলেই নির্বাচিত। এক্ষেত্রে নির্বাচক মণ্ডলী হইতেছে জেলার অন্তর্গত সব ইউনিয়নের ভোটদাতাগণ। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে সভাপতি (Chairman) এবং সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচন করেন।

জেলা বোর্ডগুলির কার্য হইতেছে, সমগ্র জেলার শিক্ষাব্যবস্থা, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ইত্যাদির তদারক করা। জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস হইতেছে পথ-কর (Road Cess), সেতু, পথ-ঘাট, ডাকবাংলো, খোঁয়াড় প্রভৃতি হইতে আয় এবং সরকারী সাহায্য। ইহা ছাড়া জনসাধারণের নিকট হইতে জেলা বোর্ড ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কোন কোন জেলা বোর্ড রেল হইতে লাভের অংশ বাবদ কিছু অর্থ লাভ করে, যেমন হাওড়া জেলাবোর্ড।

পূর্বে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া লোকাল বোর্ড ছিল। এইগুলি জেলা বোর্ডের অধীনেই কার্য করিত এবং জেলাবোর্ড যে সকল কার্যের ভার দিত, লোকাল-বোর্ড তাহাই করিত। জেলাবোর্ড লোকালবোর্ডকে যে অর্থ দিত, ইহা তাহাই খরচ করিত। কমপক্ষে ছয়জন সদস্য লইয়া লোকাল বোর্ড গঠিত হইত। বর্তমানে

লোকাল বোর্ড বেশি নাই, এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে লোকাল বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চায়েৎ ও ইউনিয়ন বোর্ড: গ্রামপঞ্চায়েৎ সম্পূর্ণভাবে একটি ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান। ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে গ্রামের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা, গ্রামের জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা, গ্রামবাসীদের মধ্যে ছোট ছোট কলহ-বিবাদের মীমাংসা করা ইত্যাদি। আমাদের শাসনতন্ত্রে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গঠন করিবার বিধান আছে। জনগণের উপর কর ধার্য করিয়া পঞ্চায়েতগুলির ব্যয় নির্বাহ করিতে হয় এবং এইজন্য অর্থ সংগ্রহের ভার আছে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের উপর। ভারতের গ্রামীন জীবনের উন্নতিকল্পে পঞ্চায়েতগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সাধারণতঃ ইউনিয়ন বোর্ডে ছয় হইতে নয়জন সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। সভাপতিই হইতেছেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান; তিনি সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েতের যাহা কাজ অর্থাৎ গ্রামে শান্তিরক্ষা করা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করা, পথঘাট নির্মাণ করা ইত্যাদি, ইউনিয়ন বোর্ডও সেই কাজগুলি করিয়া থাকে। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজকর্ম তদারক করিবার জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সার্কেল অফিসার থাকেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কাজগুলি হইতেছে, আঞ্চলিক জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মহামারী প্রতিরোধ, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি। গ্রামোন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতগুলি সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সহিত একযোগে কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের অন্যান্য কাজও আছে। প্রাথমিক, সামাজিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, পাঠাগার স্থাপন, নৈশবিদ্যালয় স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং গ্রামীন শিল্প-গুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা, ইত্যাদি। জনগণের উপর কর ধার্য করিয়া পঞ্চায়েতগুলির ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয় এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া। রাজ্যসরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ডে ছয় হইতে নয়জন সদস্য নির্বাচিত হন। ইউনিয়নের সভাপতি সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েতের যাহা যাহা কাজ, ইউনিয়ন বোর্ডও সেই কাজগুলি করিয়া থাকে। ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের প্রধান

উৎস হইতেছে ইউনিয়ন রেট, চৌকিদারী ট্যাক্স, জেলাবোর্ড ও রাজ্য-সরকার হইতে সাহায্য, পঞ্চায়েতী আদালত হইতে প্রাপ্ত মামলার ফী ইত্যাদি। চৌকিদার ও দফাদারের বেতন ইউনিয়ন বোর্ডকে বহন করিতে হয়।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা : ভারতবর্ষ গ্রাম-প্রধান দেশ। এখানে গ্রামের উন্নতির কথা তাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা উন্নত করিতে পারিলে, কৃষির উন্নতি করিতে পারিলে, গ্রামীন জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াইতে পারিলে এবং গ্রাম্য শিল্পগুলির উন্নতি করিয়া বেকার নাগরিকদের কর্মের সংস্থান করিয়া দিতে পারিলেই গ্রামোন্নয়ন সম্ভবপর। এইজন্য ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) গ্রামাঞ্চলে সমাজ উন্নয়ন-পরিকল্পনা চালু করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development Project) উদ্দেশ্য হইল পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন করা। এই পরিকল্পনাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহাকে সার্থক করিবার জন্য মোট ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠনটি মোটামুটি এইরূপ :—প্রতি পরিকল্পনায় ৩০০ গ্রাম, ২ লক্ষ লোক এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর আবাদী জমি থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম লইয়া একটি উন্নয়ন ব্লক গঠিত হয়। প্রত্যেক ব্লকে একজন ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং প্রত্যেক পরিকল্পনায় একজন প্রজেক্ট একজিকিউটিভ অফিসার আছেন। ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাজে সাহায্য করিবার জন্য ১২ জন বিশেষজ্ঞের একটি কমিটি আছে। সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির প্রধান হইয়াছেন প্রজেক্ট শাসক (Project Administrator)। তাঁহাকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে। এ ছাড়া আছে গ্রাম্যলোকগণ।

মাত্র ৫৫টি প্রজেক্ট লইয়া ১৯৫২সালের ২রা অক্টোবর সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে ইহার সংখ্যা হয় ৬২২। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ইহাদের সংখ্যা হইতেছে ১,৮২৪। যে অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং ভাল জলের ব্যবস্থা আছে সেই সব অঞ্চলেই উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮টি প্রজেক্টের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রজেক্ট ৩টি

ডেভেলপমেন্ট ব্লকে বিভক্ত। এক একটির অধীনে প্রায় ১০০টি গ্রাম আছে। ব্লকের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া শহর স্থাপন করিবার পরিকল্পনা আছে। এই শহরের প্রায় ১০০০ পরিবারের বাসস্থান নির্মাণ করা হইবে। ইহা ব্যতীত স্কুল, কলেজ, কৃষি-প্রতিষ্ঠান এবং ছোট ছোট জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবারও ব্যবস্থা করা হইবে। এই প্রজেক্টের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রজেক্টে আগামী তিন বৎসরের জন্য ৬৫ লক্ষ টাকা করিয়া ধার্য করা হইবে। এ বিষয়ে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে। সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা সরকারী এবং বেসরকারী জনগণের উৎসাহ ও সাহায্যেই সচল হইতে পারে।

সমাজ সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সংগঠন ঃ সমাজ ত কেবল সম্রান্ত মানুষদের লইয়া নহে, উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত যাহারা তাহাদের বাদ দিয়া আমাদের সমাজ-জীবনের উন্নতি সম্ভবপর নহে। যে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামের অধিবাসী, সেই ভারতবর্ষে গ্রাম্যসমাজের উন্নতির বিষয়টি তাই সর্বাগ্রগণ্য। গ্রামের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত এবং দরিদ্র ; ইহাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচুস্তরের। গ্রাম-ভারতের দুর্গতি সত্যই অবর্ণনীয়—ইহাদের দুর্দশার যেন শেষ নাই। সমাজদেহের একটি বিরাট অংশের জীবনীশক্তির যদি এইভাবে অপচয় হইতে থাকে, তাহা হইতে আমরা কাহাদের লইয়া সুস্থ ও সবল সমাজ গঠন করিব? স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারত গভর্ণমেণ্ট তাই সর্বাগ্রে গ্রামগুলির উন্নতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন।

প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষার। গ্রামবাসীদের অজ্ঞানতা দূর করিতে না পারিলে তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না। গ্রামে গ্রামে তাই শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সহিত বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষা শুধু কেতাবী হইবে না, ইহাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। সেইজন্য কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিদ্যা, কুটীরশিল্প সম্বন্ধীয় বিদ্যা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার পর স্বাস্থ্য। ভারতের গ্রামগুলির মৃত্যুহারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হইতেই

ঝিতে পারা যায় গ্রামের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কি শোচনীয়। ম্যালেরিয়া ইহাদের নিত্য সহচর। অন্যান্য আধিব্যাধিও কম নহে। গ্রামের স্বাস্থ্যনৈতিক জীবন উন্নত করিবার উপায় হইল বাসস্থানের উন্নতি সাধন করা; স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত নূতন গৃহ নির্মাণ করা ব্যতীত গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নত করা সম্ভব নহে। তারপর গ্রামের পথঘাটগুলির সংস্কার করিতে হইবে এবং পাকা রাস্তা নির্মাণ করিতে হইবে। গ্রামে ভাল পানীয় জলের অভাব দূর করিবার জন্য পুষ্করিণীগুলির সংস্কার এবং গ্রামে গ্রামে নলকূপ স্থাপন করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করিবার জন্য মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঔষধালয় ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীর রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করিতে হইবে।

ইহার পর তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনের কথা ভাবিতে হইবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজন। কেন না তাহাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান ব্যতীত স্থায়ী উন্নতি আদৌ সম্ভবপর নহে। সমবায় সমিতির মাধ্যমেই এই কাজ করিতে হইবে। গ্রামবাসীরা নিজেরাই সমবায় সমিতি গঠন করিবে এবং কৃষিকার্য, কুটীর শিল্প সবই সমবায় প্রথায় করিতে শিখিবে। গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতির প্রবর্তন ভারতের অগণিত গ্রামবাসীর জীবনে আর্থিক উন্নতি আনিয়া দিতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ তথা রাজ্য সরকার চেষ্টা করিলেই গ্রামবাসী শিক্ষা, স্বাস্থ্য লাভ করিয়া জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিবে। সমাজদেহও সেদিন সমগ্রভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে।

অনুশীলনী

1. What is the ideal and activities of Local Administration?
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী কি?
2. Describe the organisation of Local Administration?
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সংগঠন বর্ণনা কর।
3. Describe the constitution and function of the Corporation of Calcutta.
কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।
4. Give a brief description of the Municipalities in the towns of West Bengal.
পশ্চিমবঙ্গের শহরের পৌরসংঘের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
5. Describe local self-Government in the districts and the countryside.
জেলা ও গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর
6. Describe the modern Community Development Prcjects.
আধুনিক সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার বর্ণনা কর।
7. Describe the Protection of the Community and necessary organisation for it.
সমাজ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন বর্ণনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারত যুক্তরাষ্ট্র

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ঃ ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতীয় গণপরিষদ ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। তারপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র চালু হয় এবং ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে (Sovereign Democratic Republic) পরিণত হয়। যে বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া এই বিরাট যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। ভারতের উপর এখন বিদেশী কোন রাষ্ট্রের কোন আইন বা নির্দেশ প্রযোজ্য নহে। যদিও ভারত কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র তথাপি কমনওয়েলথের নির্দেশ ইহা সব সময় মানিতে বাধ্য নহে; ইহার আভ্যন্তরীণ শাসন ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কমনওয়েলথের কোন কর্তৃত্বই নাই।

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র বলিতে আমরা কি বুঝি? যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি সরকার—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। সংবিধানে ইহাদের ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করা আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার নিজ নিজ ক্ষমতার মধ্যে প্রায় সকল মর্যাদার অধিকারী এবং পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করে, আবার একের এলাকায় অন্যের হস্তক্ষেপকে অবৈধ বলিয়া মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ আইনসঙ্গত অনুশাসন। যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ বিচারালয় আইনের প্রয়োগ ও মর্যাদা রক্ষা করে। এই বিশেষত্বগুলির সবই ভারতের সংবিধানে ও সংগঠনে বর্তমান। সুতরাং ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল—মোট ২০টি মূল রাষ্ট্র আছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য। ভারতীয় রাষ্ট্র একটি সাধারণতন্ত্র কারণ ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

ভারতীয় সংবিধানের (Constitution) মূলনীতি হইল প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সামাজিক, আর্থিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমান-

অধিকার ও ভ্রাতৃভাব। শাসনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ সর্বোতোভাবে স্বীকার করা হইয়াছে; ব্যক্তি স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত প্রকাশ প্রভৃতি ভারতীয় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য।

মৌলিক অধিকারঃ আমাদের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের জন্য সাত প্রকার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—(১) সাম্যের অধিকার; (২) স্বাধীনতার অধিকার; (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার; (৪) ধর্ম-বিষয়ে স্বাধীনতার অধিকার; (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার; (৬) সম্পত্তি সম্বন্ধে অধিকার; এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। সংবিধানে এইগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেই আলোচনার সারাংশ এই:—(১) আইনের বলে সমানাধিকার, ধর্ম, জাতি প্রভৃতির ভেদলোপ, অস্পৃশ্যতা বিলোপ প্রভৃতি সাম্যের অধিকারের অন্তর্গত; (২) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, মেলামেশা করিবার বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার, রাষ্ট্রের সর্বত্র যাতায়াতের অধিকার, ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রভৃতি স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্গত; (৩) মানুষ লইয়া ব্যবসায় ও বেগার প্রথার রদ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের অন্তর্গত; (৪) ধর্মে স্বাধীনতা, অনুষ্ঠানাদি প্রভৃতি ধর্ম-সম্বন্ধে স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্গত, (৫) বিবিধ ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি রক্ষণাদি বিষয়গুলি সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকারের অন্তর্গত। অন্য দুইটি অধিকারের মধ্যে নিজের সম্পত্তি রক্ষার আইন-সঙ্গত অধিকার এবং কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবিধান করিবার শাসনতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা হইয়াছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি

(১) **কেন্দ্রীয় সরকারঃ** ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হইতেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির পর উপরাষ্ট্রপতি এবং শাসনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা আছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের স্থায়ী কর্মচারিগণ দৈনন্দিন কাজে মন্ত্রীসভাকে সহায়তা করেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্য-বিধানসভার এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া এই নির্বাচক-

মণ্ডলী গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনপ্রার্থীকে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এবং লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কোন লাভজনক ব্যবসার সহিত জড়িত থাকিতে পারিবেন না। তিনি পার্লামেন্টের অথবা রাজ্যবিধানমণ্ডলীর সদস্য হইতে পারেন না। পদমর্যাদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির জন্য মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য ভাতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে সবিশেষ মর্যাদা ও প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান, শাসন বিভাগেরও তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। রাষ্ট্রপতির পদ খুবই মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁহার ক্ষমতাগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত যথা :—

(১) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers)—শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি যাবতীয় শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের সব কাজই তাঁহার নামে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন। তিনি বিভিন্ন মূলরাজ্যের রাজ্যপাল, সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। ভারত সরকারের প্রধান আইন উপদেষ্টা এ্যাটর্নি-জেনারেল, প্রধান হিসাব পরীক্ষক অডিটর-জেনারেল প্রভৃতি বিশেষ দায়িত্বশীল পদের নিয়োগও তিনিই করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং পদাধিকারবলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন। বিভিন্ন দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা, বিদেশে দূত প্রেরণ করা এবং বিদেশ হইতে আগত দূতগণকে গ্রহণ করাও রাষ্ট্রপতির অন্যতম কাজ।

(২) আইন-বিভাগীয় ক্ষমতা (Legislative Powers)—রাষ্ট্রপতির আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষ কর্তৃক যথারীতি অনুমোদিত বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে রাষ্ট্রপাতর সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যে কোন বিল নাকচ করিতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য আইন-পরিষদে পাঠাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান

করিতে, বজায় রাখিতে এবং ভাঙিয়া দিতে পারেন। তিনি আইন-পরিষদে বক্তৃতা দিতে পারেন। রাজ্যগুলির স্বার্থজড়িত করধার্য বিষয়ে রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি প্রয়োজন। পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিতে পারেন। কিন্তু আইন-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলেই পরিষদের নিকট ইহা পেশ করিতে হইবে। পরিষদ এই জরুরী আইনে সম্মতি না দিলে, অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ ঐ আইন বহাল থাকিবে।

(৩) রাজস্ব-বিভাগীয় ক্ষমতা (Financial Powers)—আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার সময় রাষ্ট্রপতি প্রথমেই সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের হিসাব বাজেট আকারে পার্লামেণ্টে অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করান। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত অর্থ-সংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় না।

(৪) জরুরী অবস্থার ক্ষমতা (Emergency powers)—সকল রাষ্ট্রেই কোন না কোন সময়ে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে। জরুরী অবস্থা বলিতে কি বুঝায়? পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের আশংকা, গৃহযুদ্ধ, কোন রাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সঙ্কট অথবা আর্থিক সঙ্কট, সাধারণতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এইগুলিকেই জরুরী অবস্থা বলা হইয়া থাকে। ইহার কোন একটি ঘটিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে সমগ্র দেশের অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন।

(৫) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers)—দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত অপরাধী-গণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীগণকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করিতে পারেন অথবা তাহাদের দণ্ডাদেশ কমাইয়া দিতে পারেন।

এইভাবে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তাঁহাকে একটি মন্ত্রিপরিষদ নিযুক্ত করিতে হয়। এই মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় একজন উপরাষ্ট্রপতিও নির্বাচন করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনপ্রার্থীর যে যোগ্যতা থাকা উচিত উপরাষ্ট্রপতিরও সেই যোগ্যতা

থাকা উচিত। তিনিও পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ রাজ্যসভায় (Council of States) সভাপতিত্ব করা। রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির কাজ করেন।

এইবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের (Council of Ministers) কথা আলোচিত হইতেছে। সাধারণতঃ পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার মন্ত্রিসভা যে সকল কাজ করে ভারত সরকারের মন্ত্রিসভাও সেই কাজগুলি করে। প্রথমতঃ মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্য হইতে হয়। যদি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবার সময় কোন মন্ত্রী পার্লামেন্টের সদস্য না থাকেন, তবে মন্ত্রী হইবার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইতে হয়। মন্ত্রিপরিষদে তিন শ্রেণীর সভ্য আছেন, যথা—(১) ক্যাবিনেট মন্ত্রী, (Cabinet Minister) ; (২) রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of States) এবং (৩) উপমন্ত্রী (Deputy Minister)। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মন্ত্রিগণ ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন। ইহাদের কাজ শাসনকার্য পরিচালনায় মন্ত্রীদিগকে সাহায্য করা।

মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই একটি না একটি দপ্তরের ভার প্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির ভার ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের হাতে অর্পিত হয়। শাসন-পরিচালনা, আইন প্রণয়ন এবং সরকারের আয়-ব্যয়ের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করা এবং সেই নীতি কার্যকরী করা মন্ত্রিসভার কাজ। রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসনবিভাগের কাজ চালিত হয় বটে, কিন্তু সব কাজের দায়িত্ব মন্ত্রিসভাকেই বহন করিতে হয়। পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্বও মন্ত্রিসভার। প্রধানমন্ত্রী একাধারে মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেন্টের নেতা। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাষ্ট্রপতির গোচরে লইয়া আসাও তাঁহার অন্যতম কাজ। মন্ত্রিসভার সমুদয় কাজের জন্য মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব থাকে বলিয়া সরকারের কোন নীতি গৃহীত হইবার পূর্বে মন্ত্রিপরিষদের (Cabinet) বৈঠকে তাহা অধিক সংখ্যক সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধান মন্ত্রীই সভাপতিত্ব করেন, সমগ্র মন্ত্রিসভা তাঁহারই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বিভাগীয় মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য একজন সেক্রেটারী থাকেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্যের জন্য আইনপরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। আইনপরিষদ যদি কোন

কারণে মন্ত্রীদের কার্যে অসন্তুষ্ট হয় এবং অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলী পররাষ্ট্র দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেশরক্ষা দপ্তর, রাজস্ব দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর প্রভৃতি আঠারটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত।

(২) **রাজ্য সরকার**ঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৫টি মূলরাজ্য আছে। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন করিয়া রাজ্যপাল আছেন। ইনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনপ্রার্থীর যে যোগ্যতা থাকা উচিত, রাজ্যপালকেও সেই যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয় এবং অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। রাজ্যপালই প্রদেশ সরকারের অধিনায়ক, রাজ্যের সমস্ত শাসনকার্য তাঁহার নামে পরিচালিত হয়। তবে তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভা, বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হন। রাজ্যপালের কতিপয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে; সেগুলি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। যদি রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তবে রাজ্যপালকে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিতে হয় এবং তখন তিনি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary powers) কিছুটা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পান।

রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতির ন্যায়, রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। রাষ্ট্রপতির ন্যায় তাঁহারও বিভিন্ন ক্ষমতা আছে। তাঁহার শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার বলে তিনি রাজ্য-বিধানমণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। তিনি এ্যাডভোকেট জেনারেল এবং প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদিগকে নিযুক্ত করেন। আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতার বলে রাজ্যপাল আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে অথবা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনয়নও তিনি করিতে পারেন। তিনি আইনসভার অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে পারেন এবং যে কোন বিল সম্বন্ধে মতামত জানাইবার জন্য বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্যপাল সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বিলগুলি আইনে পরিণত হয়; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিধানসভার অনুমোদিত কোন বিল সম্পর্কে রাজ্যপাল নিজের সম্মতি প্রদান না

করিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন; পরে বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে তাহা বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়।

রাজ্যপালের পালের আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি সরকারের যাবতীয় সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব বাজেটের আকারে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে বিধানসভায় উত্থাপিত করিতে পারেন। বিচার বিভাগের উপরও রাজ্যপালের ক্ষমতা আছে। তিনি অপরাধীর দণ্ডাদেশ লাঘব করিয়া দিতে পারেন অথবা অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন।

এইবার রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভা সম্পর্কে বলা হইতেছে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপালদিগকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) আছে। রাজ্য বিধানসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজাপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। (কেন্দ্রে এবং রাজ্যে এইসব মন্ত্রীদের শপথ লইবার বিধি আছে।) মন্ত্রিগণকে আইনসভার সভ্য নির্বাচিত হইতে হয়। যদি মন্ত্রী হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে কোন মন্ত্রী আইনসভার সদস্য নির্বাচিত না হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই রাজ্যের স্বার্থের সহিত জড়িত এক বা একাধিক দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত হন। রাজ্যমন্ত্রিসভায়ও তিন শ্রেণীর মন্ত্রী থাকেন। যথা—ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যদি আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব (Vote of No-confidence) অনুমোদন করেন অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব (Vote of Censure) গ্রহণ করেন, তবে মন্ত্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্যগণের নিকট সরকারের ক্রিয়াকলাপ-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। রাজ্যের শাসনকার্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত; এক একটি বিভাগ এক একজন মন্ত্রীর অধীনে থাকে। বিভাগীয় মন্ত্রীদিগের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাদের অধীনে সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী প্রভৃতি বহু কর্মচারী চাকেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রতিটি রাজ্যকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হইয়াছে। ঐরূপ অংশকে বিভাগ বা Division বলে। প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া কমিশনার থাকেন। তিনি প্রধানতঃ রাজস্ববিষয়ক শাসন-কার্য পরিচালনা ও জিলাশাসকের কার্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক বিভাগ আবার কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। তাঁহার ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক, দায়িত্ব অনেক, কাজও অনেক। সেইজন্য জেলাশাসকদিগকে ভারতীয় শাসনপদ্ধতির মেরুদণ্ড বলা হইয়া থাকে। তিনিই জেলার সর্বময় কর্তা। জেলার রাজস্ব, পুলিশ, ফৌজদারী বিচারকার্য প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার জন্য তিনিই দায়ী। জেলাশাসক প্রধানতঃ শাসনকার্যের কর্তা হইলেও জেলার ভূমি ও অরণ্য-রাজস্ব সংগ্রহের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত বলিয়া তাঁহাকে কালেক্টার নামেও অভিহিত করা হয়। জেলার শান্তি এবং শৃংখলা রক্ষা তাঁহারই কর্তব্য। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য-পরিচালনারও বিধিব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হয়। জনস্বার্থও তাঁহাকে দেখিতে হয়। জেলাশাসক একাধারে শাসক ও বিচারক।

প্রত্যেক জেলা কয়েকটি মহকুমায় বিভক্ত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন করিয়া মহকুমা-শাসক বা (S. D. O.) এবং কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। মহকুমা-শাসক মহকুমার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য জেলা-শাসকের নিকট দায়ী থাকেন।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ১২টি রাজ্য এবং ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে। এতগুলি বিভিন্ন রাজ্য লইয়া গঠিত বলিয়াই ইহাকে ইউনিয়ন অব ষ্টেটস (Union of States) বলা হয়। ১৫টি রাজ্যের নাম ঃ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কেরালা ও মহীশূর। এইগুলিকে বলা হয় প্রথম শ্রেণীর রাজ্য। কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলগুলির নাম, যথা—দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদ্বীপ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল, নাগা পার্বত্য তুয়েন্‌সাং অঞ্চল ও পণ্ডিচেরী।

কেন্দ্রীয় আইনসভা : ভারতের আইন-প্রণয়ন করেন রাষ্ট্রপতি-সহ পার্লামেন্ট। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সদস্য নহেন ; কিন্তু তিনি আইন-প্রণয়ন বিভাগের একটি অংশ। দুইটি আইন-পরিষদ লইয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেন্ট গঠিত। নিম্ন পরিষদের নাম লোকসভা ও উচ্চ-পরিষদকে বলা হয় রাজ্যসভা। রাজ্যসভার (Council of States) সদস্য সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হয় না ; তন্মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২০২ জন। এস্থলে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যে কোন ভারতীয় নাগরিক রাজ্যসভার সদস্যপদপ্রার্থী হইতে পারেন। উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন।

লোকসভার (House of People) সদস্যসংখ্যা ৫২০ জনের বেশি হয় না ; এবং ভোটাধিকার আছে এই রকম নাগরিকদের ভোটে (ভোটারের অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স হওয়া চাই) ইহার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। বিভিন্ন মূলরাজ্য হইতে অনধিক ৫০০ জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন ; এবং অনধিক ২০ জন সদস্য কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইতে পারেন। বর্তমানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫০৫ জন।

পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। ইহার অধিবেশন বজায় রাখা এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়া রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে। অবশ্য, এই কাজে তিনি প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত হন। পার্লামেন্টের মুখ্য কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। সরকারী এবং বেসরকারী বিলগুলি লইয়া বিতর্কের অনুষ্ঠান করিয়া এবং সেইগুলি অনুমোদন করিয়া রাজ্যসভার নিকট প্রেরণ করাই লোকসভার মুখ্য কাজ। কিন্তু, অর্থসংক্রান্ত বিল শুধু লোকসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে, শুধু লোকসভাই ইহার সংশোধন করিতে পারে। অর্থসংক্রান্ত বিল লইয়া রাজ্যসভা বিতর্ক করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহার সংশোধন করিতে পারে না। উভয় পরিষদ কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে, ঐ গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠান হইবে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিলে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে হইলে পার্লামেন্টের অনুমোদন লইতে হয়। রাজ্যসভা বা একাধিক রাজ্য-আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় আইনসভার

উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ।

রাজ্য সরকারের গঠন: ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৫টি মূল রাজ্য আছে। এইগুলির গঠন অনেকটা কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনের অনুরূপ। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন করিয়া রাজ্যপাল আছেন। রাজ্যের আইনসভার উচ্চ-পরিষদকে বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্নপরিষদকে বিধানসভা (Legislative Assembly) বলা হয়। এই আইনসভা ও রাজ্যপালকে লইয়াই রাজ্যসরকার। রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান; শাসনকার্য তাঁহার নামেই পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভা ও মুখ্যমন্ত্রী দ্বারাই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজ্যপাল বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভা শাসনতন্ত্র-অনুযায়ী রাজ্যপালকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় রাজ্যসরকারও আইন প্রণয়ন করিতে পারেন।

রাজ্য বিধানমণ্ডলের গঠন: ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মূল রাজ্যেই একটি বিধানমণ্ডল বা আইন সভা আছে। ইহাদের মধ্যে মোট আটটি রাজ্যে আমরা আইনসভার দুইটি কক্ষ দেখিতে পাই, অপরগুলিতে একটি মাত্র কক্ষ আছে। বিধানসভার সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং বিধান পরিষদের সদস্যগণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং কিছু অংশ কতিপয় বিশেষ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রেণীগত ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। বিধান-পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে রাজ্যপালও মনোনীত করিয়া থাকেন। বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না। বিধানসভা ৫০০ জনের অনধিক সদস্য লইয়া গঠিত। ২৩৮ জন সদস্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা গঠিত। ইহার কার্যকাল সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর, কিন্তু বিধান-পরিষদ একটি স্থায়ী পরিষদ। বিধান সভায় সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে একজন স্পীকার (Speaker) এবং একজন ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker) নির্বাচন করেন। বিধান পরিষদের সদস্যগণ একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন।

আইন প্রণয়ন করা রাজ্য-বিধানমণ্ডলের প্রধান কাজ। কোন্ কোন্ বিষয়ে রাজ্য-বিধানমণ্ডলের আইন তৈরী করিবার ক্ষমতা আছে তাহার একটি নির্দিষ্ট তালিকা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সাব্যস্ত হইয়া থাকে। এই তালিকা দুই রকমের, যথা—(১) রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় এবং (২) যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়। শেষোক্ত তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে রাজ্যবিধানমণ্ডল যদি কোন আইন তৈরী করে এবং সেই আইন যদি পার্লামেন্টের আইনের বিরোধী হয়, সেক্ষেত্রে পার্লামেন্টের আইন বলবৎ থাকে। রাজ্যসরকার যদি কোন বিল আইনে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বিধানমণ্ডলের উভয় পরিষদের অনুমোদন দরকার। রাজ্যবিধানমণ্ডলে বিধান-পরিষদ অপেক্ষা বিধানসভারই ক্ষমতা বেশি।

আইন প্রণয়নের নিয়ম ঃ কেন্দ্রে এবং রাজ্যে আইন প্রণয়নের নিয়ম একই। পার্লামেন্টের প্রধান কাজ আইন তৈরি করা। সাধারণতঃ, কেন্দ্রীয় তালিকায় (Union List) এবং যুগ্ম তালিকায় (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেই পার্লামেণ্ট আইন তৈরি করিয়া থাকেন। আইন প্রণয়নের জন্য প্রথমে একটি বিল উত্থাপন করিতে হয়। যে কোন সভ্যই যে কোন বিষয়ে বিল উত্থাপন করিতে পারেন; বিল উত্থাপন করিতে হইলে একমাস পূর্বে জানাইতে হয় এবং জানাইবার সময় বিলের কপি পাঠাইয়া আইন পরিষদের অনুমতি চাহিতে হয়। লোকসভায় কোন মন্ত্রীও কোন বিষয়ে বিল উত্থাপন করিতে পারেন। প্রস্তাবিত বিল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং পরে বিলটি পঠিত হইবার পর একটি নির্দিষ্ট কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। কমিটি বিল লইয়া আলোচনা করে এবং পরিষদে এই সম্পর্কে তাহাদের মতামত জানায়। কমিটি ইচ্ছা করিলে প্রস্তাবিত বিলের সংশোধনও করিতে পারে। তারপর বিলটি দ্বিতীয়বার পার্লামেন্টে পঠিত হয়। এই সময় বিলের প্রত্যেকটি ধারা লইয়া লোকসভায় তর্ক-বিতর্ক চলে এবং ভোট গৃহীত হয়। এইভাবে ভোট গ্রহণের পর বিলটি তৃতীয়বার পঠিত হয় এবং তখন ইহার সাধরণ বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। তাঁরপর বিলটি অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা সমর্থিত হইলে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহার সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে তখন উহা আইনে পরিণত হয়। অনেকক্ষেত্রে তিনি সরাসরি সম্মতি না দিয়া পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি পার্লামেন্টে ফেরত পাঠাইয়া দেন। ইহাই কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়নের সাধারণ নিয়ম।

রাজ্য সরকারও আইন প্রণয়নের জন্য এই ধারার অনুসরণ করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও উল্লিখিত প্রত্যেকটি ধাপের ভিতর দিয়া একটি প্রস্তাবিত বিষয়ের বিল রচিত এবং অবশেষে আইনে পরিণত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে উত্থাপিত বিলটিকে জনমতের জন্য প্রেরণ করা হইয়া থাকে। রাজ্যে রাজ্যপালের সম্মতি ভিন্ন কোন বিলই আইনে পরিণত হইতে পারে না।

বাজেট পাশের নিয়ম: কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলীর আর একটি প্রধান কাজ হইল বাজেট পাশ করা। উভয় ক্ষেত্রেই ইহার পদ্ধতি একই ধরণের। নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে অর্থসচিব আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের তালিকা আইন সভায় উপস্থাপিত করেন। তিনি ঐ দিন বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। নূতন কর বসাইতে হইলে কিংবা পুরাতন করের হার পরিবর্তন করিতে হইলে, এইদিনে পেশ করিতে হয়। ইহার পরে কয়েকদিন ধরিয়া সমগ্রভাবে আয়-ব্যয়ের সমালোচনা চলে। এই সব আলোচনার উত্তর অর্থ-সচিবকে দিতে হয়। তারপর প্রত্যেক বিভাগের আয়-ব্যয় লইয়া পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা চলে। বাজেট-বিতর্ক এক পক্ষকালের মধ্যে শেষ করিবার নিয়ম। বাজেটে সরকারী ব্যয় দুইটি ভাগে দেখান হইয়া থাকে, যথা—(১) যাহা লোকসভার ভোট সাপেক্ষ নহে, যেমন রাষ্ট্রপতির ভাতা এবং (২) যে সব ব্যয় লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

রাজ্য-বিধানমণ্ডলীতে এই একই উপায়ে রাজ্যের আগামী বৎসরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট উত্থাপিত, আলোচিত এবং অনুমোদিত হইয়া থাকে। রাজ্যের ব্যয়-মঞ্জুরীর ক্ষমতা বিধান পরিষদের নাই।

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা

(১) সুপ্রীম কোর্ট: ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে আছে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। এই সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং আরো সাতজন বিচারপতি আছেন; তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজে বহাল থাকেন; সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে বিচারপতিকে

(১) ভারতের নাগরিক হইতে হইবে ; (২) অথবা দশ বৎসর কোন উচ্চ আদালতে ওকালতি করিতে হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী চারিভাগে বিভক্ত, যথা—(১) মূল বিভাগ ; (২) আপীল বিভাগ ; (৩) পরামর্শ বিভাগ এবং (৪) মৌলিক অধিকার রক্ষার বিভাগ। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক মতদ্বৈধ বা বিরোধ ঘটিলে সুপ্রীম কোর্ট ইহার মূল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই সব বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া থাকে—ইহাই মূল বিভাগের কাজ। বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শোনা হইল উল্লিখিত আপীল বিভাগের কাজ। সুপ্রীম কোর্ট ভারতের শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং এই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ইহার মতামত বা উপদেশ চাহিতে পারেন। ইহাই তৃতীয় বিভাগের কাজ নাগরিকের কোন প্রকার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য সে সুপ্রীম কোর্টে বিচার দাবী করিতে পারে।

(২) উচ্চ আদালত ঃ রাজ্যের প্রধান আদালত হইল হাইকোর্ট (High Court); ইহাই রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আদালত। একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া ইহা গঠিত। ইঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কাহাকেও হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে অন্ততঃ দশ বৎসর ভারতের বিচার বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে অথবা অন্ততঃ দশ বৎসর ওকালতি বা ব্যারিষ্টারি করিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য আদালত ঃ দেওয়ানী আদালত হিসাবে হাইকোর্টের অধীনে বিভিন্ন জিলায় জজকোর্ট, তাহার নীচে প্রতি মহকুমায় মুন্সেফ কোর্ট থাকে জিলাজজ নিম্ন আদালতগুলির কার্য পরিদর্শন করেন। বড় বড় শহরে ছোট ছোট মামলার জন্য ছোট ছোট আদালত (Small Causes Court) দেখিতে পাওয়া যায় জজকোর্টগুলিতে মূল এবং আপীল সংক্রান্ত উভয় প্রকার বিচারই চলে। সর্বনিম্ন ফৌজদারী আদালত হইল গ্রামাঞ্চলের ইউনিয়ন বেঞ্চ এবং পঞ্চায়েতগুলি।
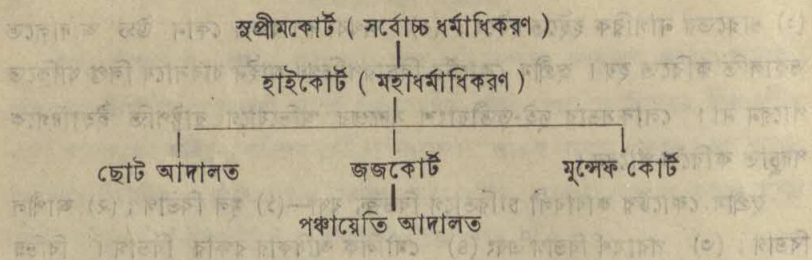
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারের কার্যের বিভাগঃ কোন একটি রাষ্ট্র শাসন করিতে হইলে, শাসনের বিষয়গুলি সর্বাগ্রে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে ; ইহাদিগকে বলা হয় কেন্দ্রীয় বিষয় (Union List); কতকগুলি বিষয় রাজ্যসরকার পরিচালনা করিয়া থাকেন ; ইহাদিগকে বলা হয় রাজ্যসরকারের বিষয়(State List); আর কতকগুলি বিষয়ের ব্যাপারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই কর্তৃত্ব থাকে ; ইহাদিগকে বলা হয় যুগ্মবিষয় (Concurrent List)।

কেন্দ্রীয় বিষয় :—(১) দেশরক্ষা ; (২) বৈদেশিক নীতি নীতি ; (৩) মুদ্রা নির্মাণ ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ; (৪) ডাক ও তার ; (৫) বেতার ; (৬) পরিবহন ব্যবস্থা—রেল, জাহাজ ও বিমানপথ ; (৭) বন্দর পরিচালনা ; (৮) অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা ; (৯) আদমসুমারী বা লোকগণনা ; (১০) ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্স ; (১১) জরীপ ; এবং (১২) কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা।

রাজ্য সরকারের বিষয় :—(১) আইন-শৃংখলা ও পুলিশ ; (২) জেলখানা : (৩) বিচার ব্যবস্থা ; (৪) শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় ; (৫) জনস্বাস্থ্য ; (৬) কৃষি, মৎস্য, জমি ও জনসেচ ; (৭) রাস্তা, সেতু, ফেরী ও রেল-চলাচলের ব্যবস্থা ; (৮) বন-জঙ্গল সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ; (৯) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ; (১০) শিল্প ; (১১) সিনেমা ও থিয়েটার ; (১২) ভূমি রাজস্ব এবং কোর্ট অব ওয়ার্ড্‌স্‌ ইত্যাদি।

যুগ্ম বিষয় :—(১) ফৌজদারী আইন ও বিচার এবং দেওয়ানী বিচার প্রণালী ; (২) বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয় ; (৩) সাক্ষী গ্রহণের নিয়ম ; (৪) উইল, চুক্তি, সালিশী ও দেউলিয়ার ব্যবস্থা ; (৫) সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তক প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ ; (৬) কারখানা শ্রমিক ও শ্রমিকসংঘের ব্যবস্থা ; (৭) বেকার সমস্যা (৮) বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র পরিচালন-ব্যবস্থা তিনটি বিভাগের মাধ্যমে হইয়া থাকে, যথা—(১) আইন বিভাগ (Legislature); (২) শাসন বিভাগ (Executive) এবং (৩) বিচার বিভাগ (Judiciary)। কেন্দ্রী আইন সভা ও রাজ্য আইনসভায় আইন রচিত হয়। রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে রহিয়াছেন রাষ্ট্রপতি; ইনি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে আছেন রাজ্যপাল, ইনি মন্ত্রীসভার সাহায্যে (প্রধানতঃ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে) রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। বিচার-ব্যবস্থার সর্বোচ্চে আছে সুপ্রীম কোর্ট আর সর্বনিম্নে পঞ্চায়েতী আদালত।
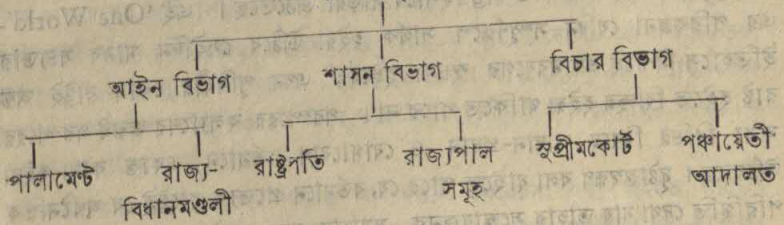
অনুশীলনী

1. Describe the democratic government in our States and the Indian Union.
   আমাদের রাজ্যসমূহের এবং ভারতীয় কেন্দ্রের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর।
2. How is the government carried on ?
   ভারতীয় শাসনব্যবস্থা কিরূপে পরিচালিত হয় ?
3. What is the division of work between the Centre and the States ?
   কেন্দ্রীয় রাজ্যসমূহে কি ভাবে শাসনকার্য বিভক্ত হয় ?
4. What are the various organs in the governmental system in India ?
   ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় বিভিন্ন বিভাগগুলি কি কি ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ

ভূমিকা ঃ মানবসভ্যতা বর্তমানে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে স্থান কাল ও দেশের ভেদরেখা ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইতেছে এবং ইহার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমষ্টি নিজেদের এক মানব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে। এখন এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ ক্রমেই সহজ, সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাইয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবী যেন এক অখণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে। এই 'One World'-এর পরিকল্পনা যেদিন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়া উঠিবে সেইদিন মানব সভ্যতার ইতিহাসে নিশ্চয়ই এক নবযুগের সূচনা হইবে; এখন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। পরস্পরের কল্যাণের জন্যই পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আদান-প্রদান ও যোগাযোগ বর্তমানে একান্ত কাম্য হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখা যায় তাহার সন্তোষজনক সমাধান অন্য রাষ্ট্রের সহিত অর্থনৈতিক যোগাযোগ ভিন্ন সম্ভব নহে। সুদূর অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ যে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তখন বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইত। এখন পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের মানুষ বুঝিতে শিখিয়াছে যে, তাহারা যে-কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী হউক না কেন, মূলতঃ তাহাদের ভাগ্য পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত। মূলতঃ এই ধারণা হইতেই আজিকার মানুষের মধ্যে 'One World'-এর চেতনা দেখা দিয়াছে এবং ইহারই ফলে দেশ ও কালের ব্যবধান ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি আজ সহ-অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হৃদ্যতা ব্যতীত পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিরক্ষা সম্ভব নহে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। মোট কথা, বিংশ শতাব্দীর মানুষ আজ এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিতে হইলে 'এক রাষ্ট্র, এক মানব পরিবার'—এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে এবং ইহারই জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ।

বিভিন্ন প্রকারের যোগাযোগ

(১) রাজনৈতিক : এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের যোগাযোগ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যথা—(১) রাজনৈতিক যোগাযোগ; (২) অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং (৩) সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। আমরা এইবার এই তিন শ্রেণীর যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচনা করিব। রাজনৈতিক যোগাযোগ নানাভাবে থাকিতে পারে। যখন কোন দেশ অপর দেশের সহিত যোগাযোগের ফলে রাজনৈতিক বিষয়ে প্রভাবিত হয় তখন তাহাকে রাজনৈতিক যোগাযোগ বলে। তখন একটি দেশ অপর একটি দেশ জয় করিয়া ঐ দেশের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে, তখন উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এইভাবে একদেশের রাজনৈতিক নিয়ম-কানুন অন্যদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ইহার একটি দৃষ্টান্ত। ইংরেজরা এই দেশ জয় করিয়া তাহাদের দেশের বহু রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখানে চালু করিয়াছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিজেতাগণ পরাজিতদের উপর তাহাদের রাজনৈতিক নিয়মকানুন, এমন কি শাসনব্যবস্থা পর্য্যন্ত চালু করিয়াছে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলি বিবেচনা করা যাইতে পারে। কোন একটি বিদেশের একটি ব্যবসায়ীগোষ্ঠী যখন অন্য একটি দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আসে তখন তাহারা তাহাদের দেশের রাজনৈতিক ভাবধারাও কিছুটা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে; এইভাবে একটি দেশ আর একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইতে পারে এবং উহার দ্বারা আংশিক ভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। রাজ্যজয়ের দ্বারাও এক দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অন্যদেশের জনসমষ্টির মধ্যে প্রবর্তিত হইতে পারে। ধর্মপ্রচারের মাধ্যমেও অনেক সময় এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। দুইটি রাষ্ট্র যদি নিকট প্রতিবেশী হয়, আর উভয়ের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান যদি বিশেষ না থাকে, তাহা হইলে এই উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ ঘটিয়া থাকে। বর্তমানে দ্রুতগামী যানবাহনের আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে সুগম হইয়াছে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের যত প্রসার হইতেছে, ততই মানুষ জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইতেছে। এই প্রকার যোগা-যোগের ফলে দেশের মধ্যে বহু উন্নতি সাধিত হয় এবং বহু প্রকারের সুযোগ-সুবিধাও দেখা দেয়। রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষের শুধু

অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধিত হয় নাই, শাসনব্যবস্থাতেও নানাভাবে উন্নতি হইয়াছিল। দেশাত্মবোধ ও জাতিয়তার বিকাশ ইহার আর একটি পরোক্ষ ফল।

(২) অর্থনৈতিক : পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। ইতিহাসের আরম্ভকাল হইতে, এমনকি তাহার পূর্বেও মিশরীয়, রোমক ও গ্রীকগণ জলপথে ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে ভারত বিদেশে নিয়মিতভাবে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিত। প্রাকৃতিক সম্পদ সকল দেশে সমান নহে, বঙ্গদেশে যাহা উৎপন্ন হয়, অন্যদেশে হয়ত তাহা হয় না, কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে। এরূপক্ষেত্রে সেই দেশ হইতে উহা আমদানি করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না। এইভাবে একস্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যত্র সরবরাহ করিবার প্রথা প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান। তবে তখন প্রয়োজন ছিল অল্প এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক যোগাযোগও ছিল খুব সামান্য। কালক্রমে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এখন একদেশের পক্ষে তাহার জনসমষ্টির নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করা সুকঠিন। কাজেই পণ্যদ্রব্যের লেনদেন বা বিনিময় সূত্র ধরিয়াই পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশই পারস্পরিক অর্থনৈতিক সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে।

এই অর্থনৈতিক যোগাযোগ সাধারণতঃ তিন প্রকারে সাধিত হইতে পারে যথা—(১) ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ; (২) আর্থিক সাহায্যের মধ্যেমে : এবং (৩) বৈদেশিক আধিপত্যের ফলে। আধুনিককালে প্রথমটিই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের সংযোগ দুইপ্রকারে হইয়া থাকে, যথা—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক লেনদেন প্রায় সকলদেশেই বর্তমান। দুইটি দেশের মধ্যে পণ্যদ্রবের সোজাসুজি আমদানি-রপ্তানীকে বলা হয় প্রত্যক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্য। আবার যখন একটি দেশ অপর দেশের সহিত অন্য একটি দেশের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি চালায় তাহাকে বলা হয় পরোক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ইংরেজ শাসনকালে আমাদের দেশের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তখন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের মাধ্যমেই বিদেশের সহিত বাণিজ্য চালাইত। বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই কম-বেশি অর্থনৈতিক জটিলতা দেখিতে প্াওয়া যায়। এই জটিলতার বহুবিধ কারণ আছে। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে তাই এখন এই একটি নিয়ম চালু হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে এক দেশ আর এক দেশের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য (Monetary help) গ্রহণ করিতে পারিবে। এই সাহায্যদান দুইপ্রকারে হইয়া থাকে। অনেকক্ষেত্রে সোজাসুজি সাহায্য দেওয়া হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে অর্থমূল্যের সমপরিমাণ দ্রব্যাদির সাহায্য

দেওয়া হয়। ইংরেজরা যখন আমাদের দেশ শাসন করিত তখন ভারতবর্ষের উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তারলাভ করিবার ফলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্তমানে অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) **সাংস্কৃতিক ঃ** এইবার আমরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বলিব। মানবসভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবী বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃতিই আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং শিল্প বা ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও, মানুষ মানুষের সহিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন মিলিতে পারিয়াছে এমন আর কোথাও নহে। একটি উন্নত সংস্কৃতির জনসমষ্টির প্রভাব আর একটি অনুন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন জনসমষ্টির উপর সহজেই আসিয়া পড়িতে পারে; সভ্যতার ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে দ্রাবিড় সংস্কৃতির উপর বহিরাগত আর্যসংস্কৃতির প্রভাব ইহার একটি নিদর্শন। জাতিতে জাতিতে সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রধানতঃ চারি প্রকারে হইয়া থাকে, যথা—(১) ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে; (২) শ্রম শিল্পের মাধ্যমে; (৩) ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে; এবং (৪) রাজ্যজয়ের মাধ্যমে।

একদেশের মানুষ যখন অন্যদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে গমন করে, তখন স্বভাবতঃই এই দুই বিভিন্নদেশের মানুষের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটে। টাকা-পয়সা অথবা পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের ভিতর দিয়া উভয়ের মানসিক চিন্তাধারারও বিনিময় ঘটিয়া থাকে এবং যদি একজনের সংস্কৃতি উন্নত হয় তবে উহা অপরের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করিবেই। ইহাই নিয়ম। শ্রম শিল্পের মাধ্যমেই দুইটি বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ বিশেষ করিয়া ঘটিয়া থাকে। এখানে শ্রম শিল্প বলিতে industry বুঝিতে হইবে। একটি অঞ্চলে যখন একটি শিল্প গড়িয়া উঠে, তখন সেই অঞ্চলে বহু রকমের জনসমষ্টির সমাগম হইয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। স্বভাবতঃই এইসব সংস্কৃতির সংযোগ ঘটিয়া থাকে এবং উন্নত সম্প্রদায়ের সহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের যোগাযোগ সাধিত হয়। টাটানগরের শিল্পাঞ্চল ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই অঞ্চলে যে উপজাতি বাস করিত তাহারা যখন বহিরাগত উন্নত শ্রেণীর জনসমষ্টির সংস্পর্শে আসিল, তখন ইহাদের সাংস্কৃতিক জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিল। ধর্মপ্রচার দ্বারা যে সাংস্কৃতিক সংযোগ সাধিত হয় তাহার দৃষ্টান্ত ভারতের বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিককালে খ্রীষ্ট ধর্ম। চীন, তিব্বত, জাপান,

সিংহল, জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তখন বৌদ্ধ প্রচারক-দিগের সহিত ভারত-সংস্কৃতিও গিয়াছিল এবং ঐসব দেশের অধিবাসীগণ ইহাদ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টান পাদরিগণ যখন ভারতের অনুন্নত বহু উপজাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন, তখন ঐসব উপজাতিগণ পাদরিদের নিকট হইতে ধর্মের সহিত তাহাদের সংস্কৃতিরও কিছু অংশ গ্রহণ করে। আবার একজাতি যখন অন্যজাতির অধীন হয় তখন বিজেতার সংস্কৃতি সহজেই পরাজিত জনসমষ্টির মধ্যে বিস্তারলাভ করে। আধুনিক ভারতে মোগল ও ইংরেজ শাসন এবং প্রাচীন ভারতের আর্যগণ ইহার দৃষ্টান্ত।

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি ঃ স্বাধীনতালাভের দুই বৎসর পরে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী লোকসভায় সর্বপ্রথম ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির (Foreign Policy) ঘোষণা করেন। সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার মূল কথা হইল—পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষ বন্ধুত্ব কামনা করে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, পৃথিবীর সকল সুসভ্য ও স্বাধীন রাষ্ট্রেরই পররাষ্ট্র-নীতি আছে এবং পররাষ্ট্র বিভাগ মারফৎ উহা প্রচারিত হইয়া থাকে। অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি একটি রাষ্ট্রের মনোভাব কি, তাহা রাষ্ট্রের 'ফরেন পলিসি' ভিন্ন জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। এইজন্যই যখনই কোন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে, তখনই সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে তাঁহার রাষ্ট্রের 'ফরেন পলিসি' বিবৃত করিতে হয়। একটি রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি বৈরিভাব বা বন্ধুত্ব সম্পন্ন কি না তাহা জানিবার একমাত্র উপায় ঐ রাষ্ট্রের বিঘোষিত পররাষ্ট্র-নীতি।

ভারতের বিঘোষিত পররাষ্ট্র-নীতির লক্ষ্য শান্তি এবং অন্যের সহিত বন্ধুত্ব। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কাহারও বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করিতে চাহে না কিম্বা কোনও রাষ্ট্রের কিছুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টিও তাহার অভিপ্রেত নহে। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির আর একটি লক্ষ্য হইল বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে সাম্য এবং যে সব দেশ এখনও অপর দেশের অধীন রহিয়াছে তাহাদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়াছিলেন, তখন সেখানকার কংগ্রেসের সম্মুখে তিনি ইহাই প্রচার করিয়াছিলেন। তারপর সম্মিলিত জাতিসংঘের দরবারেও ভারতের এই পররাষ্ট্র-নীতি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয় এবং পরে ভারতের এই নীতি জেনেভা সম্মেলনে ও বান্দুং সম্মেলনে প্রচারিত হইয়াছিল। বর্তমানকালে আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের উপরই বিশ্বশান্তি একান্তভাবে নির্ভর করে এবং ভারতের পররাষ্ট্র-নীতিতে এই সম্পর্কেও সুদৃঢ় মনোভাব বারবার ব্যক্ত করা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মবিদ্বেষ এখনও প্রবলভাবে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে (যেমন আফ্রিকায়) বিদ্যমান; ইহার বিরুদ্ধেও ভারত তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির ভিত্তি হইল 'পঞ্চশীল'। শীল কথাটির অর্থ হইল 'আচরণ'। এই পাঁচটি নীতি পঞ্চশীলের অন্তর্গত, যথা—(১) পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও

সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ না করা; (২) অনাক্রমণ (Non-aggression); (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; (৪) সমমর্যাদা ও পারস্পরিক হিতাচরণ এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (Peaceful Co-existence)। 'পঞ্চশীল' নামটি প্রবর্তন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু। ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নেহরু ও চৌ-এন-লাই-এর যুক্ত বিবৃতিতে। অধুনা রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহা একটি নিয়ত ব্যবহৃত শব্দ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বারবার এই কথা কথা বলিয়াছেন যে, পঞ্চশীলের নীতি কেবলমাত্র শুধু এশিয়ার পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে, ইহা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই কল্যাণকর। ভারত যে শান্তিকামী তাহার প্রমাণ এই পঞ্চশীল।

সম্মিলিত জাতিসংঘ (UNO) ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব: সমাজে যেমন মানুষ মিলিয়া-মিশিয়া বাস করে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে 'মিলিয়া মিশিয়া' থাকিবার গূঢ় অর্থ হইল যুদ্ধবিগ্রহ না করা। এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধ হয় নানা স্বার্থ-সংঘাত লইয়া। আর এক একটি যুদ্ধের পরিণামে যে মৃত্যু ও সর্বনাশ আনে তাহা সামলাইতে অনেক দিন কাটিয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সবজাতিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া লীগ অব্ নেশনস্ (League of Nations) প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানে গঠনজনিত এবং প্রকৃতিগত কতিপয় ত্রুটি ছিল এবং ইহা যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারে নাই। লীগ অব্ নেশনস্-এর ব্যর্থতার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব হয়। এই আন্তর্জাতিক সংঘ (United Nations Organisation বা UNO) প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ষ্ট্যালিনের সহযোগিতায়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন স্যান ফ্র্যান্সিস্কো শহরে জাতিসংঘের সনদ (Charter) গৃহীত হয়। সনদে বর্ণিত জাতিসংঘের আদর্শ: (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা; (২) বিভিন্নজাতির সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মর্যাদারক্ষার ভিত্তিতে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা; (৩) শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা (৪) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান; এবং (৫) ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকার করিয়া সকল জাতিকেই পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতে সাহায্য করা।

এই সনদের ভিত্তিতেই সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠিত। বর্তমানে ইহার সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা হইতেছে ৭৬টি। জাতিসংঘের কার্য্য নিম্নলিখিত ছয়টি বিভাগে পরিচালিত হয়, যথা—(১) সাধারণ সভা; (২) স্বস্তি বা নিরাপত্তা পরিষদ;

(৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ; (৪) অছিগিরি পরিষদ; (৫) আন্তর্জাতিক ধর্মাধিকরণ; এবং (৬) সম্পাদকীয় দপ্তর বা মহাকরণ। সাধারণ সভায় আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিরোধ মিটাইবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য লইয়াই এই সভা গঠিত। জাতিসংঘের সর্বপ্রধান বিভাগ উহার নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council); বিশ্ব-শান্তিরক্ষার প্রধান দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। জাতি সংঘের অন্য সকল সংগঠনই এই বিভাগের অধীন। স্বস্তি পরিষদ মোট ১১ জন সভ্য লইয়া গঠিত। তাহার মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র হইতেছে স্থায়ী সদস্য, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন। বাকী ছয়টি সদস্য-রাষ্ট্র প্রতি দুইবৎসর অন্তর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই পরিষদ সকল সদস্য-রাষ্ট্রকেই সাময়িক এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে পারে। স্বস্তিপরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রের ভিটো ক্ষমতা (Veto Power) আছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী বৃহৎ পঞ্চশক্তির যে কোন একটি স্বস্তি পরিষদের যে কোন প্রস্তাব ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে। এই পরিষদের অধিবেশনের কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই; ইহার অধিবেশন সব সময়ে চলিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই স্বস্তি পরিষদ এক কথায় আন্তর্জাতিক শান্তির সতর্ক প্রহরী।

সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ১৮টি সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতার বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করে এবং ইহা উন্নত করিতে চেষ্টা করে। ইহার তেরটি বিশেষ সংস্থা আছে, তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation বা I L O) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organisation বা F A O) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation বা W H O) এবং শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিমূলক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation বা U N E S C O) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই বিভাগের অন্তর্গত বিশ্বব্যাঙ্কের (World Bank) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় পৃথিবীর মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, সংস্কৃতি প্রভৃতি যাবতীয় দিকে একত্রে সর্বাত্মক উন্নতির চেষ্টাই এইসব সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।

অছি পরিষদের কাজ হইতেছে, যে সকল এলাকা জাতিসংঘের অধীনে আসিবে সেগুলির শাসন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য আন্তর্জাতিক অছি গঠন করা। ইহার উদ্দেশ্য হইল অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করিয়া তোলা। আন্তর্জাতিক

ধর্মাধিকরণ আন্তর্জাতিক কলহের বিচার করে এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করে। এই বিভাগে ১৫ জন বিচারপতি থাকেন। সর্বশেষ বিভাগটি জাতিসংঘের যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী দপ্তর। একজন প্রধান সচিব (Secretary-General) ইহার প্রধান কর্মকর্তা, তাঁহার অধীনে আটটি বিভাগের সাহায্যে দপ্তরখানার কাজ পরিচালিত হয়। জাতিসংঘের একটি নিজস্ব পতাকা আছে।
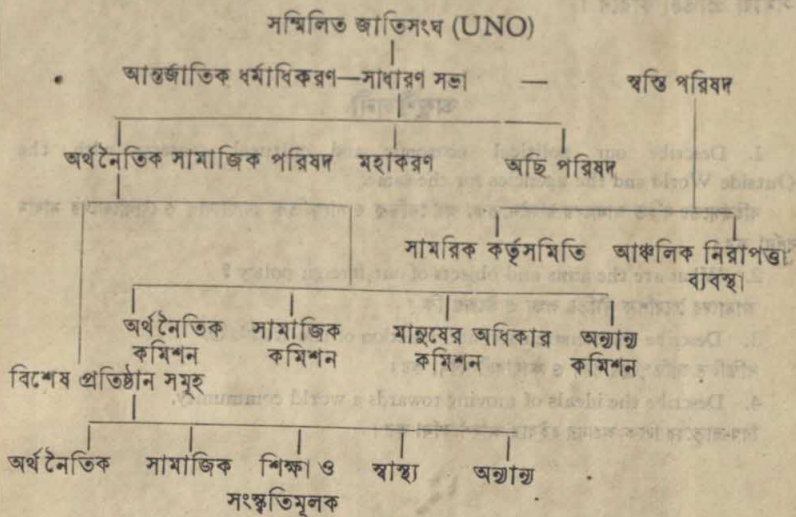
বিশ্বভ্রাতৃত্ব ঃ সভ্যতার পথে ক্রমশঃ উপরের দিকে চলিতে চলিতে মানুষ আজ বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। জাতিসংঘের ভিতর দিয়া আসিয়া মানুষ আন্তর্জাতিকতার পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারিবারিক ও সংস্কৃতিগত সহযোগিতা, ভাবের আদান প্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি রাষ্ট্রের প্রজা হইয়া যেমন জনসাধারণ তাহাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চরম উৎকর্ষতা অর্জন করিতে পারে, সেই প্রকার একটি আন্তর্জাতিক পরিবারের (Family of Nations) সদস্য হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সমাধান করিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই। জাতিসংঘের

প্রকৃত ভূমিকা এইখানেই। বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন আজ পৃথিবীতে নূতন নহে। মানবহিতৈষী একাধিক মনীষী বহুকাল হইতে এই আদর্শের কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। সেই স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার জন্যই আজ জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় জাতিসমূহের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বোধ ক্রমশঃই প্রসারের পথে চলিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে একদিন পৃথিবীর সকল মানুষ এক বৃহৎ মানবপরিবারের অন্তর্গত হইয়া পৃথিবীর বুকে একটি বিশ্বব্যাপী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে।

অনুশীলনী

1. Describe our political, economic and cultural contacts with the Outside World and the agencies for the same.
বহির্জগতের সহিত আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও যোগাযোগের মাধ্যম বর্ণনা কর।

2. What are the aims and objects of our foreign policy ?
আমাদের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ?

3. Describe the constitution and function of the U. N. O.
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

4. Describe the ideals of moving towards a world community.
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দিকে অগ্রসর হইবার আদর্শ বর্ণনা কর।

॥ শেষ ॥